বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

শ্রীমওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮১।

সূচী পত্র।

১ম সংখ্যা] [আষাঢ়। ১২৮১।

অবতরণিকা।

...কের সূত্রধারগণ, অভিনয় ...অবতীর্ণ হইয়া, প্রথমেই যেমন ...চ্ছলে উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করিয়া ... ইদানীন্তন লেখকগণও সেই ...ছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইবার ...থমেই ভূমিকা, কি পত্রসূচনা, ...র কোন একটা নাম দিয়া, ...নিকট আপনাদিগের উদ্দেশ্য, এবং ক্ষমতার পরিচয় প্রদান ... এই প্রথা ভাল কি মন্দ, আমরা ... চাহি না। কিন্তু ইহা নিঃশঙ্ক-... বলিতে পারি, এবং বোধহয় সক... ইহা স্বীকার করিবেন যে, বিজ্ঞাপ-সঙ্গে এইরূপ আত্ম পরিচয় দেওয়া ... কঠিন কর্ম্ম। লেখক, পাঠকবর্গের নিকটে, অনেক কথা বলিলে,—অথবা ভবিষ্যৎসম্বন্ধে সুন্দর একখানি ছবি আঁকিয়া তুলিলে, সকলে তাহাকে অন্তঃসারশূন্য অভিমানী বলিয়া উপেক্ষা করেন। পক্ষান্তরে, সে, অতিবিনীত ভাব অবলম্বন করিয়া, আত্মদীনতা নিবেদন করিলে,—'আমি অকৃতী, অক্ষম, অভাজন, আমার দ্বারা কিছুই হইবে না' পুনঃ পুনঃ এবংবিধ কাতরবাক্য প্রয়োগ করিলে, নির্দ্দয় পাঠক সমাজ, তাহার কথায়ই তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, একবার ফিরিয়াও আর চান না। আমরা, এই উভয় শঙ্কট সমালোচনা করিয়া, বিজ্ঞাপন স্বরূপ কিছুই লিখিব না, স্থির করিয়াছিলাম। তবে, প্রচলিত রীতি পরি

...করা, লোকের কণ্ঠে গৃহীত প্রাণ্গণ করিতেছে, এবং যে তেজ সর্ব্বাবারে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, তাহাও পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে। পৃথিবীর আদি সভ্য আর্য্যজাতির কিছুই এইক্ষণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্য্যজাতির নাম লোপ হইয়াছে, প্রতাপসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্ত গিয়াছে, তাঁহাদিগের যাহা কিছু ছিল, সময়ের হিল্লোল সমস্ত ধুইয়া নিয়াছে। কিন্তু আর্য্যদিগের ভাষা, আর্য্যভূমির হিতসাধনে এখনও কিরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয়। ইংরেজ জাতির যে ইদানীং এত বৃদ্ধি হইয়াছে, বিজ্ঞ ব্যাক্তিরা বলেন ইংরেজী ভাষার সমৃদ্ধি উহার এক প্রধান কারণ। জাতিগত উন্নতি যে পরিমাণে ভাষার উন্নতি সাধন করে, ভাষাগত উন্নতিও ঠিক সেই পরিমাণে জাতীয় উন্নতির নিদান হয়। দেশে উন্নত লোক সকল জন্মগ্রহণ করিলে, দেশীয় ভাষা পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হয়; এবং দেশীয় ভাষা, পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া, উচ্চকল্পের ভাব চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেশের লোক আপনা হইতেই উন্নত হইয়া উঠে। এতদুভয়ের এই পরস্পর উপকার্য্য উপকারক সম্বন্ধ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গীয় কৃতবিদ্যসমাজ বুঝিয়াও এতদিন এই সমস্ত কথা বুঝেন নাই। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভাল বাঙ্গালা জানা বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে একটা কলঙ্কের কথা ছিল; এবং কেহ বাঙ্গালায় বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিলে, সকলে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট বিষয়ে বিরাগী বলিয়াই গণনা করিত। সত্য বটে, বাঙ্গালার ভাণ্ডারে তাঁহাদিগের পান ভোজন কি মনোরঞ্জনের উপযোগি বস্তু অদ্যাপি সঞ্চিত হয় নাই। তাঁহারা, সমস্ত দিন সুধীজনসংসর্গে নানাবিধ উচ্চ বিষয়ের আলোচনায় কাল যাপন করিয়া, সন্ধ্যা সময়ে জননী কি গৃহিণীর গার্হস্থ্য আলাপে যেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন না; অশেষজ্ঞানসম্পন্ন বিদেশীয় পণ্ডিতসমাজের গ্রন্থানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে বঙ্গীয় লেখকদিগের অকিঞ্চিৎকর কথায় কর্ণপাত করিতেও তাঁহাদিগের সেইরূপ প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু বাঙ্গালার এই শোচনীয় দীনতার কারণ কি? বাঙ্গালা গ্রন্থালয় যে আজও দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, লোকচরিত, সাহিত্য, ও নীতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্রসমুদ্ভূত রত্নমালায় অলঙ্কৃত হয় নাই—বাঙ্গালা ভাষা আজ পর্য্যন্তও যে জগতে আদরের আসন লাভ করিতে পারে নাই, ইহা কি বাঙ্গালী কৃতবিদ্য

দিগেরই অপরাধ নহে ? লোকে উপ- হাস করিয়া বলে, বাঙ্গালায় যাহা কিছু লিখিত হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য বালক এবং অলসা কুলবধূ ব্যতীত আর কাহারও ভোগে আসে না। বাঙ্গালা গ্রন্থ বিলাসীর সরবৎ। উহা না চিন্তাশক্তির উদ্বোধন করে, না হৃদয়েরই উদ্দীপক হয়। সংসারে যাঁহার আর কোন কাজ নাই, ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশীয় কোন ভাষায় অধিকার নাই, তিনিই বাঙ্গালা গ্রন্থ লইয়া কাল যাপন করেন। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিতসম্প্রদায়, আলস্য এবং ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে রত না হইলে, বাঙ্গালার এই অপবাদ কি কখনও দূর হইবে ? এক সময়ে ইংলণ্ডেও এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা লাটিন ও গ্রীকের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই জীবন উৎসর্গ করিতেন, এবং মনের উচ্চ চিন্তা সকল এই দুই ভাষায় প্রকাশ করিতেই বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। তৎকালীন ইংরেজী, মলিনবসনা অনাথা বিধবার ন্যায়, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত। কাহারও ভক্তি কি প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিত না। কেহই উহার পানে চাহিত না। যেই পণ্ডিতেরা উহার প্রতি যত্ন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি ইংরেজী মলিন বেশ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিল ; উহার মুখে হাসি ফুটিল ; উহার জ্যোতিও এ দেশের সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িল। বঙ্গদেশে যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, এবং মনের চিন্তা ভাষায় পরিস্ফুট করিবার কৌশল অবগত হইয়াছেন, যদি তাঁহাদিগের প্রত্যেকে, মাতৃভাষার উন্নতির জন্য, নিজ নিজ অবসর সময়ের কিয়দংশও অর্পণ করেন, বাঙ্গালার মলিন মুখ কি অচিরেই প্রফুল্ল হয় না ?

বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বঙ্গের যে সকল সুসন্তান, বাঙ্গালার শোভা সম্পাদন এবং কলেবর বর্দ্ধনের জন্য, চিরদিন পরিশ্রম করিয়াছেন,—যাঁহারা, নিপুণ কারুকরের ন্যায় নিয়ত যত্নপর থাকিয়া নিত্য নূতন শব্দ সংকলন এবং ভাব প্রকাশের নিত্য নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার দি। বাঙ্গালার আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা, নানা ফুলে মালা গাঁথিয়া, মাতৃভাষার চরণে অর্পণ করিয়াছেন, মনের সহিত তাঁহাদিগকে অভিবাদন করি। যাঁহারা এত দিন অকারণ উদাসীন রহিয়াছেন, আমরা ভরসা করি, অতঃপর তাঁহারাও উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ ঋণ পরিশোধের জন্য সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিবেন।

গৃহপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; আর সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোল, যেন ক্রীড়াচ্ছলে, স্পর্শে স্পর্শে তাঁহার সেই তাপিত অঙ্গ শীতল করিতেছে। সেই সুখোপবিষ্ট ব্যক্তি, হয়ত এতক্ষণ সমীরণের সুশীতল স্পর্শসুখই অনুভব করিতেছেন ;—সমীরণ, কিরূপ সসঙ্কোচ ভাবে, উদ্যানের লতায় কুসুম চুম্বন করিয়া, বিচরণ করিতেছে,—কিরূপ আদরের সহিত সম্মুখস্থিত তরুরাজির নবোদ্গত পত্রাবলী ক্ষণেং বিকম্পিত করিতেছে ;—কিরূপ প্রণয়িজনোচিত যত্নেরসহিত তাঁহার শরীরের স্বেদবিন্দুচয় অপনয়ন করিতেছে, তাহাই দেখিতেছেন ও ভাবিতেছেন। উহা যে জড় প্রকৃতির একটী অতি প্রধান শক্তি, তাহা তাঁহার মনে প্রতিভাত হইতেছে না। কিন্তু তিনি যখন আবার সেই মৃদুবাহি সমীরণকে ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতে অবলোকন করেন,—যখন দেখিতে পান যে, উহা আর তরুর পত্রে পত্রে এবং ফুলের দলে দলে খেলিতেছে না, কিন্তু ঘোর গভীর গর্জ্জনে বিশ্ব চমকিত করিয়া, মূলের সহিত উৎপাটন করিতেছে এবং তরুর সহিত লতার বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে; তখন তিনি, স্বভাবতঃই উহার শক্তিমত্তা অনুভব করিয়া, ভয়েও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন। প্রকৃতির শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হইলে, কে তাহার অস্তিত্ব সন্দিহান হইতে পারে ?

শুধু সমীরণ নহে, জড় জগতের সকল শক্তিই স্বতঃপ্রতীয়মান। উষার শিশিরবিন্দু দূর্ব্বাদলে মুক্তার হারের ন্যায় শোভা পায় ;—প্রভাতের দীপশিখা নিভু নিভু জ্বলিতে থাকে, এবং কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করে। দেখিয়া, লোকের দেখিবার জন্যআরও ইচ্ছা হয়। তৎকালে, জল কিংবা অগ্নির শক্তি একবারও মনে সমুদিত হয় না। কিন্তু গিরিপ্রান্ত হইতে প্রলয় ধারার ন্যায় প্রপতিত জলধারা অবলোকন করিলে ; অথবা পর্য্যটন ক্রমে, কোন সময়ে দাবদাহের ভয়ঙ্করমূর্ত্তির সম্মুখীন হইলে, সেই বিস্ময়জনক বেগ,—সেই ত্রাসের ধ্বংসরূপিণী লোলজিহ্বা, জল এবং অগ্নিকে সহজেই সৃষ্টির দুটি অতি প্রধান শক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। জড়জগতের যে সকল শক্তি নিয়ত আমাদিগের উপর কার্য্য করিতেছে, আমরা এইরূপে বিনা যত্নেই তাহাদের পরিচয় পাইতে পারি। দিবসে যামিনীতে, জাগৃত কি নিদ্রিত সকল অবস্থাতে আমরা উহাদের অধীন। মৎস্য যেমন জল রাশির অভ্যন্তরে অবস্থান করে,—ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে সকল দিকেই জল ; জলে ভাসে, জলে ডু-

যায়, জড় প্রকৃতির শক্তি নিচয় সম্বন্ধেও আমাদিগের অবস্থা ঠিক সেই রূপ। জড়শক্তি জলের ন্যায় রাশীভূত হইয়া, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; আমরা মৎস্যের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করিতেছি। অগাধ অনন্ত জড় শক্তি সাগরে আমরা প্রক্ষিপ্ত কুসুমের ন্যায় ক্ষণে ভাসিতেছি, ক্ষণে ডুবিতেছি, ক্ষণে ক্ষণে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছি। আমরা ছাড়িলেও, উহা আমাদিগকে ছাড়ে না। আমরা শৃঙ্খলচ্ছেদ করিয়া, দূরে পলায়ন করিতে চাহিলেও, উহা আমাদিগকে পলায়ন করিতে দেয় না!

কিন্তু আমরা এস্থলে জড়শক্তির বর্ণনা কি বন্দনাচ্ছলে আর কিছুই বলিতে চাই না। উহার আরাধনায় আমাদিগের মন আপনা হইতে প্রধাবিত হয় না। উহা অন্ধ এবং অতীব নিষ্ঠুর। উহার কাল অকাল জ্ঞান নাই, পরের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ, কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই। মাতা, স্নেহের বাহুবল্লী প্রসারণ করিয়া, সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে অগ্রসর হন; জড়শক্তি, উহার লৌহ হস্ত বাড়াইয়া, সেই সন্তান কাড়িয়া নেয়। যুবতী, প্রেমভরে কণ্টকিত কলেবরা হইয়া, অনিমেষনয়নে প্রিয়তমের নয়নপানে নিরীক্ষণ করিতে থাকে, জড়শক্তি, ফুৎকার দিয়া, সেই নয়নালোক জন্মের মত নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে।

জড়শক্তির নিরত স্তুতিপাঠক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ শতমুখে উহার স্তুতি গীত গান করিতেছেন,—উহার উপাসনায় অহোরাত্র নিবিষ্ট থাকিয়া, পৃথিবীতে উহার পূজাপদ্ধতি প্রচার করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নপর হইতেছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ক্ষুদ্রও বৃহৎ সমস্ত গ্রন্থই জড়শক্তির গুণানুবাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

জড়শক্তি সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিলাম, তাহা শুদ্ধ উদাহরণের অনুরোধে। মানব-লোক অথবা মনোজগতের অভ্যন্তরনিহিত যে সকল শক্তি জড়শক্তি নহে, অথচ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা অনুভূত হইতেছে; যে শক্তিচয়কে সমীরণের ন্যায় স্পর্শন অথবা জল কিংবা অগ্নির ন্যায় দর্শন করা যায় না, অথচ আছে বলিয়া প্রতিক্ষণ স্বীকার করিতে হয়, সেই অজড়শক্তি নিচয়ের পরিচয় প্রদানই আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য।

কোন স্থানে বৃহৎ এক শিলাখণ্ড নিপতিত রহিয়াছে; কেহ, বাহুবলে তাহা উত্তোলন করিয়া, অবহেলায় শতপাদ দূরে ফেলিয়া দিল। এই কার্য্যে সকলেই উক্ত জড় শক্তির প্রয়োগ স্বীকার করিবে। ইহাতে মানুষী শক্তির সংস্রব আছে, এইরূপ বিশ্বাস করিবার

[illegible]মাত্র কারণ নাই। আবার কল্পনা কর, কোন স্থানে সহস্র লোক একত্র হইয়া প্রমত্তের ন্যায় কোলাহল করিতেছে। কে কাহার বক্ষোবিদারণ, কে কাহার শোণিত পান করিবে, এই চিন্তাতেই সকলে ব্যতিব্যস্ত। নিষ্কাশিত তরবারি চতুর্দ্দিগে ধ্বনিত হইতেছে, এবং রবির কিরণ স্পর্শে তৎসমুদয় আবার এমন ভয়ঙ্কর ভাবে ঝলসিতেছে যে, দর্শকবৃন্দ ভয়ে চিত্রিত পুত্তলের ন্যায় স্পন্দহীন। এমন সময়ে, এক প্রশান্তমূর্ত্তি পুরুষ, নিরস্ত্র করে, নিঃশঙ্ক মনে, তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহারও নিকটবর্ত্তী হইলেন না, কাহাকেও ছুইলেন না, এবং কাহারও হস্ত হইতে একখানি তরবারি কাড়িয়া লইলেন না। কিন্তু তাঁহার সেই প্রশান্ত চক্ষু হইতে সকলের উপর পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, তাঁহার জিহ্বা হইতে গুটিকত ধ্বনি বিনিঃসৃত হইল, আর অমনি সমস্ত কোলাহল নিবৃত্ত। একখানি বাহুও আর নড়ে না; একখানি তরবারিও আর সঞ্চালিত হয় না। যেন কি এক মন্ত্র প্রয়োগে সেই মহাত্মা সকলকে একবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অথবা মনে কর, কোন স্থানে সৈনিকগণ, শত্রুসেনা সমাগত প্রায় দেখিয়া, ভয়ে কাঁপিতেছে, কি করিবে, কোথায় যাইবে, স্থির করিতে না পারিয়া, আপনার অঙ্গ আপনি লুক্কায়িত হইতেছে, সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুর নিকটবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যাও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিতেছে। ঈদৃক্‌ বিপদের অবসরে, এক ন্যাপোলিয়ান, সহসা তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ধীরগম্ভীরস্বরে গুটিকত কথা দ্রবীভূত লৌহের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন;—স্বকীয় তাড়িতের সঞ্চালন দ্বারা সকলের মানসক্ষেত্রে এক নূতন তেজ প্রেরণ করিলেন। আর, ভীরু বীরমদে, গর্জ্জিয়া উঠিল। যে, ক্ষণ পূর্ব্বে, শত্রুকে সিংহ মনে করিয়া, থর থর করিতেছিল, সেই এইক্ষণ তাহাকে তৃণ জ্ঞানে আপনার প্রদীপ্ত ক্রোধহুতাশনে আহুতি স্বরূপ অর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

প্রাগুক্ত উভয় উদাহরণই ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত। অনুসন্ধান করিলে ইতিহাসে এইরূপ অনির্ব্বচনীয় শক্তিপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সহস্র সহস্র ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ ইতিহাসে অনুসন্ধান না করিয়াও, আমরা মনঃশক্তির অসংখ্য দৃষ্টান্তস্থল প্রাপ্ত হইতে পারি। এক শত লোক একত্র হইয়া কোন এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; একজন তন্মধ্যে আপনা হইতে কর্ত্তা হইয়া বসে। সে কাহারও নিকট

কর্ত্তৃত্বের সম্বন্ধ পায় নাই, কর্ত্তা বলিয়া কখনও অভিহিত হয় নাই; তথাপি সে আপনার বলে আপনিই কর্ত্তা। এক সময়ে যাহারা তাহার সঙ্গী ও সহচর ছিল, এইক্ষণ তাহারা তাহার অধীন। ইচ্ছা করিলেও অধীন, ইচ্ছা না করিলেও অধীন। তাহার দাসত্ব শৃঙ্খল সকলের গলদেশে আভরণের ন্যায় দুলিতে থাকে; এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব তাহার অস্তিত্বে ডুবাইয়া দিয়া, নিজ নিজ মনুষ্যত্ব তাহার মনুষ্যত্বে মিশাইয়া ফেলিয়া, সকলে তাহারই চক্ষে দেখে, তাহারই কর্ণে শ্রবণ করে।

এইরূপে উপলব্ধ হইবে যে, জড়শক্তিও যেমন বাস্তব পদার্থ, কাহারও কল্পনার কথা নহে; মনঃশক্তিও সেইরূপ প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান বাস্তব পদার্থ শুদ্ধ একটি বাক্য নহে। জড়শক্তির নিকটও সমস্ত জগৎ যেমন আপনা হইতে শান্ত, অজড় মনঃশক্তির নিকটও সেইরূপ। রাজা, প্রজা কেহই কোন সময়ে মনঃশক্তির সেবা না করিয়া পারেন নাই। পুরাকালেও লোকে মনঃশক্তির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়াছে, আজও সেইরূপ করিতেছে, এবং শক্তি ও শাক্তের এই নিকট সম্বন্ধ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মানুষীশক্তির কার্য্যক্ষেত্র দুই,—জড় [illegible]

উপর উহা কিরূপে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছে। অনন্ত জড়জগতে মনুষ্য শুদ্ধ দুখানি হাত, দুখানি পা লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। এইক্ষণ দেখ মনুষ্যই জড়জগতের রাজা। জড়রাজ্যের সকল বিভাগ হইতেই তাহার রাজকর গৃহীত হইতেছে; তদীয় জয়বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র শোভা পাইতেছে। আকাশের বজ্র বিদ্যুৎ তাহার বার্ত্তাবহের কার্য্য করে, সাগর স্বকীয় ঊর্ম্মিবক্ষে তাহার দেশদেশান্তর যাতায়াতের পথ খুলিয়া দেয়, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত ভূতশক্তি ভৃত্যের ন্যায় তাহার দ্বারে বদ্ধাঞ্জলি দণ্ডায়মান। যখন যাহার প্রতি যে আদেশ হইতেছে, মস্তক নত করিয়া, তৎক্ষণে সে তাহা প্রতিপালন করিতেছে। যে এক সময়ে শত্রু ছিল, সে এইক্ষণ মিত্র হইয়াছে। যে একসময়ে প্রভু ছিল সে এইক্ষণ সেবকের ন্যায় পরিচর্য্যা করিতেছে।

প্রসঙ্গের অতিক্রম হয় বলিয়া এবিষয়ে আমাদিগের অধিক কিছু বক্তব্য নাই। মানুষীশক্তি মনোরাজ্যে কিরূপ কার্য্য করে, তাহাই আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

একটু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হয় যে, মনের খেলার জন্য মনোরাজ্যই

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। মানুষীশক্তি মানবজগতে যেরূপ বিকাশ লাভ করিতে পারে, অন্য কুত্রাপি সেরূপ সম্ভবে না। জড়রাজ্যে উহার গতি অব্যাহত, সুতরাং শিথিল। কিন্তু মানবজগতে উহাকে সর্ব্বদাই প্রতিবন্ধকের সহিত সাক্ষাৎ সংগ্রাম করিতে হয়। মনুষ্যে মনুষ্যে নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। মুখে একের সহিত অন্যের বিরোধ না থাকুক, ব্যক্তিরের আচরণে বিরোধের কোন লক্ষণ লক্ষিত না হউক, অথবা স্থূলদর্শীরা তাহাদিগকে পরস্পর প্রণয়বদ্ধ বলিয়াই বিশ্বাস করুক; তাহাদিগের অভ্যন্তরীণ শক্তিগত বিরোধ তথাপি চলিতে থাকিবে। জল যেমন স্বভাবতঃ নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়, মনুষ্যও তেমন স্বভাবতঃ স্বাধীনতা ভালবাসিয়া থাকে। স্বাধীনতা তাহার প্রাণের প্রাণ। মনুষ্যের আত্মা, জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারে হউক, শাস্ত্রানুশাসন চিকিৎসা না করিয়া, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে না। জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়পদার্থ নিচয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করা যেমন সহজ মানুষের উপর আধিপত্য স্থাপন করা, মানুষের পক্ষে সত্য সত্যই তেমন সহজ নহে। সম্বন্ধে যিনি যতদূর গৌরবান্বিত, ঘনিষ্ঠ, কিংবা প্রিয় হউন, মনুষ্যের মন, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া, কখনই সাধ করিয়া তাঁহার অধীন হইবে না। ইহা মানবজাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব। এইরূপে মনুষ্যে মনুষ্যে আপাত প্রতিঘাত চলিতেথাকে; পরিশেষে, যিনি পরীক্ষাতে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বলিয়া অনুভূত হন, তিনি প্রভুর পদ লাভ করেন; এবং হীনশক্তি ব্যক্তি আপনা হইতেই তাঁহার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে শাস্ত অথবা সেবক বলিয়া দণ্ডায়মান হয়। অনেক মনুষ্যের বাহিরের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া, আপাততঃ এইরূপ সংস্কার হইতে পারে যে, তাহাদিগের প্রকৃতিতে শক্তির কণামাত্রও বর্ত্তমান নাই। তাহারা পরপ্রভুত্বের শৃঙ্খল এমন প্রিয়জ্ঞানে বহন করে যে, তাহাদিগকে অমানুষ বলিলেও কোন দোষ হইতে পারেনা, কিন্তু ইহা আমাদিগের দেখিবার ভ্রম। আমরা যে সকল পুরুষকে একবারে শক্তিহীন মনে করি, তাহারাও বস্তুতঃ শক্তিহীন নহে। তবে কথা এই, তাহাদিগের শক্তি অতি দুর্ব্বল। যেমন বর্ত্তিকার ক্ষীণ আলোক বায়ুর প্রতিকূলে বহুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, তাহাদিগের দুর্ব্বল শক্তিও প্রবলতর শক্তির সংঘাতে তেমন বহুক্ষণ তিষ্ঠিতে সমর্থ হয় না।

কবি ও দার্শনিকগণ, মানুষীশক্তির গণনা করিতে হইলে, প্রধানতঃ বুদ্ধি,

হৃদয়, সাহস, বিবেক এবং চারিত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের অনেক অবান্তর ভেদ কল্পিত হইতে পারে, এবং ইহারা প্রত্যেকেই বহুমূর্ত্তিতে লোকলোচনের গোচর হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রয়োজনের জন্য এই বিভাগই সম্প্রতি প্রচুর। যে সকল কাব্যে, উপন্যাসে, কিংবা ইতিহাসে মানবচরিত্র সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার পত্রে পত্রে, পংক্তিতে পংক্তিতে, মনুষ্যপ্রকৃতির এই সকল শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনপ্রবাদও শতমুখে ইহাদিগের মহিমার সাক্ষ্যদান করিতেছে। অমুকে অমুকের বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইয়াছে, অমুকের হৃদয় শত্রুকেও মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, অমুকের সাহসের নিকট কেহই অগ্রসর হইতে পারে না, অমুকের চারিত্রগুণে সংসার বশীভুত, ইত্যাদি গভীর অর্থযুক্ত বাক্য লোকের মুখে মুখে ভ্রমণ করিতেছে।

মনুষ্যের এই শক্তি সমূহের নাম, উচ্চারণ সময়ে আমাদিগের হৃদয়কে কম্পিত করেনা, প্রয়োগ কালে পৃথিবীও উহাদিগের ভরে বিচলিত হয়। মানবমন এবং মানবসমাজের গঠন, বিকাশ, স্থিতি, পরিবর্ত্ত, এবং ক্ষয়বৃদ্ধির উপর ইহারাই চিরকাল কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে। ইহাদিগেরই শাসনে কেহ সিংহাসনে উঠিতেছে, কাহারও সিংহাসন টলিতেছে; কোন নূতন সাম্রাজ্য গঠিত হইতেছে, কোন পুরাতন সাম্রাজ্য, পুরাতন জীর্ণ প্রাসাদের ন্যায়, চূর্ণ হইয়া পড়িতেছে; দেশের রুচির স্রোত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; নীতি নিত্য নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; কোথাও সমাজ উৎপন্ন হইতেছে, কোথাও সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। ইতিহাস আর কিছুই নহে, মানুষী শক্তি মানবজগতে কিরূপে স্বাধিকার প্রসারণ করিয়াছে, তাহার এক দীর্ঘ কাহিনী মাত্র

·০:(০::০):০

মনুষ্যের জীবনচরিত।

বড় বড় লোকের জীবনচরিত পাঠ করিবার জন্য, সকলেই কৌতূহল প্রকাশ করে। যাঁহারা, সংসারে আসিয়া খাইয়া শুইয়াই কাল কর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনযাপন করিয়াছেন,— যাঁহারা তৃণের মত জোয়ার ভাটায় যাতায়াত না করিয়া এই অনন্ত কালসমুদ্রের সৈকতভূমিতে আপনাদিগের পদ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের আবির্ভাবে ধরা টলমল করি

য়াছে, চতুর্দ্দিকে হুলুস্থূলু পড়িয়াছে, মানবজাতি জয় হাসিয়াছে, নয় কাঁদিয়াছে, তাদৃশ অনন্যসাধারণ ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের ঘরের কথা জানিবার জন্য মনে স্বভাবতঃই এক বিষম কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয়। তাঁহারা ছোট বেলায় কিরূপে খেলা করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহারা যৌবন কালে প্রবৃত্তির তরঙ্গে কিরূপ হাবুডুবু খাইতেন; তাঁহারা পরিপক্ক প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইয়া, সমাজের অভিনয়ভূমিতে কিরূপে কার্য্য করিতেন এবং যবনিকার অন্তরালেই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিতেন, এই সমস্ত কথা বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সবিশেষ রূপে অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

নীতিবিশারদ পণ্ডিত মহাশয়েরা বলেন, পৃথিবীর প্রধান পুরুষদিগের জীবনবৃত্ত পাঠ কর; ক্রমেই মন, নীচভাব পরিত্যাগ করিয়া, মহদ্ভাবে আসক্ত হইবে। কবিসমাজ উপদেশ করেন, মহাত্মমনুষ্যদিগের ছবির প্রতি স্থিরনয়নে তাকাইয়া থাক,—তাঁহাদিগের চরিত চিন্তা কর, তবেই বুঝিতে পারিবে যে, মহত্ত্বের দ্বার তোমার জন্যও উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের জীবনচরিত কোথায় পাইব? পৃথিবীতে পোনের শোল আনা হইতেও অধিক লোক আসে আর যায়। তাহারা যে কোনসময়েও জীবিত ছিল, এমন বলিবার কারণ নাই। যদি তাহারাও জীবিত থাকিয়া থাকে, তবে তাহাদিগের শশ্রুশ্মশ্রু এবং অবনম্রযষ্টিও জীবিত ছিল। যাঁহারা জীবিত ছিলেন বলিয়া জগতে পরিচিত, তাহাদিগের বিষয়ই বা কে কি জানিতে পারে? কোন মৃত মনুষ্যের কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহ দর্শন করিয়া, কেহই তাহার মুখচ্ছবি ও রূপলাবণ্যের কল্পনা করিতে সমর্থ হয় না। সে কিরূপে হাসিত, হাসির সময়ে তাহার অধরপল্লবে কি কি ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইত,—তাহার ভ্রূ কোন্ সময়ে আকুঞ্চিত কোন্ সময়ে সরলায়ত থাকিত; তাহার নয়ন যুগল, মুখভঙ্গীর ন্যায় মনের কি কি নিগূঢ় কথা লোকের নিকট কহিয়া ফেলিত, ইত্যাদি সহস্র বিষয় মাংসচর্ম্ম বিবর্জ্জিত একখানি করোটি এবং করেকখানি অস্থির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়া যায় না। মনুষ্যের জীবনচরিতও এইরূপ। মনুষ্য মনুষ্যের বহিঃস্থ ক্রিয়াকলাপ অবলোকন করে। প্রকৃত মনুষ্যজীবন কুসুমকোরকের অন্তঃস্থ কিঞ্জল্কের ন্যায় পটলের পর পটল আবৃত থাকে। কাহারও চক্ষু সেখানে প্রবেশপথ পায় না। মনুষ্য আপনা কই আপনি জানে না। পরকে কিরূপে জানিবে? আপনার জীবন আপনিই পাঠ করিতে কেহ সমর্থ হয়

না। পরের জীবন কিরূপে পাঠ করিবে? যদিও প্রকৃতির কৃপাবলে, কেহ মানব-জীবনগ্রন্থের দুই চারি পংক্তি, কি দুই চারি পৃষ্ঠা, পাঠ করিতে সমর্থ হন; তিনি আবার ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। মানুষের ভাষা আজও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, এবং বোধ হয় এই অপূর্ণতা কখনও ঘুচিবে না। প্রভাতে কি সন্ধ্যার সময় অথবা বাটিকার প্রাক্কালের আকাশের জলদ মালা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত শোভা ধারণ করে, কত পরিবর্ত্তনের অধীন হয়; তাহা নিবিষ্টমনে পাঠ করিতে পারিলেই, মনুষ্যের বিস্তর প্রশংসা; তাবার আবার তাহা আঁকিয়া তুলিব, কেহই এমন আশা করে না। মনুষ্যের মন আকাশের জলদমালা হইতেও অধিক পরিবর্ত্তশীল। ভাগীরথীর লহরীলীলার বিরাম আছে। কিন্তু চিরচঞ্চল মনুষ্য মনের ভাবতরঙ্গে কখনও বিরাম নাই। কে তাহা গণনা করিবে? কে আবার তাহা বর্ণনা করিবে?

জীবনচরিত পাঠ করা গেল, আলেকজেণ্ডার, সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া, তদীয় প্রিয় ও পুরাতন সহচর ক্লিটসকে স্বহস্তে সংহার করিলেন, এবং ক্যালেসথেনেসের সাহসিক ভাষা সহ্য করিতে না পারিয়া, নিতান্ত ইতর জনের ন্যায় তাহাকে অপমান করিলেন। এই দুইটী—কার্য্য। ইহাদের কারণ কোথায়? আলেকজেণ্ডার এক সময়ে পুরুষপরম্পরাগত বীরদিগের ললাটের তিলক ছিলেন। কেন অকস্মাৎ তিনি এবংবিধ কাপুরুষ পদবীতে পদনিক্ষেপ করিলেন?—একসময়ে তিনি শত্রুরও সম্মান করিতে জানিতেন, কেন পরিশেষে তিনি মিত্রের মর্য্যাদাও ভুলিয়া গেলেন? তাঁহার প্রকৃতির এত পরিবর্ত্ত কেন ঘটিল? এই শৃঙ্খলবদ্ধ কারণ পরম্পরা কে দেখিয়াছে এবং কে তাহা বুঝাইতে পারিবে? বোনাপার্টি প্রসিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে মনুষ্যের জাতি সাধারণ অধিকার সমূহের একজন প্রধান রক্ষক ছিলেন। অবশেষে, তাঁহার কিরূপ মতস্খলন হয়,—রক্ষক, দুদিন না যাইতে না যাইতেই, কিরূপ ভয়ঙ্কর ভক্ষকবেশ ধারণ করেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার বাহিরের জীবন অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে বটে। কিন্তু তাঁহার বাহিরের জীবন, যে আভ্যন্তরীণ জীবনের সামান্য ছায়া মাত্র,—যে জীবনে 'কারণ' সকল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া, দৃষ্টিপথে কার্য্যফল প্রসব করিয়াছে, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় নাই। একথা সত্য যে, চরিতাখ্যায়কেরা এই উভয় মহাত্মার চরিত্র ভ্রংশের বহু কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু

তাঁহাদিগের হেতুবাদে মনস্তুষ্ট হয়, ইহা আমরা কথনই স্বীকার করিতে পারি না।

অনেকে, এই সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া, মনুষ্যের স্বরচিত জীবনবৃত্ত পাঠেই বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, পরে যাহা লিখে, তাহা হয় অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, না হয় অনুচিত স্তুতি কি অনুচিত নিন্দায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু মনুষ্য, পৃথ্বীতল হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়া যায়, তাহাতে অসত্য, অত্যুক্তি অথবা অজ্ঞতামূলক ভ্রম প্রমাদের কণিকাও থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষে কেহ কোন দিন আপনার জীবন কাহিনী আপনি লিখিয়া গিয়াছেন এমন আমরা জানি না। বাবর এবং আরংজীবের কথা অবশ্য গণনার বাহিরে রাখিতে হইবে। কারণ ইহাঁদিগকে ভারতবাসী বলিয়া স্বীকার করিতে আমাও কাহারও মন সম্মতি দান করিবে না। ভারতবর্ষের নাম উচ্চারণ করিলে, যে অস্তগত আর্য্য জাতির ভূতবৃত্তান্ত মনে সমুদিত হয়, তাঁহারা যদি স্বদেশের ইতিহাস এবং স্ব স্ব জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিয়া যাইতেন, তবে এই ধূলাবিলুণ্ঠিতা ভারত মাতা এখনও গায়ের ধুলি ঝাড়িয়া, আবার দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন। পুরাতন নাম এবং পিতৃপুরুষদিগের, পুরাতন কাহিনী মৃত দেহেও জীবন সঞ্চারণে সমর্থ হয়। ফলকথা এই মনুষ্যের জীবনবৃত্ত পাঠ করিয়া, কোন উপকারের প্রত্যাশা করিলে, আমাদিগকে ইউরোপ এবং আমেরিকাতেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্বদেশে সে সুখের আশা নাই।

ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার অনেক মহাত্মাই আপনার জীবন আপনি গ্রন্থবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ স্বকীয় জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আখ্যায়িকার প্রণালীক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ, সে পথ অবলম্বন না করিয়া, প্রণয়িবন্ধু বান্ধব কিংবা পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকট নিজ জীবনের প্রধান অপ্রধান ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা পত্র লিখিয়াছেন। বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবারস্থ ব্যক্তিরা তদীয় পরলোক প্রাপ্তির পর সেই সমস্ত পত্র যত্ন পূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়া,—প্রসঙ্গের সঙ্গতির জন্য মধ্যে মধ্যে আবার আপনাদিগের উক্তি পুরিয়া দিয়া, মনোজ্ঞ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরেজী গ্রন্থালয়ে ঈদৃশ গ্রন্থের কিছুই অসদ্ভাব নাই। নাম করিতে ইচ্ছা হইলে, অনায়াসে বড় ছোট শত শত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যের জীবনবৃত্ত পাঠ করা আবশ্যক কাহারও স্বরচিত জীবনচরিত পাঠে তাহা সম্যক্ সফল হয় কি না, বোধ হয় ইহা সংশয়ের বিষয়।

মনুষ্য ভীরু। মনুষ্য দুর্ব্বল। মনুষ্য পরের প্রশংসা যাঁচে পরের অপ্রশংসার শূন্যতার অপে লাগিলে চমক পড়ে। সুতরাং, মনুষ্য আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা বলে, তাহা বেদবাক্য স্বরূপ মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে, দুইবার চিন্তা করা আবশ্যক। এইরূপ মনে

করা যাইতে পারে যে, মনুষ্য, কোন নিভৃতস্থলে বসিয়া, মনের কবাট একবারে খুলিয়া দিয়া, জীবনের সমস্ত গূঢ় কথা যখন লিখিয়া যায়, তখন তাহাকে অবিশ্বাস করা একান্ত অসঙ্গত। কিন্তু আমরা স্পষ্টতার অনুরোধে উল্লেখ করিতেছি, এস্থলে বিশেষ কোন মনুষ্যের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলেও, মানবজাতির প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতাকে সম্যক্ বিশ্বাস না করিবার বহুকারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্য একাকী উপবিষ্ট হইয়াই আপনার কথা লিখে বটে। কিন্তু তাহার অবিরামপ্রসবিনী চিরসঙ্গিনী কল্পনা তাহাকে সে নিগূঢ় নির্জ্জন স্থানেও অসংখ্য মনুষ্য চক্ষুতে পরিবেষ্টিত করে। সে যেই মনে করে যে, তাহার দিক বর্ত্তমান ও ভাবিকালের লক্ষ চক্ষু তাকাইয়া রহিয়াছে; অমনি তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। যাহা সাদা মনে লিখিয়া ফেলিবে স্থির করিয়াছিল, এইক্ষণ সে তাহা একটুকু সাবধান ভাবে লিখে, এবং লিখিয়া, এখান হইতে একটি অনুস্বার তুলিয়া ফেলে, এবং ওখানে দুটি বিসর্গ ভরিয়া দেয়। তাহার হাতের কাগজখানিতেও তাহার সম্যক্ প্রত্যয় থাকে না। এইরূপ সংশোধনের পর সংশোধন, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে, লেখকের প্রকৃত ও লিখিত জীবনে ক্রমে ক্রমে এত প্রভেদ হইয়া পড়ে যে, বিবেচনার সহিত দেখিলে একটিকে অন্যটির প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার করাও কঠিন হয়। পৃথিবীর অনেক প্রধান পুরুষের স্বলিখিত জীবনবৃত্ত এই দোষে দূষিত।

অনেকে অপেক্ষাকৃত সরল হইয়াও, দুর্ভাগ্যবশতঃ আত্মবঞ্চক। তাঁহারা বস্তুতঃ যাহা নহেন, আপনাকে আপনার নিকট তাহা প্রমাণ করিবার অভিলাষে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইয়া, পরিশেষে এমন জটিল ভ্রমজালে জড়িত হইয়া পড়েন যে, তাহা হইতে বাহির হওয়া আর তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের অনেক স্মরণীয়নামা ব্যক্তি, আপনার কাহিনী আপনি কহিতে গিয়া, এইরূপ ঠকিয়াছেন। তাঁহারা, ক্রোধে অধীর হইয়া পরপীড়নে প্রবৃত্ত হইলে, তাদৃশ প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূরণ বলিয়া মনের নিকট প্রবোধ দিয়াছেন, এবং লোকেও সুতরাং ঐরূপ বুঝাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সরলতার প্রতি অনেকের সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহারা সরল ভাবে নিজ নিজ মনের গতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথার উপরও লোকের তেমন আস্থা নাই।

কেহ কেহ আবার, সরলতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, দম্ভের শরণ লইয়াছেন। তাঁহারা দম্ভভরে সংসারকে তৃণের সমানও জ্ঞান করেন নাই। লোকে হাসুক কি ভালবাসুক কিছুরই প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, নিজ জীবনের লোকভয়ঙ্কর দোষ সমূহ কীর্ত্তন করিতেও তাঁহাদিগের অরুচি হয় নাই। তাঁহারা জগতকে চমকিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং বস্তুতঃও জগৎ চমকিত হইয়াছে।

আধুনিক কবিসম্প্রদায়ের শি[illegible] পুত্তল লর্ড বাইরনকে আমরা এ

শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করি। বাইরণ আত্ম সম্বন্ধে ভ্রমান্ধ ছিলেন না; অভিমানে অন্ধীভূত ছিলেন। তিনি, অভিমানের উপর নির্ভর করিয়া শব্দের অর্থ পরিবর্ত্ত করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার অভিধানে পরিণাম দর্শিতার নাম ভীরুতা এবং লোকের প্রতি শ্রদ্ধার নাম কাপুরুষতা। অনেক কথা তাঁহার লিখিতে লজ্জা হয় নাই; লোকের পড়িতে লজ্জা হয়। লজ্জার সঙ্গে দুঃখও হয়। অমন ব্যক্তিটা, কেন সাধ করিয়া, আপনার অঙ্গে আপনি এত দাগ দিল,—ছিল যা ছিল, কেন কালিকলমে আবার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেল ইহা মনে করিলে মন পোড়ে। তিনি কবি বর মূর এবং অন্যান্য বন্ধুর নিকট পত্র লিখার ছলে, আপনার যে ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার সমকালবর্ত্তিদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা তাঁহার ছবি বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি কবি,—তাই কল্পনার কুহকে পড়িয়াছিলেন। আপনার প্রকৃতি যত না নিন্দিত, কি ভয়ানক দম্ভ! লোকের নিকট উহার তদপেক্ষাও নিন্দিত মূর্ত্তি প্রদান করিতে, যত্নশীল হইয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে অতি নিন্দা ও অতি স্তুতি উভয়ই সমান।

আত্মদোষকীর্ত্তনে, রুসিয়ু বাইরণকেও পরাভব করিয়াছেন। রুসিয়ু বাইরণের ন্যায় অভিমানে [illegible]ভূত হইয়া লিখেন নাই। সংসার তাঁহাকে সরল বলিয়া ধন্য ধন্য করিবে, তিনি, এই লোভবশতঃই, আপনার সম্বন্ধে মানব-জিহ্বার অবক্তব্য মানবকর্ণের অশ্রোতব্য নানা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর লোক এমনই ছলগ্রাহী, এত যে প্রকাশ করা হইয়াছে, তথাপি অনেকে বলে যে, রুসিয়ু স্থানে স্থানে চন্দ্রবিন্দু চুরি করিতে ত্রুটি করেন নাই। ডাকাতি করিয়াছি, এমন কথা স্বীকার করিতে অনেকের সঙ্কোচ হয় না। স্বচরিত্রে চৌর্য্যদোষের সংস্পর্শ থাকিলে, সেটুকু যত্নের সহিত আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হয়। রুসিয়ুর স্বলিখিত জীবনবৃত্তে অবিশ্বাসীরা এই দোষ আরোপণ করেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার যে, তিনি স্বকীয় চরিত্রের যে সকল দোষকে বিশেষ দোষ বিবেচনা করেন নাই, তৎসমুদয়ই অক্ষুব্ধমনে বর্ণনা করিয়াছেন। যে গুলিকে তাঁহার নিজ মনেই একান্ত অপমানজনক বলিয়া বোধ ছিল, তাহার আবরণ যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে।

অল্পদিন হইল, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের স্বরচিত জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনাতন অনেক লোকেই তাঁহাকে বুদ্ধিগত ক্ষমতা বিষয়ে অসাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া থাকেন। মিল আপনিও আপনাকে অসাধারণ মনে করিতেন, এইরূপ বিশ্বাস করিবার বিস্তর কারণ রহিয়াছে। তাঁহার চরিত্র যে সর্ব্বাংশে না হউক, অনেক অংশে তদীয় বুদ্ধির অনুরূপ ছিল, ইহাতেও সংশয় হইতে পারে না। তথাপি বোধ হয়, আপনার কাহিনী আপনি বলিবার সময়, অন্যান্য ব্যক্তিরা যে দোষে নিপতিত হইয়াছেন মিলও তাহা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। হিতবাদি-

সম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক জেরিমি বেন্থামের নিকট মিলেরা পিতাপুত্রে অনেক বিষয়ে বিশেষরূপে ঋণী ছিলেন মিল বেন্থামের প্রতি কোন অংশ অকৃতজ্ঞের ভাব প্রকাশ করেন নাই। অথচ বেন্থামের ঋণ পরিশোধের জন্য, হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া যে সকল কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা উচিত ছিল, বোধ হয় তাহার অনেক অনুল্লিখিত রহিয়াছে। বেন্থামের চরিত্রখ্যায়ক মিল এবং মিলের পিতাকে ক্ষমতা ও চরিত্র বিষয়ে যে স্থান প্রদান করিয়াছেন, মিল আপনাকে আপনি, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিতাকেও তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে তুলিতে যত্ন করিয়াছেন। বুদ্ধি অসাধারণ হইলেই যে স্বগুণপক্ষপাতিতা তিরোহিত হয়, এমন নহে। জীবিত মনুষ্য স্তুতির মোহনকণ্ঠে বিমোহিত হয়। মুমূর্ষু মনুষ্য এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পায়, ইহা কে বলিবে?

আপনার জীবন আপনি লিখিলেই যদি এত দোষ ঘটে, উহা পরের লেখনীদ্বারা আলিখিত হইলে, কত অপূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মনুষ্য আপনার চক্ষে এক, পরের চক্ষে আর। সে যতক্ষণ একাকী, ততক্ষণ সরল। যেই তাহার উপর পরের দৃষ্টি পড়িল, অমনি কপট তার অদৃশ্য আবরণে তাহার তনু আবৃত হইল। ইহা মনুষ্যের স্বভাবের দোষ নহে, মানবসমাজের অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনের, ফল। সর্ব্বতোভাবে সরল ব্যক্তি মানবসমাজে এক দিনও তিষ্ঠিতে পারে কি না সন্দেহ। ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে যে, শয়নঘরের সেবকের নিকট কোন মহাত্মাই দেবতা নহেন। কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত ইহাও বলিয়াছেন,—যদি কাহারও স্বভাবের অনুসন্ধান করিতে চও, তাহার ভৃত্যের নিকট জিজ্ঞাসা কর। এইসমস্ত প্রচলিত অর্থ বড়ই গভীর। লোক, আপনা হইতে উচ্চ কিংবা আপনার সমানব্যক্তির সন্নিধানে গমন করিবার সময় যেমন ভাল বস্ত্রাদি ব্যবহার করে, সেইরূপ স্বকীয় স্বভাবের উপরও ভাল এক খানি আবরণ দিয়া যায়। ঘরে যখন সে একাকী উপবিষ্ট থাকে, যখন সেবক ব্যতীত অন্য কেহ তাহার নিকট যাতায়াত করিতে পারে না, তখন বস্ত্রাদির উপরও তাহার মনোযোগ থাকে না। স্বভাবের বহিরাবরণ দিয়েও, সে তত মনোযোগ রহে না।

চরিতাখ্যায়কেরা প্রায়শঃই বহিঃস্থ ব্যক্তি। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখিতে পান, তাহার সঙ্গে কল্পনার কোটি কথা মিশাইয়া বাস্তব এবং অবাস্তব উভয়বিধ উপকরণ দিয়া এক অদ্ভুত বস্তু সৃজন করেন। কেন না কথা বলিলে লোকের মনে বিস্ময়রসের সঞ্চার হইবে। কিসে সংসার মুগ্ধ এবং গ্রন্থের অধিকৃত ব্যক্তির প্রতি মনুষ্যের চক্ষু আকৃষ্ট হইবে, এবিষয়ে যে পরিমাণে যত্ন থাকে, বোধ হয় অবিমিশ্র সত্য প্রকাশের জন্য তাঁহাদিগের তেমন যত্ন হইয়া উঠে না।

চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে অনেকে—ভক্ত। ভক্তেরা মৃত মহাত্মার গুণরাশি স্মরণ করিয়া, ভক্তির তরঙ্গে নাচিতে থাকে; দোষভাগের প্রতি

ভুলিয়া ও দৃষ্টিপাত করেন না। অনেকে স্নেহানুরক্ত। স্নেহ মনুষ্যের চক্ষে কিরূপ ধূলি নিক্ষেপ করে তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। পুত্র কি কন্যা পরলোকগত পিতার জীবনবৃত্ত লিখিতে উপবিষ্ট হইলে, অথবা পত্নী সংসারের নিকট মৃত পতির পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিলে তাঁহাদিগের উদ্বেল হৃদয় কতদিগে প্রবাহিত হয়; তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কত ভ্রমে নিপতিত হন, তাহা হৃদয়ালু ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। অনেকে ভক্তি স্নেহের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অনুরাগ নিবন্ধন অন্ধ হইয়া পড়েন। ক্রমওয়েলের জীবনচরিত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন লেখক ক্রমওয়েলকে দেবতা হইতেও বড় বলিয়া বর্ণনা করেন; কেহ কেহ আবার দস্যুর সহিত তাঁহার তুলনা দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। লেখকদিগের রুচি ও প্রবৃত্তির বৈষম্য নিবন্ধনও অনেক স্থলে একই ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনার বৈষম্য ঘটিয়া উঠে। অনেকের জীবনচরিত হইতেই এ কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা তাহা না করিয়া, কাব্য হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। শকুন্তলার নাম ও চরিত্রের সহিত পরিচয় না আছে, এদেশে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু ব্যাসের শকুন্তলা এবং কালিদাসের শকুন্তলা একস্থলে দণ্ডায়মান হইলে, ইনিও যে উনি এইরূপ অবধারণ করা, অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়। ব্যাসের শকুন্তলা পরুষাক্ষরভাষিণী প্রগল্‌ভস্বভাবা তাপসী—কথায় কথা কাটিতে সঙ্কোচ নাই, রাজা বলিয়া ভ্রূক্ষেপ নাই, লোকে কি কহিবে, কি না কহিবে, তৎপ্রতি অণুমাত্রও দৃষ্টি নাই। কবির মানসকাননের শকুন্তলা লতার ন্যায় কোমলা, নিঃশ্বাসের ভরও সয় না, আপনার তনুতে আপনি আবৃত। এইরূপ চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা ওজোগুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগের লেখনীর গুণে অনেক দীনসত্ত্ব ব্যক্তিও ওজস্বল বলিয়া প্রতিভাত হন এবং সময়ে সময়ে যথার্থ বীরপুরুষেরাও, কাপুরুষের হাতে পড়িয়া, কাপুরুষপংক্তিতে মিশিয়া যান।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের কোন মহাত্মাই আপনার জীবনচরিত আপনি লিখিয়া যান নাই ভারতবর্ষীয়েরা পরের জীবনচরিত লিখিতেও জানিতেন না। তাঁহারা কবিতার কলকণ্ঠ শ্রবণেই মোহিত থাকিতেন। আর কোন দিগেই চিত্ত প্রেরণ করিতে অবসর পাইতেন না। শাক্য সিংহ, শঙ্করাচার্য্য, এবং চৈতন্যদেব প্রভৃতি কতিপয় সাধু পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত অংশতঃ সঙ্কলিত আছে। কিন্তু তাহাও ভক্তের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে। পারসীকেরা, এবিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও প্রতিবেশীর সংসর্গদোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত নহেন। জীবনচরিত লেখার আড়ম্বর গ্রীসদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পশ্চিমে। সেদিকে যত জনে অদ্যাপর্য্যন্ত লোকের জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পণ্ডিতদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে বস্‌ওয়ে-

লই বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। পণ্ডিতেরা বলেন, বস্ওয়েল চরিতাখ্যায়কদিগের রাজা। তিনি জনসনের সম্বন্ধে চরিত লেখকের কার্য্য করিতে গিয়া, চিত্রকরের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকায় সকলই উঠিয়াছে। আমরা যদিও বস্ওয়েলের চিত্রনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকি, তথাপি মানবপ্রকৃতি স্মরণ করিয়া ইহা না বলিয়া পারি না যে যথাযথ বর্ণনা বিষয়ে বস্ওয়েলও সকল সময়ে কৃতকার্য্য হন নাই। বস্ওয়েল, জনসনের আত্মার ভারে একবারে অভিভূত ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও জনসন বিনা আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। দুর্ব্বলস্বভাবা কুমারীরা যেরূপ ভূতাবিষ্ট হইয়া থাকে তিনিও সেইরূপ জনসন কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াছিলেন। এইগুণেই তিনি অভীপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইয়াছেন; অথচ এই গুণই আবার তাঁহার প্রধান দোষ। জনসনের সহিত পরের তুলনা করিবার কালে, তাঁহার ন্যায় অন্যায় বোধ থাকিত না; এবং তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনের জন্য যেরূপ বুদ্ধি আবশ্যক, তাহাও তাঁহার ছিল না। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি জনসনের নিকটবর্ত্তী হইলেই স্তম্ভিত হইত। ওদিগে জনসন যতই সাধু হউন তিনি বস্ওয়েলকে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলিয়া জানিতেন। বস্ওয়েল তাঁহার মুখের কথা, নয়নের ভঙ্গি তাঁহার হাস্য, তাঁহার ক্রোধ সমস্তই গ্রন্থবদ্ধ করিতে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইহা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগিত। মনে প্রতিক্ষণে এইরূপ ধারণা থাকিলে, কাহারও যথার্থ জীবন প্রকটিত হয় কি না তৎসম্বন্ধে হাঁ কি না বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

জীবনচরিত পাঠের ফল সম্বন্ধে লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ বলেন, জীবনচরিত মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের শাখা। বিশেষ মানবপ্রকৃতির মর্ম্মপরিগ্রহ করা মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের জীবনগ্রন্থ সমালোচনা দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সংসিদ্ধ হয়। মানব মন অঙ্কুরিত অবস্থায় কিরূপ থাকে, উহার বৃত্তি সমুদায় কুসুমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে কিরূপে বিকশিত হয়, মনুষ্য কি অভিলাষে কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার হৃদয়যন্ত্রের কোন্ অঙ্গ স্পর্শ করিলে কখন কি বাদ্য বাজিয়া উঠে ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বই তাঁহারা জীবনচরিত পাঠ করিয়া সঙ্কলন করিতে ইচ্ছা করেন। মনুষ্যের যথার্থ জীবনবৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, এই উদ্দেশ্য কেন, ইহা হইতে মহত্তর উদ্দেশ্যও জীবনচরিত পাঠেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু, জগতে যে প্রণালীতে মনুষ্য মনুষ্যের জীবন পাঠ করে, এবং পাঠ করিয়া লিপিবদ্ধ করে, তদ্দ্বারা তাদৃশ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে কি না, ইহা বস্তুতঃই চিন্তনীয়। বৈজ্ঞানিক, স্বকীয় ব্রত বিস্মৃত হইয়া, কবির কল্পনা ও বীণা লইয়া উপবেশন করিলে, না বুদ্ধিই ভোজ্য লাভ করে, না হৃদয়ই দ্রবীভূত হয়। যাহা হউক, এত অপূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা মনুষ্যের জীবনচরিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না। ইতিহাসশাস্ত্র এই দোষে দূষিত, তথাপি ইতিহাস জগ

তের মহদুপকার সংসাধন করিতেছে। জীবনচরিত শাস্ত্র, এই দোষে দুষিত হইলেও, তীক্ষ্ণ আলোচনা দ্বারা যথ সম্ভব শোধিত হইয়া, জগতের মহদুপকার সংসাধন করিবে। ইতিহাস মানবজাতির জীবনচরিত; জীবনচরিত মনুষ্যবিশেষের ইতিহাস যেমন ইতিহাস, প্রাচীন পিতামহের ন্যায়, জগতের ভূত কথার প্রস্তাব করিয়া, মানবজাতির নির্ব্বাণোন্মুখ আশার উদ্দীপন করে,—কোন্ জাতি উন্নতির সোপানে ক্রমে ক্রমে কিরূপে উঠিল, ক্রমে আবার কিহেতু জলে জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইল, তাহা কহিয়া নিয়ত শিক্ষা দেয়; মনুষ্যের জীবনচরিতও মনুষ্যকে সেইরূপ উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করে। জাতির কাহিনী ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলেও, ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়; সেই সুখ, সেই দুঃখ, সেই আশা, সেই উদ্যম, সেইউত্থানও পতন; কেবল আধারের ভেদ।

(পরিব্রাজকের পত্র)

ফুলবধূ।

বঙ্গসুন্দরীরা শিরোনাম দেখিয়া মনে করিতে পারেন যে লেখক কুলবধূ লিখিয়াছিল;—মুদ্রাযন্ত্রের অপদেবতা পরিহাস করিবার অভিলাষে, কুলবধূরে ফুলবধূ করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তব তাহা নয়। যাঁহাদিগের কথা লিখিত হইবে, তন্ত্রে ও পুরাণে তাঁহারা ফুলবধূ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এস্থলেও সুতরাং তাঁহাদিগকে ফুলবধূই বলা হইল। যেমন বাগানের ফুল,—ফোটে, ফুটিয়া কিছুকাল রূপরাশি বিকাশ করে, আবার দেখিতে না দেখিতেই ঢলিয়া পড়ে, পৃথিবীর কোন কাজে আসে না; কুলবধূদিগের মধ্যে ফুলবধূরাও সেই রূপ। তাঁহারা কেন সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া কি করেন, তাহা এক জানেন তাঁহারা, আর জানেন যাঁহারা তাঁহাদের ভক্ত। তবে তন্ত্রশাস্ত্র সত্য হইলে, সে এক পৃথক্ কথা।

শুনিয়াছি বিলাসতন্ত্রের কর্ম্মনাশ নামক পঞ্চম পটলে লিখিত আছে, একদা গিরিরাজনন্দিনী গৌরীশিখর নামক মহাপ্রস্থে মহেশ্বর সহিত ব গাসনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময়ে, গোরূপিণী বসুন্ধরা তাঁহার চরণো-

পাদে সমাগত হইয়া অতি করুণকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "দেবি! আমি ধরাতলবাসী বীরদিগের পদভরে একবারে রসাতলগামিনী হইলাম। ইহাদিগের সংখ্যা ইদানীং এত বাড়িয়া পড়িয়াছে যে, আমি কোন ক্রমেই আর সে ভার সহিতে পারি না। ইহাদিগের ভৈরবনাদ এবং অস্ত্রে ঝম্ফনের ভয়ঙ্কর শব্দে আমার দুই কর্ণ বধির হইয়াছে। ইহারা সমরমদে মত্ত হইয়া যে দিগ দিয়া চলিয়া যায়; আমার জ্ঞান হয় আমার পৃষ্ঠদেশ সেই দিগে শতহস্ত বসিয়া পড়ে। আপনি অভয়া, ভয়হারিণী। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সকলই আপনার মহিমা। যদি আপনি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপে আমায় উদ্ধার না করেন, আমি এই দণ্ডেই আপনার সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ করিব। দেবী শুনিয়া কাতর হইলেন, এবং কাতরনয়নে মহেশের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে, নয়নভঙ্গিতেই ভোলানাথের মন বুঝিতে পারিয়া, পদ্মহস্তে আশ্বাস দিয়া মৃদু মোহন স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'বসুন্ধরে! তুমি আর বিলাপ করিও না। তোমার বিলাপ ও পরিতাপে আমার প্রাণ আকুল হইয়াছে। আমি সদাই তোমার ভার মোচনের ব্যবস্থা করিব। আমার পিতার অধিকারে অরবিন্দ নগরে পঞ্চ লক্ষ বিদ্যাধরী বসতি করিতেছে। ত্রিলোকে উহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। উহাদের কুহকে যোগীর যোগভঙ্গ হয়, মুনি মৌনব্রত পরিত্যাগ করে, পাষাণ প্রমত্তের ন্যায় নাচিয়া উঠে। মর্ত্ত লোকের বীর কোন্ ছার। আমি উহাদিগকে মানুষের মূর্ত্তি দিয়া সংসারে প্রেরণ করিব। উহারাই তোমার সকল যন্ত্রণা দূর করিবে বৎসে! তুমি যাহাদিগকে বীরপুরুষ বল, যাহাদের গর্জ্জনে তোমার কর্ণ ব্যথা পায়, পদন্যাসে পৃষ্ঠদেশ পীড়িত হয়, উহাদের নিকট দুদিনও তাহারা ঠিক থাকিতে পারিবেনা। এমনই অদ্ভুত মায়া, উহাদের গায়ের বাতাস লাগামাত্র তাহারা মেষের ন্যায় বশ হইবে, পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় পোষ লইবে সাধ করিয়া গলায় শিকল পরিবে, রণক্ষেত্রের হুঙ্কার ছাড়িয়া মৃদুতানে গান গাইবে, ধনুক ও তরবারি ভাঙ্গিয়া বাঁশিও মন্দিরা বানাইবে, রক্তাক্ত কলেবর ধুইয়া দিয়া চন্দন, চুয়া ও আতর মাখিবে, এবং প্রতিবেশী চরণে আঘাত করিলে, ক্রোধের কথা ছাড়িয়া দাও, ভক্তির সহিত সেই চরণ লেহন করিবে। তুমি যা আশা না কর, তাহাদের দ্বারা তাহাও সম্পন্ন হইবে। তুমি ঊর্দ্ধরেতা তাপসদিগের কথা কহিয়া, আমার কাছে অনেক সময় দুঃখ করিয়াছ। তপস্যার নামে পৃথিবী হ-

ইতে উঠিয়া যাইবে। মনুষ্যের চিন্তানল তোমায় আর দগ্ধ করিতে পারিবে না। একবার উহাদিগের দৃষ্টি পড়ুক, চিন্তাশীল ছাত্র অধ্যয়নচিন্তা পরিত্যাগ করিবে, চিন্তাশীল বিষয়ী বিষয়চিন্তায় জলাঞ্জলি দিবে, চিন্তাশীল যোদ্ধা যুদ্ধের জয়পরাজয়চিন্তা পরিহার করিয়া, উহাদের চরণচিন্তাই সার করিবে। ভীরু! তুমি এইক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে স্বস্থানে গমন কর।

যে তন্ত্রের কথা উল্লিখিত হইল, তাহাতে আরও লেখা আছে যে, বসুন্ধরার তিরোধানের পর, অরবিন্দ নগরের বিদ্যাধরসুন্দরীরা, জয়া ও বিজয়ার মুখে ভবানীর দারুণ বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বিস্তর রোদন করিয়াছিল। ভক্তবৎসলা প্রসন্না হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন দেখ! তোমরা কোন অপরাধ কর নাই সুতরাং আমি যাহা আদেশ করিয়াছি, তাহা অভিসম্পাত নহে। তোমরা মর্ত্ত্যলোকের ভার মোচনের জন্য যাইতেছ, অতি শীঘ্রই সেই ভার মোচন করিয়া ফিরিতে পারিবে। তোমরা যে দেশ কি যে নগরে বাস করিবে, দেখিতে দেখিতেই সেই দেশ ও নগর উচ্ছিন্ন যাইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের কখনও কালবিলম্ব হইবে না পৃথিবীতে না জানি কতই কষ্ট পাও, এই ভাবিয়া তোমরা আকুল হইয়াছ। কষ্ট পাওয়া দূরে থাকুক, পৃথিবীতে কেহ কোন দিন যে সুখ ও সম্মান স্বপ্নেও দেখে নাই, আমার বরে তোমরা সেই সুখ ও সেই সম্মান উপভোগ করিবে। রাজমুকুটসমূহ তোমাদের পায় লুটাইয়া পড়িবে, পণ্ডিতেরা করপুটে তোমাদের বন্দনা করিবে, তোমাদিগকে কেহ নিন্দা করিলে, বীরেরা একে অন্যের গলায় ছুরি বসাইয়া দিবে। যে গায়ক তোমাদিগের গুণগান করিবে না, আমি কহিতেছি, পৃথিবীতে তাহার গান কেহ শুনিবে না। যে কবি, সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া, অহর্নিশ তোমাদের মধুমাখা কথা কীর্ত্তন করিবে না, যদি আমার মহামায়া নাম সত্য হয়, তাহার কথায় কেহই কর্ণ দিবে না। তোমরা কোন শ্রম করিও না। পৃথিবীর অবলারা, গৃহকার্য্য ও সন্তানপালনের জন্য যে সকল দুর্ভোগ ভোগ করে, তোমরা তাহার ত্রিসীমায়ও যাইও না। পায় আলতা মাখিয়া, নানাফুলের মোহন মালায় অঙ্গ মণ্ডন করিয়া, পালঙ্কের উপর বসিয়া থাকিও, তাহাতেই দেবকার্য্য সাধিত হইবে তোমাদের চক্ষুর দৃষ্টি, তোমাদের দেহের সৌরভ, তোমাদের শ্বাস প্রশ্বাসেই বসুন্ধরার দুঃখভার দূর হইবে। তোমাদিগকে এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি, তোমরা স-

কলে এককালে এবং একদেশে অবতীর্ণ হইওনা। এত কমল একসঙ্গে ফুটিলে সৃষ্টিরক্ষা কমলাপতির কঠিন হইয়া উঠিবে।

সংসারে যাঁহারা ফুলবধূ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা অরবিন্দবাসিনী মায়াবিনীদিগের অবতার কিনা, ঠিক বলা যায় না। লক্ষণে অনেকটা মিল আছে, এইরূপ কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু অনুমানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা অনুচিত।

ফুলবধূরা সকল দেশে এক নামে অভিহিত নহেন, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারও সকল দেশে একরূপ নহে। তাঁহাদিগকে বিলাতে কয় বেল, ইরানে কয় নাজনী, তার একটুকু পূর্ব্বে কয় ফুলবিবি; বাঙ্গালায় তাঁহাদিগের অনেক নাম। বাঙ্গালিদিগের ঘরে কোন কোন মুখরা প্রাচীনা তাঁহাদিগকে পোসাকি বৌ বলিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত ধৃষ্টতা। যদি মানুষের উদরের চিন্তা না থাকিত, বিষয়ের চিন্তা না থাকিত, সংসারের নানা ভাবনা ভাবিতে না হইত, লেখাপড়া এবং কাজ কর্ম্মের কুৎসিত প্রথা এবালিষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে, সোনাদিয়া গড়িলেও ফুলবধূদিগের অপেক্ষা জীবনের ভাল সঙ্গিনী যুটিত না। একখানি পট, কি একখানি হাল কা গোছের নাটক লইয়া, তাঁহাদিগের নিকটে বসিয়া, মৃদু মৃদু কথায় কাল যাপন করা যাইত। পৃথিবী আছে কি নাই, কোন তত্ত্বই কর্ণে আসিত না জীবনজলধির একটি তরঙ্গও গায় আসিয়া ঠেকিত না ঐ সকল ভবযন্ত্রণা আছে বলিয়াই বিষয়ার্ণবমগ্ন পাষাণ হৃদয়পুরুষ সকল সময়ে তাঁহাদিগের সম্মান আদর করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

ইতি পবিত্র জক শ্রীকল্যান ভট্ট শর্ম্মণঃ।

——০:(০::০):০——

বাদল।

(সুরট মল্লার কওয়ালী)

আজি দেখ কামিনী সজল বাদল।
মেঘরাশি যেন চিকুর বিলাসে,
চপলা চমকে হাসে রে।
ঘুমু ঘুমু রোলে, ঘুঙুর বোলে,
ঝমকে কঙ্কন করকারে।
সুরচিত বাসে, ভূষণ প্রকাশে
শিখিকুলে যেন উপহাসে রে।
প্রণয় পিপাসে, মৃদু মধু ভাসে,
ধীরি ধীরি চাতক বোলে রে।
অঞ্চল পবনে, মন্থর গমনে,
বিরহী আঁখি পথে বরষেরে।

(প্রবাসী)

রিশিলু।

-*-

কেহ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া রাজ্য শাসন করে। লোকে তাহাকে রাজা বলে। কেহ, রাজসিংহাসনের নিকটে মাত্র থাকিয়া,—রাজকীয়চন্দ্রাতপের ছায়ামাত্র প্রাপ্ত হইয়া, রাজা ও রাজ্য উভয়কেই নিজ শাসনের অধীন করে। লোকে যে নামই প্রদান করুক, তাদৃশ ব্যক্তি রাজার রাজা। বুদ্ধিই তাহার বল এবং স্বকীয় স্বাভাবিক প্রভাবই তাহার সিংহাসন। ফ্রান্সের অধিপতি ত্রয়োদশ লুইর ভুবনবিখ্যাত অমাত্য ধীমান্ রিশিলু এইরূপ বুদ্ধিবৈভব এবং এইরূপ অলোকসামান্য মনস্বিতার এক প্রধান স্থল। রিশিলুর সদৃশ রাজমন্ত্রী কোন সময়েও কোন রাজ্যের মন্ত্রভবনে প্রবেশন করিয়াছে কি না, ইহা অনেকে সংশয় করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সকলের বিবেচনায়, রাজনীতির কূটমন্ত্রণা এবং শাসনপ্রণালীর সর্ব্বাঙ্গীণতা বিষয়ে, এক ন্যাপোলিয়ন বিনা কারও সহিত রিশিলুর তুলনা হয় । সেই ন্যাপোলিয়নকেও তিনি অনেক বিষয়ে রিশিলু হইতে ধৃষ্ট জ্ঞান করেন।

প্রধান রাজপুরুষদিগের চরিত্র ও কার্য্যপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা প্রায়শঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহাদিগের এক অংশ সিংহজাতীয় এবং আর এক অংশ শৃগালজাতীয়। শৃগালস্বভাবাপন্ন রাজপুরুষেরা ধূর্ত্ত, নীচাশয় ও বঞ্চক। তাঁহারা চাতুরীজাল বিস্তার করিয়া বিপক্ষের অনিষ্ট এবং স্বপক্ষের পুষ্টিসাধন করেন, অম্লানবদনে অসত্য বলেন অকাতরে ইতর জনের আচার অবলম্বন করেন, প্রবল দেখিলে পদতলে বিলুণ্ঠিত হন এবং আপনা হইতে হীনবল বুঝিলে ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে মস্তকে উঠিয়া বসেন। তাঁহাদিগের স্তুতি প্রয়োজনের অনুরোধে, সুতরাং মিথ্যা স্তুতি। তাঁহাদিগের ক্রোধও প্রয়োজনের অনুরোধে, সুতরাং মিথ্যা ক্রোধ। রিশিলুর প্রাসাদের পঞ্চক্রোশীর মধ্যেও এবংবিধ শৃগালনীতি প্রবেশপথ পাইত না। দুইশত বৎসরের অধিক হইল, তিনি লোকলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার নাম করিবার সময়, ফরাসীদিগের অদ্যাপি আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্রুশিয়ার রাজতন্ত্রীর বর্ত্তমান কর্ণধার বিস্মার্কের লোকে

অতিপ্রধান মন্ত্রী বলিয়া প্রশংসা করে। বোধ হয়, সকলদিকে দৃষ্টি করিলে বিস্‌মার্ককেও রিশিলুর সমান জ্ঞান করা যায় না। বিস্‌মার্ক রাজার প্রিয়, রাজমহিষীর প্রিয়, সমস্ত রাজপরিবারের প্রিয়। প্রুশিয়ার অধিকাংশ প্রধান ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে বিস্‌মার্কের স্বপক্ষ। স্বকীয় বিশাল মস্তিষ্ক ব্যতীত ফ্রান্সে রিশিলুর আর সহায় কি স্বপক্ষ ছিল না। তিনি, যতকাল কর্ত্তৃত্ব করেন, তাহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, নিয়ত সহস্র তরবারির লক্ষ্য ছিলেন। শল্লকী যেমন কণ্টকাবরণে সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া আত্মরক্ষা করে, অথচ সকলদিগেই অরাতিবর্গকে আক্রমণ করিতে সমর্থ থাকে, তিনিও সতত ঠিক সেইরূপ সংরক্ষিত অথচ আক্রমণের জন্য সসজ্জ থাকিতেন।

রাজা ত্রয়োদশ লুই সর্ব্বান্তঃকরণে রিশিলুকে বিদ্বেষ করিতেন রিশিলু মরণাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, অধীরহৃদয়ে দিন গণনা করিতেন, রিশিলুকে পদচ্যুত কিংবা দেশান্তর করারজন্য দিনে দ্বাদশবার দৃঢ় সংকল্প হইতেন। কিন্তু, রিশিলুর মর্ম্মভেদী তীব্রদৃষ্টির অধীন হইলেই, তাঁহার বল, বুদ্ধি, বিদ্বেষ ও সংকল্প বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইত মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতনা। তিনি রিশিলু করে পুতুলের ন্যায় নৃত্য করিতেন। রিশিলু যে দেখা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, তাহা হইতে দক্ষিণে কি বামে একপাদ পরিভ্রষ্ট হইতেও তাঁহার সাহস হইত না। তিনি যাহাদিগের মন্ত্রণায় রিশিলুর অনিষ্ট চিন্তা করিতেন, রিশিলুর সহিত দেখা হইলে, মন্ত্রাহত সর্পের ন্যায় রিশিলুর হইয়া, পুনরায় তাহাদিগকেই দংশন করিতেন। রাজমহিষী এন চক্ষের কোণেও রিশিলুকে দেখিতে পারিতেন না। রিশিলুর নাম শুনিলেই তাঁহার অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত। যদি তাঁহার সাধ্য থাকিত তাহাহইলে তিনি রিশিলুর হৃৎপিণ্ড শতখণ্ড করিয়া কুক্কুরের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতেন। রাজমাতা মেরী, যদিও প্রথমে রিশিলুর অভ্যুদয়ের সহায় ছিলেন, পরিশেষে তিনিও তাঁহার মর্ম্মান্তিক শত্রু হন। রাজার অনুজ অকর্ম্মণ্য গেষ্টন, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, দিবারাত্র দেশীয় প্রধান পুরুষদিগের সহিত রিশিলুর সংহারার্থ ষড়্‌যন্ত্র করিতেন। অন্যান্য রাজপুরুষের রিশিলুর প্রতি হৃদয়ে কি ভাব পরিপোষণ করিতেন তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। কিন্তু এত শত্রুতে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও, রিশিলু মুহূর্ত্তকালের জন্য কম্পিত হইতেন না। অপর সাধারণ মনুষ্য, ভয়ের সামান্য কারণ দেখিলেই, বিহ্বল হইয়া পড়ে,—কিন্তু

কটী তরঙ্গ দেখিলেই, হালি ছাড়িয়া দয়,—কেহ একবার ভ্রুকুটি করিলেই, তড়সড় ভাবে পলায়ন করে। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে মহাপ্রাণ লোক, তাঁহাদিগেরমতি ও গতি স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্বভাবতঃই বিঘ্নবিলাসী। বাধা বিঘ্ন বিনা তাঁহাদিগের শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থানান্তর সম্ভবে না। রিশিলু সর্ব্বাংশে একজন মহাপ্রাণ লোক ছিলেন। ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার ভয়েই তিনি সকলকে অস্থির রাখিতেন। তিনি, আপনার বুদ্ধি এবং আপনার বিক্রমের উপর ভর করিয়া সকলের বুদ্ধি বিক্রম পর ভব করিতেন, কুটচক্রের প্রত্যুত্তরে কূটচক্র করিয়া, আপনি দুর্ভেদ্য থাকিয়া, বিপক্ষের মন্ত্রভেদ করিতেন, এবং যে একবার তাঁহাকে দংশন করিত, তাহার সমস্ত দন্ত একে একে উৎপাটন করিয়া, সে ফিরিয়া আর কোন দিন দংশন করিতে না পারে, তাহাকে এইরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। সাগরের ফেনায়মান উর্ম্মিমালার মধ্যস্থলে গিরিশৃঙ্গ যেরূপ নির্ভীক দণ্ডায়মান থাকে, চতুর্দ্দিক হইতে আঘাতের পর আঘাত হয়, কিছুতেই টলে না; রিশিলুও বিপদরাশির মধ্যে সেইরূপ অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। যে তাঁহাকে আঘাত করিত, সেই প্রত্যাহত হইয়া ত্রাহিরবে দূরে প্রস্থান করিত। বস্তুতঃ রিশিলুর ন্যায় দুর্দ্দম লোক সংসারে অল্পই জন্মিয়াছে।

রিশিলু ফ্রান্সের অন্তর্গত পরটিয়র নগরে, ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ফ্রান্সের নরপতিকুলের তিলক চতুর্থ হেন্‌রী তখন পর্য্যন্তও নেভারের রাজা বলিয়াই পরিচিত,—ফ্রান্সের সাম্রাজ্য লাভ করেন নাই। রিশিলুর প্রকৃত নাম আরমণ্ড জীন, বংশনাম রিশিলু। কিন্তু তাঁহার বংশে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে কেহ কোন সময়ে তাঁহার সমান হয় নাই বলিয়া, রিশিলু বলিলে তাঁহাকেই বুঝায়। যেমন ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় জাতি তেমন ইয়ুরোপে ফরাসী। ফরাসীরা বহুকাল হইতে বীর বলিয়া পরিচিত। বীরতার আনুসঙ্গিক দোষ ও গুণ উভয়ই ফ্রান্সে ভুরিপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ফরাসীদিগের মধ্যে, যিনি অস্ত্র বিদ্যায় অপটু তাঁহাকে কেহ ভদ্র লোক বলিয়াই গণনা করে না। এই বীরনীতি এখনও একবারে লুপ্ত হয় নাই। যে সময়ের কথা হইতেছে, তৎকালে ইহার আরও অধিক আদর ছিল। রাজারা নিঃশঙ্কচিত্ত, অস্ত্রবলদৃপ্ত, সাহসিক বীরপুরুষদিগকেই সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক বলিয়া সম্মান করিতেন; কুলকামিনীরা তাদৃশ সুপুরুষদিগেরই প্রণয়ের অধীন হইতেন, এবং কবিসমাজও তাঁহাদিগের কথাই আহ্লাদের সহিত

কীর্ত্তন করিতেন। অবলাদিগের কণ্ঠে কণ্ঠহারের ন্যায়, ফরাসী ভদ্রলোকের কটিবন্ধেও একখানি তরবারি নিরন্তর বিলম্বিত থাকিত। নিরস্ত্র হইয়া কেহ কোথাও যাতায়াত করিতেন না। এক জন ভদ্র লোককে যুদ্ধে আহ্বান করা গেল, তিনি প্রাণের ভয়ে অগ্রসর হইলেন না, এমন হইলে, ফ্রান্সের সমস্ত ভদ্র পরিবার তাঁহাকে অপাংক্তেয় করিত, এবং বিবাহের জন্য পাত্রীলাভও তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠিত। রিশিলু প্রথম বয়সে তৎকাল প্রচলিত শাস্ত্রচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে শস্ত্র বিদ্যারও বিলক্ষণ অনুশীলন করেন। শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য লাভ অপেক্ষা অস্ত্র নৈপুণ্য লাভের জন্যই বরং তাঁহার অধিক আগ্রহ ছিল; তাঁহার পরজীবনও একথা সপ্রমাণ করে। কিন্তু, প্রয়োজনের অনুরোধে, তিনি অচিরেই প্রবৃত্তি সংযম করিতে বাধ্য হন। তাঁহার অগ্রজ এলফন্‌সো লুকন নগরের বিশপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যাহা বৃত্তি পাইতেন, তদ্দ্বারা কোন রূপে পরিবার প্রতিপালন হইত। এলফন্‌সো কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করায়, রিশিলু পারিবারিক দিগের প্রমোদনে ঐ পদের জন্য প্রার্থী হন। তাঁহার বয়ঃক্রম তৎকালে দ্বাবিংশ বৎসরের অধিক হয় নাই। পোপ প্রথমে এই প্রার্থনার প্রতিরোধী ছিলেন; পরে, রিশিলুকে দেখিয়া, তদীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতায় মোহিত হন, এবং আর বিচার বিতর্ক না করিয়া তাঁহাকে বিশপের কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

রিশিলু, বিশপ থাকা কালে, কোন রূপ যশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। যাজকীয় জীবনে তাঁহার অনুরাগ ছিল না, এবং মন আপনা হইতে যে কার্য্যে প্রধাবিত না হয়, বাধ্য হইয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কখনই মনোরথ সংসিদ্ধ হয় না। তবে রিশিলুর সম্বন্ধে এইমাত্র সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত তাঁহার আচার ও ব্যবহার এবং কার্য্যকলাপে অনেক প্রভেদ পরিলক্ষিত হইত। রিশিলু স্বয়ং ক্যাথলিক ছিলেন, কিন্তু ক্যাথলিক হইয়াও হিযুজিনো সম্প্রদায়ের প্রতি কোন বিষয়ে বিরাগ প্রদর্শন করিতেন না। কতিপয় ঐতিহাসিক এই কথার উল্লেখ করিয়া রিশিলুকে প্রশংসা করিতে করিতে একবারে আকাশে তুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রশংসাবাদ কতদূর ন্যায়সংগত, তাহা পরে আলোচিত হইবে। যাজকগণ, কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, নিরন্তর অভিসম্পাত করিয়া তাহার পরকালের পথে কণ্টক দেন। রিশিলু,

ক্রোধ পরবশ হইয়া কাহাকেও অভি
সম্পাত করিতেন না। কাহারও অনিষ্ট
করা আবশ্যক হইলে, তিনি তাহার
পরকালের পথে কাঁটা না দিয়া, ইহকা
লের পথে কাঁটা দিতেন, এবং এমন
করিয়া কাঁটা দিতেন যে, সে তাঁহাকে
কোনক্রমে শঙ্কা কি সন্দেহ না করিয়া
পারিত না। তাঁহার অধীনস্থ যাজক
দিগের মধ্যে পরস্পর মতদ্বৈধ উপস্থিত
হইলে তিনি শাস্ত্র কি যুক্তি গ্রহণ না
লইয়া, প্রভুত্ব খাটাইয়া, সকল বিরো
ধের মীমাংসা করিতেন। এক কথায়
এই বলিলেই হয় যে, রাম যেমন ঋষি,
রিশিলুও সেইরূপ যাজক ছিলেন।
তিনি নামতঃ মাত্র যাজক ছিলেন,
বস্তুতঃ যাজকতা কালেও রাজনীতিরই
অনুশীলন করিতেন, এবং কি উপায়ে
বাহির হইয়া পড়িবেন, সর্ব্বদা সেই
চিন্তাতেই তাঁহার মন ব্যাপৃত থাকিত।
ফ্রান্সের ধর্ম্মমন্দিরের প্রতি তাঁহার দৃক্‌
পাতও হইত না; কিন্তু রাষ্ট্রমন্দিরের
সমস্ত পথ তিনি আপনার নিদ্রা পরি
ত্যাগ করিয়া জপ করিতেন।

ফ্রান্সের রাজসিংহাসন চিরকালই
এক আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গ সমান। ফ্রান্সের
ইতিহাসে যে সমস্ত বাস্তব ঘটনার উ
ল্লেখ রহিয়াছে, কবির কল্পনা ও তাহার
নিকট পরাজিত হয়। রিশিলু বিশপ
হওয়ার দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই
ফ্রান্সের রাজসংসারে অশেষ আপদ উ
পস্থিত হইল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ
মের অপরাহ্ণে রাজা চতুর্থ হেনরী তদীয়
প্রধান সচিব সলীর সহিত সাক্ষাৎ
করিতে যাইতেছিলেন; পথে এ
কস্থলে কতকগুলি শকট জড় থাকা
প্রযুক্ত, হেনরি যে শকটে আরূঢ়
ছিলেন উহার গতি ক্ষণকালের
জন্য স্থগিত হয়। সেই ক্ষণকালের
অবসরে, ফ্রেঁয়া রাবিলাক নামক এক
রক্তপিপাসু দুরাচার, রাজকীয় শক
টের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া, এক
ছুরিকা দিয়া হেনরীকে পুনঃ পুনঃ
আঘাত করে, এবং তদ্দণ্ডেই হেনরী
তনুত্যাগ করেন। রাজা চতুর্থ হেনরী
একজন অতি প্রধান পুরুষ ছিলেন।
ফ্রান্সের রাজনামাবলী তাঁহার নামেই
সমধিক উজ্জ্বল। তাঁহার শাসন সময়ে
ফ্রান্সের দুর্বিনীত ভূস্বামিবর্গ এবং কু
চক্রী রাজপুরুষগণ করপাত ও সঞ্চালন
করিত না। যেই হেনরির চক্ষু বুজি
লেন, অমনি দুর্বৃত্তগণ, শকুনী, গৃধিনী,
এবং শৃগাল ও কুক্কুরের ন্যায়, রা
জপ্রাসাদ ঘেরিয়া বসিল। রাজমহিষী
মেরী কোন অংশেও ফ্রান্সের সিংহাস
নের যোগ্য ছিলেন না। হেনরী
যে আসনে উপবেশন করিতেন, তা
দৃশী অস্থিরমতি, অপকবুদ্ধি, ভীরুস্ব
ভাবা, কোপনা অবলা কখনও সে আ-

সনে শোভা পায় না। কুন্দের ভাবী রাজা ত্রয়োদশ লূই তৎকালে নয় বৎসরের বালক। মেরী কতিপয় অপরিমাণদর্শী রাজপুরুষকে সহায় করিয়া, আপনিই সমস্ত গ্রাস করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিলেন। আবার কতকগুলি প্রধান ব্যক্তি, কুমারের স্বপক্ষ হইয়া, সর্ব্বতোভাবে মেরীর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইল। মন্ত্রিবর্গ এবং আভিজাত্যগণ এইরূপ দুই দলে বিভক্ত হওয়ায়, হেনরী স্বকীয় প্রভাববলে ফ্রান্সের যে মান ও বৈভব বাড়াইয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতেই তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিল। রাজকোষ ক্রমে ক্রমে শূন্য হইয়া পড়িল, রাজা বলিয়া যে একটা সম্মান ও সম্ভ্রম ছিল, তাহাও ঘুচিয়া গেল।

কালপ্রতীক্ষ রিশিলু, এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত আলোচনা করিয়া, লুকন নগর পরিত্যাগ করার যোগ্য অবসর লাভ করিলেন। তাদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাদৃশ আশান্বিত ব্যক্তি কখনই একটী সামান্য নগরে, সামান্য এক বিশপের কার্য্যে তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না। গিরিগুহাই করিকুম্ভবিদারী কেশরীর চিরপ্রসিদ্ধ বাসস্থান। কিরূপে প্যারীসে প্রবেশ করিবেন, কিরূপে এক পা, দুই পা করিয়া রাজপুরীর নিকটস্থ হইবেন, ইহাই বহুকাল হইতে তাঁহার ধ্যান ও জপমন্ত্র ছিল। উপস্থিত গোলযোগ, সুতরাং সর্ব্বাংশে তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধির অনুকূল হইল। রাজপুরুষদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের একটুকু বুদ্ধি ছিল, তাঁহারা তাঁহাকে চিনিলেন, এবং চিনিয়া তাঁহার পথে, প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে, সর্ব্বপ্রকার বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রিশিলুর অভ্যুদয় হইলেই যে তাঁহাদিগের অস্তগমনকাল আসন্ন হইবে, ইহা তাঁহারা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন; এবং যাহাতে সেই অভ্যুদয় কখনও সন্নিহিত না হয়, যাহাতে রিশিলু তিষ্ঠিবার স্থানও না পাইতে পারেন এই চেষ্টাতেই সকলে লাগিয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

অভিমান।

মানবপ্রকৃতির কতকগুলি ভাব কুসুম সদৃশ;—কোমল ও কমনীয়, স্মরণ করিলেই হৃদয় দ্রবীভূত হয়। কতকগুলি ভাব আবার একান্ত তীব্র ও কঠোর। তৎসমুদয়ের পরিচিন্তনে মনে ভয় কি ভক্তিরই সঞ্চার হয়; প্রীতি অথবা কারুণ্য রসের লেশও অনুভূত হয় না। যদি কোন সুন্দর ও সুকুমার যুবা ব্যাঘ

ভীতকুরঙ্গীর ন্যায়, শত্রুভয়ে বিহ্বল হইয়া, কাহারও পদতলে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে, বৈরনির্যাতনের জন্য স্বকীয় বীর্য্য প্রয়োগ না করিয়া, পরের দিকেই চাহিয়া থাকে এবং আপনার কর্ত্তব্যের ভার পরের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া, অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করে, তাহার প্রতি ভক্তি কিংবা শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়া যার পর নাই অস্বাভাবিক। কিন্তু তাহার তৎকালীন পরিম্লান মুখচ্ছবি, তাহার সেই কাতর চক্ষু, কাতর ভাবভঙ্গি এবং ততোধিক কাতর গদ্গদ কণ্ঠ অবশ্যই হৃদয়কে করুণায় পরিপ্লুত করিতে পারে। আশ্রিত জনের প্রতি অনুরাগ মহাত্মাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ। পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি, বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত হইয়াও, একটুকু না হেলে, অভাবনীয় দুঃখরাশির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়াও দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা না করে, এবং পরসাহায্যের শত প্রয়োজন সত্ত্বেও, কাহারও প্রীতি কি সহানুভূতির প্রত্যাশী না হইয়া, আপনার বাহুবলের উপরই দর্পভরে দণ্ডায়মান হয়, তাহার সেই কঠোর ভাব দর্শন করিয়া, কেহই প্রণয়রসে বিগলিত হইবে না। যে প্রণয়ের ভিখারী নহে, কে তাহাকে আপনা হইতে আদর করিয়া প্রণয় উপহার দিতে পারে? কিন্তু, তাদৃশ অভয়শূন্য, স্বাবলম্ব পুরুষের গাম্ভীর্য্য ও গৌরব চিন্তা করিলে মনে, স্বভাবতঃই ভয় কি সম্ভ্রমের ভাব উপস্থিত হইবে ইহা অবধারিত কথা।

আমরা অভিমানকেও মনুষ্যপ্রকৃতির একটি কঠোর ভাব বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি। অভিমানের সহিত কোমলতার কোন সম্বন্ধ নাই। অভিমান দয়ার ন্যায় পরের দুঃখে গলিয়া পড়েনা; প্রীতির ন্যায় পরের চক্ষে চক্ষু দিয়া তাকাইয়া থাকে না, এবং মমতার ন্যায় পরকে আপন করিতেও যত্ন করে না। অভিমানীর প্রতি লোকের যে আপাততঃ বিদ্বেষ জন্মে, তাহারও নিগূঢ় হেতু এই; সে চায় না, সুতরাং কেহই তাহাকে দেয় না। সে একটুকু স্বতন্ত্র, সুতরাং সকলের বিরাগভাজন। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা অভিমানের ভাবকে কখনই ঘৃণার বিষয় বলিতে পারি না।

অভিমান দুই প্রকার,—রক্ষক ও পীড়ক। যে অভিমান বিষমক্ষিকার মত পরের মর্ম্মস্থলে দংশন করে, অকারণে পরপীড়নে প্রবৃত্ত হয় পরের স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারে না, উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, সন্দেহ নাই ঐরূপ অভিমান জগতের উপদ্রব বিশেষ এবং মানব জাতির কলঙ্ক। উহা অভিমান নহে, বস্তুতঃ অভিমানের বিকার। কবি

কল্পিত অসুর কি অপদেবতার ললাটেই উহা শোভা পায়। মনুষ্য, যখন ঐরূপ অভিমানে বশীভূত হইয়া, আপনাকে এক অলৌকিক বস্তু জ্ঞানে পূজা করে, এবং ন্যায়ের শাসন, স্নেহের শাসন, এবং সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাবের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, সংসারে আপনার শাসনই প্রবল বল করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন তাহার মনুষ্যত্ব কতদূর থাকে, ঠিক বলিতে পারি না। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান নায়ক মেরাবোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যিনি মেরাবোর জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছেন, বোধ হয় মনুষ্যের পদধূলি হইয়া থাকিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে, তথাপি মেরাবোর শক্তি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেরাবোর অভিমান লইয়া সকলকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা হইবে না। যদি কাহারও গৃহে গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ ইত্যাকার দুরভিমানের অবতার লইয়াও, কেহ প্রবিষ্ট হন, সুখ ও শান্তি সে গৃহ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। এইরূপ অভিমান হৃদয়কে গ্রাস করিলে, আকৃতির সৌন্দর্য্য একবারে বিনষ্ট হয়, চক্ষু এক অপ্রাকৃত বিষাক্ত তেজ উদ্গীরণ করে এবং অধরনিঃসৃত প্রত্যেক কথায় লোকের অঙ্গ জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু যে অভিমান, কাহাকেও পীড়া দিয়া, সুন্দর একখানি বর্ম্মের ন্যায় হৃদয় ও মনকে পরের আক্রমণ হইতে আবরণ করিয়া রাখে,—যাহা কটাক্ষ, কটুভাষা কিংবা ভ্রূকুঞ্চনে প্রদর্শিত না হইয়া মান ও গৌরবের মূর্ত্তিধারণ করে, যাহা সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিভাত ভাস্করের ন্যায় এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য শোভা পায়, অথচ চক্ষুর অসহ্য হয় না, তাদৃশ মানভিমানের অনাদর করা দূরে থাকুক, আমরা উহাকে মানব প্রকৃতির অমূল্য আভরণ বলিয়া স্বীকার করি।

অভিমান আর যশোলালসা সমান নহে। যশোলিপ্সু পরান্নভোজী, পরপ্রত্যাশী। অভিমানী আপনার বুদ্ধিতে আপনি পরিতৃপ্ত। যশোলিপ্সু হৃদয়ের কণ্ডুয়নে সকল সময়ে আকুল থাকে কে তাহাকে কি বলিবে এই ভাবনাতেই তাহার নিদ্রা দূর হয়। অভিমানী শান্ত, সুস্থির ও গম্ভীর। লোকের মনোদর্পণে, সন্তোষ কি অসন্তোষের ভাব ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ প্রতিফলিত হয়, যশোলিপ্সুর মুখভঙ্গিও তাহা হইতে বিষাদের দিকে এবং বিষাদ হইতে হর্ষের দিকে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। অভিমানী চিত্রার্পিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিষ্পন্দ ও নিশ্চল। পৃথিবীর স্তুতিনিন্দা তাহার নিকট কাকের কোলাহল হইতে অধিক বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যশোলিপ্সার প্রকৃতিতে যে অনুদি

একটুকু মাধুর্য্য আনিয়া দেয় অভিমান কঠোর কর্ত্তব্যবুদ্ধির আশ্রয় পাইয়া সেটুকু বিনাশ করিয়া ফেলে।

যথার্থ অভিমান এক অচিন্তনীয় সামর্থ্য। উহা সাহস, বীরতা এবং সহিষ্ণুতার অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়. যাহা কিছু লজ্জাকর ও গ্লানিজনক যাহা কিছু নীচ ও ক্ষুদ্রমনোচিত, অন্তঃকরণকে তাহার উপরে তুলিয়া রাখে, প্রলোভনের সময় প্রহরীর ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় এবং আপদের কালে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করে। এই দুঃখপূর্ণ কন্টকাকীর্ণ বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে যথার্থ অভিমান অনেক সময়ে ভেলার ন্যায় অবলম্ব হয়। কেহ, লাভের আশায় বাণিজ্য করিয়া, সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইলে, সকলকে বঞ্চনা করিবার জন্য, তাহার শঠতার গতি হইতে পারে। অভিমান তখন তাহাকে রক্ষা করে। সে সহস্র গ্রন্থিবিশিষ্ট জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিতেও সম্মত হয়, তথাপি ছলনা করিয়া কাহারও কপর্দ্দক রাখিতে চায় না। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই অবস্থার পূজা করে। অবস্থা বিগুণ হইলে, অনেক স্থলেই সমস্ত সংসার বিগুণ হয়। মাতা সস্নেহকণ্ঠে সম্ভাষণ করেন না, পত্নী মুখ তুলিয়াও চান না, ভ্রাতা, বৈভবমদে মত্ত হইয়া, ভুলিয়াও মনে করেন না, বন্ধুজনেরা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জিত হন, সুতরাং দেখিলেই দূরে প্রস্থান করেন। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ কেহ অহর্নিশ ঈদৃশ অরুন্তুদ দুঃখে দগ্ধ হইলে, অভিমান আর কিছু না করুক, অন্ততঃ সেই দুঃখকে সহিয়া থাকিবার জন্য পুরুষোচিত ক্ষমতা দেয়। অভিমান না থাকিলে, হেলেনার কারাস্থিত কুক্কুরদিগের তীক্ষ্ণ দংশনেই বোনাপার্টির তনুত্যাগ হইত, এবং অভিমান না থাকিলে, রাজ্যভ্রষ্ট প্রথম চার্লস্, অরাতিনিযুক্ত, দুরক্ষরভাষী, দুর্নীত প্রহরিবর্গের অত্যাচার সহ্য করিয়া, ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করিতে পরিতেন না।

সৌভাগ্যের সময় অভিমানকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়; বরং তাদৃশ উপেক্ষার ভাবই তখন যথার্থ অভিমানশালিতার পরিচয় দান করে। যখন চক্ষুর একটি দৃষ্টি কিংবা জিহ্বার একটি বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতেই, সেই দৃষ্টি কিংবা সেই বাক্য নিরতমুখপ্রেক্ষিগণকর্ত্তৃক শশব্যস্তভাবে গৃহীত হয়, এবং সকলে সমবেত হইয়া উহার অর্থগ্রহ করিতে উপবেশন করে;—যখন পরিচয়মাত্র থাকিলেই লোকে পরম আত্মীয় বলিয়া সন্নিহিত হয়, হাসিলে শতমুখে হাসি ফোটে, এবং একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস অকারণে ত্যাগ করিলেও নিকটস্থ সকলের মুখ বিষাদে মলিন

হইয়া যায়;—যখন বায়ুর প্রত্যেক তরঙ্গ প্রশংসার ধ্বনিই আনয়ন করে, এবং সমস্ত সংসার জ্যোৎস্নাধৌত নিশার ন্যায় আনন্দে টল টল প্রতীয়মান হয়, মনুষ্য তখন ফলভরনত পাদপের ন্যায় নিতান্ত নুইয়া পড়িলেও, তাহার চরিত্রে নীচতা কি কলঙ্কের স্পর্শ হইবে না। বিনয়াচ্ছন্নগর্ব্বিতা সম্পদের দিনেই সুন্দর দেখায়। কিন্তু, অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে, একবারে ভূতলে আনীত হইলে, মনুষ্য কখনই সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তখন তাহাকে সকল বিষয়েই পদে পদে গণনা করিতে হয়, এবং কথাটি কহিতে হইলেও তাহার পাঁচবার চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সে সরলান্তঃকরণে কাহারও গুণবাদ করিলে, লোকে তাহা চাটুবাদ বলিয়া অবহেলা করে, এবং সে তাহার হৃদয়ের প্রীতির উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া কাহারও প্রণয়ের প্রার্থী হইলে, লোকে তাহাকে অম্লান বদনে সুচতুর বণিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছুক হয়। যেমন সুখসম্ভোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা, বিনীত ও নম্র হওয়াও সেইরূপ সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সকলের পাদলেহন করুন, তাহাতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, ভাগ্য যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, অভিমানই তাহার অদ্বিতীয় সহায়। সে তাহার শেষ অবলম্ব অভিমানকেও যদি বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রমে ক্রমে কত নীচে নাবিতে হয়, সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

এক সম্ভ্রান্তচরিত্র ব্যক্তি, অবস্থার পরিবর্ত্ত নিবন্ধন কোন ধনীর গৃহে অপরিচিত ভাবে আশ্রয় লইয়া, দিন পাত করিতে ছিলেন। তাঁহার প্রতিপালক, একদিন তাঁহার কোন কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া, তাঁহাকে মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ দেন এবং তাঁহার বিস্তর উপকার করেন। কেহ অপকার করিলে, তাহা অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করা যায়। কিন্তু কেহ উপকার করিলে, সেই উপকারের ভার বহন করা, উন্নতপ্রকৃতিক মনুষ্যের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়। উল্লিখিত ছদ্মবেশী মহাত্মা, আশাতীত রূপে উপকৃত হইয়া, হৃদয়োত্থিত কৃতজ্ঞতার আবেগ নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার আশ্রয়দাতাকে সম্বোধন করিয়া, বাষ্পগদ্গদবচনে বলিলেন—'মহাশয়! আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, প্রাণ থাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না। আমার পূর্ব্বের অবস্থা থাকিলে আমি আপনার পাদযুগল মস্তকে ধারণ করিতাম। দুঃখ এই, ঈদৃশ উপকারী বান্ধবকে যে নির্দ্দ্মুক্ত

চিত্তে সমুচিত কৃতজ্ঞতা দিব, এমন তাগাও এইক্ষণ আমার নাই।' যদি অভিমান কোন পদার্থ হয়, ইহারই নাম অভিমান। অভিমানী প্রাণকে অব্যবহার্য্য জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় অবহেলায় পরিত্যাগ করিতে পারে, কষ্ট ও ক্লেশ যাহা কিছু সম্ভবে তাহা অনবসাদে বহন করিতে সমর্থ হয়, জ্বলন্ত বহ্নিমুখে প্রবিষ্ট হইতেও ভীত হয় না, কিন্তু আত্মার চৈতন্য থাকিতে মানত্যাগ করিতে পারিয়া উঠে না।

মনুষ্যের মন যথার্থ অভিমানে অলংকৃত হইলে, উহার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করে। তখন পরশ্রীতে তাহার কাতরতা হয় না। হৃদয় পরের সৌভাগ্যে খিন্ন হইলে, অভিমানী আপনার নিকট আপনি অপরাধী হয়, এবং ঐ ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়। যে আপনাকে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য এবং সর্ব্বতোভাবে সারশূন্য বিবেচনা না করে, সে অন্যদীয় সম্পদে কদাপি বিষণ্ণ হইতে পারে না। অভিমানী অগোচরে আক্রমণ করে না, অন্ধকারে আঘাত করিতে জানে না, এবং একবারের পরিবর্ত্তে শতবার মরিতে হইলেও, অযোগ্যস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হয় না। কবির কল্পনা বল, আর ইতিহাস বল, মহাবাহু ভীষ্ম, শিখণ্ডীর দুর্ব্বল করক্ষিপ্ত শরনিকরে রোমে রোম বিদ্ধ হইয়াও, তাহাকে ফিরিয়া আঘাত করিতে পারেন নাই। যে জাতীয় লোকেরা নীচপ্রকৃতি ও স্বার্থপর, তাহাদিগের মধ্যে সম্মুখ সংগ্রাম অপেক্ষা উপাংশুহত্যা অধিক প্রচলিত, বীরাচার অপেক্ষা ছদ্মব্যবহার ও ছলনারই অধিক আদর, এবং প্রকৃত বীরপুরুষ অপেক্ষা কপটকুশল কার্য্যসাধকেরই অধিক সম্মান। তাহারা সাধনের প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করে না, সিদ্ধিই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব। যে জাতীয়দিগের অন্তরে অভিমানের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তাহাদের রীতি নীতি সর্ব্বাংশে ইহার বিপরীত। তাহারা যাহা কিছু করে, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড তাহার সাক্ষী থাকেন সিদ্ধি হউক কি না হউক, তদর্থ তাহারা ব্যস্ত হয় না; সাধনপদ্ধতিতে কোন রূপে কলঙ্কস্পর্শ না হয়, ইহাই তাহাদিগের মুখ্য চিন্তা। ভারবি বলিয়াছেন—

অভিমানধনস্য গত্বরৈ
রসুভিঃ স্থাস্নু যশশ্চিচীষতঃ।
অচিরাংশুবিলাসচঞ্চলা
ননু লক্ষ্মীঃ ফলমানুসঙ্গিকম্।

অর্থাৎ,—অভিমানই যাহাদিগের ধন,—যাহারা ক্ষয়শীল প্রাণে উপেক্ষা দিয়া অক্ষর মান সঞ্চয় করিতে অভিলাষী হয়, তাহারা সৌদামিনীর বিলাসিনী

ন্যার ন্যায় চিরচঞ্চলা কমলার সেবা করে না। যদি তিনি কৃপা করেন, সে কৃপা আনুসঙ্গিক ফল।

অভিমানী অন্যের অভিমান সহ্য করিতে পারে না, একথা অলীক। যে আপনার মানকে মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া মনে করে, সে কদাচ অন্যের অপমান সহ্য করিতে পারে না। আর্য্য ঋষিগণ মানীর মানভঙ্গকে এক মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এবিষয়ে পৃথিবীর সকল স্থানের মহাত্মারাই তাঁহাদিগের মতানুগামী। যখন ক্রোধোন্মত্ত ভীম মানী দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করেন, রাজরাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির তখন অনর্গল অশ্রু মোচন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যখন মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ রাক্ষস, চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলে সর্ব্বথা অভিভূত হইয়া, পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হন, তখন অভিমানী চাণক্য ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করেন। যখন পরাজিত পোরস, আলেকজেণ্ডরের সম্মুখে আনীত হইয়া, গর্ব্বিতভাবে আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেন, বীরচূড়ামণি তখন রুষ্ট কি অসন্তুষ্ট না হইয়া, তদীয় তেজস্বিতায় নিতান্ত প্রীতি লাভ করেন। প্রুশীয়ার সম্রাট্ ফরাশীদিগকে পরাজয় করিয়া যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা দশ বৎসরের মধ্যেই বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু, তিনি সিংহাসনভ্রষ্ট লুইনেপোলিয়নকে যেরূপ মর্য্যাদা করিয়াছেন, ইতিহাস তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না।

কেহ রূপের অভিমানে ফাটিয়া পড়ে। কেহ সামান্য কোন গুণ থাকিলে, সেই অভিমানে মৃত্তিকায় পাদনিক্ষেপ করিতে চায় না। কেহ, পরের চরণ লেহন করিয়া, একটুকু পদোন্নতি লাভ করিলে, সাধু কিম্বা অসাধু কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইলে, সংসারে দশজনের মধ্যে কোন না কোন রূপে গণনীয় হইতে পারিলে, অভিমানে উন্মত্ত হয় এবং চক্ষে অন্ধকার দর্শন করে। ঈদৃশ জঘন্যভাব অভিমানের বিড়ম্বনা মাত্র। যথার্থ অভিমান, মহত্ত্বের একজাতীয় বস্তু। উহাতে চাতুরী ও চাঞ্চল্য কিছুই নাই, এবং উহা কখনও তুলনায় তুলিত হয় না। প্রতি মনুষ্যের আত্মাতে যে এক অচিন্তনীয় নিজত্বের ভাব নিহিত রহিয়াছে,—যে ভাব অবলম্বন করিয়া, লোকে আপনাকে আমি বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং অন্য হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সকল প্রকার আক্রমণ এবং অত্যাচার হইতে তাহার রক্ষা করা এবং সেই ভাবকে ক্রমে পরিস্ফুটিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়া মনু-

বাস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়াই অভিমানের প্রকৃত কার্য্য।

যে মনুষ্য এইরূপ অভিমানের ভাবকে অন্তরে পরিপোষণ না করে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা সে কখনই অনুভব করিতে পারে না। সে অপরাংশে যত কেন উন্নত না হউক, তাহার ললাটদেশে সকল সময়েই তদীয় প্রভুর নাম অঙ্কিত দেখিবে। আর, যে জাতীয় লোকেরা, জাতীয় গৌরব ও জাতীয় স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইবার অভিলাষে, এক হস্তে মান এবং আর এক হস্তে প্রাণকে তুলিয়া দিয়া, জাতিসাধারণের একীভূত হৃদয়ে জাতীয় অভিমানকে আদরের সহিত রক্ষা না করে তাহাদিগের অন্য যত প্রকারের উন্নতি ও কীর্ত্তি হউক, তাহারা কখনই মানবজাতিরূপ বিরাটপুরুষের এক অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে না। তাহাদিগের সম্পদ সমৃদ্ধি যাহা কিছু আছে, এবং যাহা কিছু কালক্রমে হইতে পারে, সমস্তই পরাধিপত্যের গ্লানিজনক চিহ্ন চিরদিন চিহ্নিত থাকিবে।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড।

(সভ্যতা বিষয়ে তুলনা)

প্রথম প্রস্তাব।

যে জাতি যে সময়ে, রাজকীয় প্রতাপে প্রবল হইয়া, পৃথিবীর জাতীয় সমাজে উচ্চ আসনপ্রাপ্ত হয়, সংসারের সকল লোক একবাক্য হইয়া সেই সময় সেই জাতিরই গুণানুবাদ করে। সেই পরাক্রান্ত জাতির মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর হইলে, ভাষাকারেরা তাহাদিগের নিষ্ঠুরতাকে বীরতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহারা নীচসুখাশক্ত স্ত্রৈণ হইলে তাহাদিগকে সুরসিক বিলাসী বলিয়া আদর করেন এবং তাহাদিগের মধ্যে যেসকল নিতান্ত জঘন্য আচার প্রচলিত থাকে, তাহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া আহ্লাদ সহকারে অনুকরণ করেন। যখন গ্রীশের মাহাত্ম্য ছিল, তখন গ্রীকদিগের দোষগুলিকেও লোকে গুণবলিয়া পূজা করিত। যখন রোম, উহার সপ্তশৈলসিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া, রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় মেদিনী শাসন করিত, তখন রোমানদিগের পরিচ্ছদ পরিলে, রোমানদিগের ন্যায় গৃহ নির্ম্মাণ করিলে, তাহারা যেরূপ করিয়া দণ্ডায়মান হইত

সেইরূপে দাঁড়াইতে পারিলে, তাঁহাদিগের ভাষার দুই চারিটি শব্দ কণ্ঠস্থ রাখিতে সমর্থ হইলে, লোকে আপনার মানবজীবন কৃতার্থ জ্ঞান করিত এবং অন্যেও তাঁহাকে সার্থকজন্মা বলিয়া সম্মান করিত। ষোড়শ লুইর সিংহাসন চ্যুতির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফরাসীস রীতি নীতি সমস্ত ইউরোপে ধর্ম্মশাস্ত্রেরউক্তির ন্যায় শিরোধার্য্য পূর্ব্বক পরিগৃহীত হইত। রাজমহিষী মেরী এন্টোনেন্ট যে ভঙ্গিমায় বেশবিন্যাস করিতেন, সেই ভঙ্গিতে বেশবিন্যাস করিতে না পারিলে, অন্যান্য রাজপরিবারের কামিনীরা দর্পণ সন্নিধানে ম্লানমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া, ধারায় অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেন এবং ফ্রান্সের বিলাসিনীরা যেরূপ নৃত্য করিতেন, অন্যান্য স্থানের কুলকুমারীরা সেইরূপ নৃত্য করিতে না পারিলে, সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবকবৃন্দ তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণেও উৎসুক হইতেন না। অধুনা লোকান্তরবাসী লুইনেপোলিয়নের রাজত্বকালেও ফরাসীস সভ্যতার ঐরূপ প্রভাব ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইলে, প্রধান শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা সকলেই আচার শিক্ষার নিমিত্ত কিছু কাল পারীস নগরে অবস্থান করিতেন। অধিক কি, লুইনেপোলিয়ন এক বিশেষ প্রকারে শ্মশ্রু রাখিতেন; সিডানের যুদ্ধবার্ত্তা জগতে ব্যাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত, অনেক দেশের বীরনামলুব্ধ সৈনিকপুরুষেরা শ্মশ্রুধারণ বিষয়েও ফরাসীস সম্রাটের ছন্দানুবর্ত্তনে অভ্যস্ত বা মনে করিতেন।

হিন্দুরাজত্বের ধ্বংসকাল হইতে, ভারতবর্ষে ক্রমে মুসলমান ও ইংরেজ এই দুই জাতি রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। যখন মুসলমানের হস্তে রাজদণ্ড ছিল, কতকগুলি অনুকরণপ্রিয় হিন্দুসন্তান তখন অনেক বিষয়েই মুসলমানের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ইজার আনিলেন, চাপকান আনিলেন, হিন্দুজাতির যজ্ঞসভার উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে মাথায় মুসলমানি পাগরি বান্ধিলেন, নমস্কারপদ্ধতি উঠাইয়া দিয়া সেলাম করিতেশিক্ষা করিলেন, এবং অবশেষে আর্য্যবংশোদ্ভবা পবিত্রহৃদয়া কুলবধূদিগের মুখমণ্ডল ঘোমটা দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। রাজলক্ষ্মী ইদানীং ইংরেজ জাতির প্রতি কৃপান্বিতা। ইংরেজেরা এদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা, দেশান্তরেও প্রতাপশালী। যেমন মুসলমানের অনুকরণ করা এক সময়ে শ্লাঘনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, জাতোৎসব, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ও শ্রাদ্ধাদি সকল বিষয়েই সর্ব্বাংশে ইংরেজের পদাঙ্কমালার অনুসরণ করা এইক্ষণ এদেশীয় অনেকের নিকট সেইরূপ শ্লাঘনীয় হইয়া উঠিতেছে। এইক্ষণ অনেকেই আ-

পনার জাতীয় চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া একবারে ইংরেজ হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। জাতীয় ভাষা তাঁহাদিগের নিকট প্রিয় বোধ হয় না। ইংলণ্ডীয় শব্দ রসনা হইতে অবিরাম বহির্গত না হইলে, তাঁহাদিগের হৃদয় অনুতাপবিষে জর্জ্জরিত হয়। যদি তাঁহারা কোন ক্রমে স্বদেশীয় ভাষা ভুলিয়া যাইতে সমর্থ হন, অথবা যদি বিজাতীয় স্বরের অনুকরণ করিয়া স্বদেশের কোন সুললিত শব্দকে বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদিগের চিত্ত উন্নতিজনিত আহ্লাদে উল্লম্ফন করে। গৃহে প্রবেশ করিলে, গৃহিণীর দেশীয় বেশ ভূষা দর্শন করিয়া তাঁহারা লজ্জায় ম্রিয়মান হন। যেখানে বিলাতের সুনীতিপরায়ণা, বীররসপ্রবলা, সুসভ্যা নারী দর্শন করিবেন, আশা করিয়াছিলেন, সেখানে হরিণীর ন্যায় চকিতনয়না, অবনতবদনা, ভীরুস্বভাবা, অসভ্যা, দেশীয়া ভার্য্যা তাঁহাদিগের সম্মুখীনা হইলে হৃদয় ক্রোধে ও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায়। যদি তাঁহাদিগকে কেহ দেশীয় পরিচ্ছদে পরিহিত দেখে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট সরলভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের জন্য গৃহান্তরে প্রবেশ করেন। কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া, কুল ক্রমাগত পৈতৃক আচারের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, তাঁহারা এমন দারুণ লজ্জা অনুভব করেন যে, মৃত্তিকার অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইলেও সে লজ্জা আর অপাকৃত হয় না।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সাগরে জলোচ্ছাস হইলে, নদ, নদী, খাল, নালা, পরিপূর্ণ হইয়া, সমস্ত দেশ যেরূপ ভাসাইয়া দেয়, ইংরেজী সভ্যতার দুর্ব্বারস্রোতও এই দেশকে এইক্ষণ সেইরূপ ভাসাইয়া দিতেছে। উহা পূর্ব্বে রাজধানীর চতুঃসীমায় বদ্ধ ছিল, কাল ক্রমে সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া দেশের প্রধান প্রধান নগরে প্রবেশ করে; এইক্ষণ গ্রামে যাও, গ্রামের কোন পল্লীতে যাও, সেই পল্লীর অন্তর্গত সামান্য কোন গৃহে যাও, দেখিবে সেখানেও উহার তরঙ্গ যাইয়া পঁহুছিয়াছে। বালকেরা তটে থাকিয়া আশায় নৃত্য করিতেছে, যুবকেরা স্রোতের তরঙ্গে আপনা হইতে নামিয়া পদ্মপলাশের ন্যায় দোলায়িত হইতেছেন, আর ভীতিবিহ্বল বৃদ্ধেরা করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া নিকটে বসিয়া ভাবিতেছেন। স্রোতের বেগ কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না।

যদি কেহ এই পরিবর্ত্তন এবং এই পরানুকরণের কারণ জানিতে ইচ্ছুক হন, আমরা কাহাকেও দোষ না দিয়া অদৃষ্টেরই নিন্দা করিব। যাঁহারা অনু

কারী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং অনুকরণের প্রবর্ত্তক, তাঁহাদিগের অধিকাংশ সচ্চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত। তাঁহারা প্রচলিত আচারের মূলানুসন্ধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এক দেশের আচারের সহিত আর একদেশের আচারের তুলনা করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন, এবং ভাল মন্দ বিচারেও নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। যখন তাঁহারাই, আপনার যাহা ছিল তাহাতে উপেক্ষা করিয়া, পরের হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন পরকীয় সভ্যতায় বিশেষ কোন মধু থাকিবে, আপাততঃ এইরূপ সংস্কার হওয়াই স্বাভাবিক! কিন্তু, আমাদিগের মন তথাপি শিক্ষিতদিগের ব্যবহারমাত্র দর্শন করিয়াই এবিষয়ে তৃপ্তি লাভ করে না। অনেক সময়েই আমাদিগের এইরূপ বোধহয় যে,ভারতবর্ষের ভাগ্যতারা যদি আকাশ হইতে খসিয়া না পড়িত, যদি ভারতের রাজবৈজয়ন্তী এখনও উড্ডীন থাকিত, যদি ভারতবর্ষীয়েরা, বিধিবিড়ম্বনায় পরের অধীন না হইয়া, পরকে আপনার বাহুবলের অধীন করিতে পারিত,তাহা হইলে, যাঁহারা এইক্ষণ ভারতনিন্দুক, তাঁহারাই ভারতের স্তুতিগীত গানে পঞ্চমস্বরে আরোহণ করিতেন, এবং যাঁহারা হিন্দুজাতির সভ্যতা হইতে কলঙ্কের পঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য এইক্ষণ হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে হিন্দু সভ্যতার প্রচারের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রধাবিত হইতেন। আমাদিগের মনের এই ধারণা ভ্রমমূলক কি যুক্তিসংগত তাহা বিচার করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ঐতিহাসিকদিগের অগ্রগণ্য পণ্ডিতবর বকল অন্যান্য দেশের সভ্যতা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় সভ্যতারই সমধিক আদর করেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই,—অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা,—বিদেশীয়দিগের সংস্পর্শে আসিয়া, বিদেশীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছে, সুতরাং সেই সেই দেশে সভ্যতার যে ফল ফলিয়াছে তাহা মিশ্রপদার্থ; কিন্তু, ইংলণ্ড দুরধিগম্য সাগরমালায় সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত এবং এই হেতু চিরদিন স্বতন্ত্র. সুতরাং ইংলণ্ডীয় সভ্যতায় মিশ্রতাদোষের লেশও দৃষ্ট হয় না। বকলের অবলম্বিত প্রাগুক্ত যুক্তি প্রথম শ্রবণে দোষাশ্রিত প্রতীত না হইলেও, তিনি যে বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ঐ যুক্তির সূত্র টানিয়া আনিয়াছেন, সেই বৃত্তান্তের সত্যতা সম্বন্ধে যখন সংশয় রহিয়াছে, তখন তাঁহার সিদ্ধান্তকেও অবশ্যই অপসিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই, যদি পৃথিবীতে কোন দেশের সভ্যতা পরকীয় স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত থাকে, সেই

সভ্যতা ভারতবর্ষের। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ইংলণ্ড যখন অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন উহার অধিবাসীরা পশুর ন্যায় গর্ত্তে বাস করিত, অপক্ক মাংস ভোজন করিয়া দেহ ধারণ করিত, এবং অনাবৃত কিংবা ঈষদাবৃত শরীরে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত, সেই সময় সুসভ্য রোমান জাতি উহাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, এবং প্রায় পাঁচশত বৎসর কাল উহাদিগকে রোমীয় শাসনের অধীন করিয়া রাখে। যেই রোমানেরা স্বগৃহবিরোধনিবন্ধন ইংলণ্ড হইতে সরিয়া পড়িল, অমনি স্যাকসনেরা, পঙ্গপালের ন্যায় ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া, যেখানে সেখানে উপনিবেশ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইল। ইংলণ্ডের আদিম নিবাসিগণ যদিও প্রথমে স্যাকসনদিগের বিরোধী ছিল, কালক্রমে স্যাকসনেরা তাহাদিগের প্রিয় হইল, স্যাকসনদিগের সহিত বিবাহঘটিত সম্বন্ধে আদান প্রদান হইল, এবং আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে দুই বিভিন্নজাতির যতদূর মিশামিশি সম্ভব হয়, তাহা হইয়া উঠিল। যেই আবার স্যাকসনেরা একটুকু দুর্ব্বল হইল, আর ডেনমার্ক নরওয়ে এবং সুইডনের দস্যুজাতি দলে দলে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল যাইতে না যাইতে, ফ্রান্সের উত্তর প্রান্ত হইতে দুর্দ্দান্ত নরমানেরা আসিয়া ইংলণ্ড অধিকার করিল, এবং ইংলণ্ডে যাহা কিছু রীতি পদ্ধতি ছিল, সমস্ত উলটাইয়া দিয়া উত্তরকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণকে উত্তর করিল। ইংলণ্ডীয় সভ্যতার প্রথমোদ্ভব সময়ে উহাতে পরকীয়স্পর্শ হইয়াছে কি না, তাহা সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইল; উহার বিকাশসময়ে কি পরিমাণে পরের সংস্রব ঘটিয়াছে, ইংলণ্ডের সমাজও বাণিজ্যাদি বিষয়ক ইতিবৃত্তই তাহার সাক্ষিস্থলে দণ্ডায়মান।

পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ভাগীরথীর জলরাশি, হিমাচলের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া যেমন একখাতে প্রবাহিত হইয়াছে, ভারতীয় আর্য্যবংশের নির্ম্মল স্রোতও সেই আদিম কাল হইতে ঐরূপ একখাতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। চীন, তাতার, পারসীক, আফগান প্রভৃতি নিকটবর্ত্তিদেশসমূহের পুরাতন অধিবাসীরা, সসম্ভ্রমে দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, দর্শন করিয়াছে; কেহই ঐ প্রবাহ স্পর্শ করিতে সাহসী হয় নাই। ভারতবর্ষে দস্যু, অসুর প্রভৃতি অসভ্যজাতীয়েরা, প্রথমে বিরোধ করিয়া, পরে আর্য্যবাহুবলে সর্ব্বথা পরাজিত হইয়া, ভীতচিত্তে

ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে; আর্য্য দিগের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা যেখানে অবস্থান করিতেন, তাহার ত্রিসীমাতেও পাদ চারণা করিতে অধিকার পায় নাই। আর্য্যবংশের অভ্যুদয়কাহিনী এবং সভ্যতার ইতিহাস দুইশত কিংবা চারি শত বৎসরের কথা নহে। যে ঋগ্বেদ লইয়া ইয়োরোপের পণ্ডিত সমাজ ইদানীং এত মত্ত হইয়াছেন, তাহা খৃষ্টের আবির্ভাবের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যদিগের হৃদয়কন্দর হইতে সহস্রধারায় নিঃসৃত হইয়া পৃথিবী পবিত্র করিয়াছে। ভারতীয় আর্য্যেরা যেকালে, তরুমূলে কিংবা প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী কি নর্ম্মদার উপকূলে সমবেতভাবে উপবিষ্ট হইয়া, শ্রবণমনোহরসামগানে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অধিদেবতার স্তুতিগান করিতেন; যেকালে তাঁহারা, কবিতার অমৃতাঞ্জনে নয়ন রঞ্জিত করিয়া, বালার্কসৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতেন, জল ও অগ্নির বন্দনা করিতেন, এবং জলভারপূর্ণ শ্যামলমেঘমালা সন্দর্শন করিলে, উহাকেই উপকারিবন্ধুজ্ঞানে কৃতজ্ঞহৃদয়ে আদরের সহিত অভিনন্দন করিতেন; যে কালে তাঁহাদিগের মধ্যে শিষ্য জিজ্ঞাসু হইত; এবং উপাধ্যায়, তত্ত্বজ্ঞানরূপ উচ্চৈর্ব শৈলের শিখরদেশে সমারূঢ় হইয়া, তাহাকে দর্শন, নীতি, পাপ, পুণ্য, ইহকাল, পরকাল, এবং পরমপুরুষার্থ বিষয়ে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেন; তখন ইংলণ্ডের আর কথা কি, ইংলণ্ডের গুরুকুলের অপাদান চিরগৌরবান্বিত গ্রীকেরা, এবং উহার আদিগুরু রোমানজাতিও জগতে মনুষ্যজাতি বলিয়া পরিচয় লাভ করে নাই। সেই চিন্তাতীত পুরাণ কাল হইতে, যবনাধিগমের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত, আর্য্যদিগের যে কোন বিষয়ে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার সমুদয়ই তাঁহাদিগের নিজের। তাঁহাদিগের জ্ঞানবৈভব, তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাঁহাদিগের কৃষিপদ্ধতি, বাণিজ্যবৃত্তি, যুদ্ধনিয়ম, এবং সামাজিক রীতি নীতি সমস্তই দেশীয় কাননের দেশজাত তরুর স্বভাবিক ফল। জগতে আর্য্যজাতীয় বলিয়া যে কোন বস্তু নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাতে পরসম্পর্কের গন্ধমাত্রও প্রাপ্ত হইবে না।

ভাষা ও জাতীয়বন্ধন দেশের সভ্যতার মিশ্রতার কিংবা অমিশ্রতার এক প্রধান পরীক্ষাস্থল। ইংরেজদিগের ভাষা ও জাতি উভয়ই মিশ্রবস্তু। ইংরেজজাতির শরীরে কত জাতির শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, কতজাতীয় লোক, ইংলণ্ডে বাস করিয়া, সময়ক্রমে ইংরেজ হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। ইংরেজী ভাষাও

কত ভাষার শব্দ দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা গণিয়া ইদমেবতত্ত্বং রূপে অবধারণ করা, ভাষাতত্ত্ববিৎ বিচক্ষণ পণ্ডিত দিগের পক্ষেও কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের ভাষাবন্ধন ও জাতীয়বন্ধন উভয়ই এমন দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য যে, উহাতে পরকীয় প্রবেশের সম্ভাবনা ও নাই। যেমন মুসলমান প্রভৃতি কোন জাতিই কোন কালে ব্রাহ্মণ হইতে পারে নাই, সেইরূপ লাটিন, গ্রীক ও আরবী প্রভৃতি কোন ভাষার শব্দ সংস্কৃতশব্দমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, অমনি ধরা পড়িয়াছে, এবং অমনি অপাসরিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড যে ইদানীং সকল সভ্যজাতির শিরোভূষণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, ইহা অবিসংবাদিত। ভারতবর্ষের সভ্যতা বিষয়েও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সংশয় করেন না। এই উভয় মধ্যে কোন্ দেশের সভ্যতা বকলের যুক্তি মার্গানুসারে, স্বাতন্ত্র্যগুণবিশিষ্ট,অমিশ্র ও অপূর্ব্ব তাহা এইক্ষণ সহজেই মীমাংসিত হইতে পারে। মিশ্র এবং অমিশ্র এই উভয়বিধ সভ্যতার কোন্টি উৎকৃষ্ট এবং দেশের অধিকতর কল্যাণকর, আমরা তৎসম্বন্ধে এইক্ষণ কোন মত ব্যক্ত করিলাম না। গিজো প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত মিশ্রসভ্যতার গুণ পক্ষপাতী; কেহ২ আবার অমিশ্র সভ্যতার প্রশংসা করেন। আমরা এইক্ষণ, কোন পক্ষেরই স্তুতি কি নিন্দা না করিয়া, এইমাত্র বলিয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি যে, যথারীতি তুলনা করিলে, অবশ্যই ইংলণ্ডীয় সভ্যতাকে মিশ্রপদার্থ ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে অমিশ্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একথা সর্ব্বথা অখণ্ডনীয়।

যমুনালহরী।

(গীতি-কবিতা)

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা
তটশালিনি সুন্দর যমুনে! ও॥ ধ্রু

—

কত কত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।

পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ অঞ্জন ও॥

—

যুগ যুগ বাহী প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও।

তব জলবুদ্বুদ সহ কত রাজা
পরকাশিল লয় পাইল ও ॥

—

কল কল ভাষে বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি মরম পরশে কথা
ভূত সে ভারত গাথা ও ॥

—

তব জল কল্লোল সংকত সেনা
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শবনীরব রে যমুনে সব
গত যত বৈভব, কালে ও ॥

—

শ্যাম সলিল তব লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব কুরুকুল শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ তুরগ গজ ভারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ॥

—

তবজলতীরে পৌরব যাদব
পাতিল রাজ সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ॥

—

দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ পতাকা
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে ব্রহ্ম ততারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ॥

—

এজল ধারে ধারে বহিল কভু
প্রেম-বিরহ-আঁখি-নীর ও।
নাচিল গাইল কত সুখ সম্পদ
এ তব সৈকত পুলিনে ও ॥

এ তনু মুকুরে আসি পূর্ণশশী
নিরখিত মুখ যবে,শরদে ও।
ভাসিত দশ দিশি উৎসব রঙ্গে
প্লাবিতো চিত সুখ উৎসে ও ॥

—

সে তুমি সে শশী ধীর অনিল সেই
তবু সব মগন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব প্রমোদ উৎসব
গ্রাসিল সকলে কালে ও ॥

—

যে মুরলী রবে নিবিড় নিশীথে
উন্মাদিত ব্রজবালা ও।
আকুল প্রাণে তবতটপানে
ধাইত রব সন্ধানে ও ॥

—

বর্দ্ধিত বিরহে শ্বাস পবন কত
বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।
সুহৃদ সমাগমে পুন এই দর্পণে
প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও ॥

—

সে সব কৌতুক কাল কবল আজি
লেশ না রাখিল শেষ ও।
কই সেই গৌরব নিকুঞ্জ সৌরভ
হলো পরিণত শতকাহিনী ও ॥

—

কভু শত ধারে এ উভ পারে
পঠান অফগন মোগল ও।
ঢালিল সেনা ত্রাসি নিবাসী
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও ॥

—

অহ! কি কুদিবসে গ্রাসিল রাহু
মোচন হইল না আর ও।
ভাজিল চূর্ণিল উলটী পালটি
লুঠি নিল যাছিল সার ও ॥

—

সে দিন হইতে শ্মশান ভারত
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও ।
সে দিন হইতে অন্ধ মনোগৃহে
পরবল-অর্গল পাতে ও ॥

—

সে দিন হইতে তব জল তরলে !
পরশে না কুলবালা ও ।
সে দিন হইতে ভারতনারী
অবরোধে অবরোধিত ও ॥

—

সে দিন হইতে তব তট গগণে
নূপুর নাদ বিনীরব ও ।
সে দিন হইতে সব প্রতিকূলে
যে দিন ভারত বন্ধন ও ॥

—

এ পর পারে কত কত জাতীয়
ভাতিল কতশত রাজা ও ।
আসিল স্থাপিল শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটী ও ॥

কত শত দুর্জ্জয় . দুর্গম দুর্গে
বেড়িল তব তট দেশে ও ।
নগর প্রাচীরে ঘেরিল শেষে
চিরযুগ সম্ভোগ আশে ও ॥

—

উপহসি সর্ব্বে মানব গর্ব্বে
কাল প্রবল চিরকালে ও ।
গৃহ গড় পুঞ্জে কতিপয় তুঞ্জে
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও ॥

—

ঐ পুরোভাগে ভগ্ন বিভাগে
গৃহবর শেষ শরীরে ও ।
দেখিছ যে সব উজ্জ্বল লেখা
সে গতযৌবন রেখা ও ॥

এর অলিন্দে সুন্দরি বৃন্দে
মোগল নরপতি কেশরী ও ।
বসি ও মর্ম্মরে প্রমোদ অন্তরে
তোলিত মোহন রূপে ও ॥

—

কভু এ গবাক্ষে কৌতুক চক্ষে
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও ।
নিম্ন প্রদেশে সে গজ যুদ্ধে
ভীষণ প্রাণ বিনাশক ও ॥

—

এ ঘর মাঝে নারি সমাজে
বসি কভু খেলিত চৌসর ও ।
রাখিত পাশে সে তরবারি
কাফর কণ্ঠ বিদারী ও ॥

—

কৈ ? সব আজি সময়-সমুদ্রে
মজ্জিত সহ শত আশা ও ।
দেখি শত শত হলো কি নিবারিত
নিস্ত্রপ মনুজ পিপাসা ও ।

—

যে গৃহ পাশে কাঁপিত ত্রাসে
ভূপতি পদ বিক্ষেপে ও ।
সে সব ভবনে কত শত অধমে
পূরিছে মুত্র পুরীষে ও ॥

—

যে ঘর মধ্যে সুরভি সমৃদ্ধে
সম্মোহিতো চিত কালে ও ।
সে সব সদনে উন্তবে বমনে
পূতি গন্ধ বিকীরণ ও ॥

—

যে গৃহ অঙ্গে বহুবিধ রঙ্গে
বিখচিত ছিল মণি রাজি ও ।
সে সব কালে হরি ! এক কালে
ঢাকিল লতা জালে ও ॥

—

ঐ তব তীরে শুভ্র শরীরে
দণ্ডায়িত গৃহ রাজ ও ।

যার স্বরূপে দিক দিক হইতে
কর্ষে মনুজ সমাজে ও ॥

—

কত নর পঞ্জরে গঠিল ইহারে
শোষি শোণিত কোষে ও।
দর্শাইতে সব দর্শক লোকে
প্রমদা গৌরব শেষে ও ॥

—

অহ ! কত কাল রবে এ জীবিত
তটিনি ! তট তব শোভি ও।
ভুষণ হইয়ে তব জল নীলে
ব্যঞ্জিতে মম অভিলাষে ও ॥

হবে কোন কালে হত ঘোর কালে,
পরিমিত স্থূর পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে এ গৃহ দেশে
আকাশে সুধু বায়ু ও ॥

—

যদি এই শেষ রবে সব শেষে
জীবন স্বপন প্রভাতে ও।
তনু মন ক্ষয়িয়ে দুখ শত সহিয়ে
চরিছে লোক কি আশে ও ॥*

(যমুনাতীর) (প্রবাসী)

কুলবধূ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বঙ্গীয় কুলবধূরা একটুকু অধিকমাত্রায় অলসা ; বোধ হয় এই নিমিত্তই একটুকু অধিক মাত্রায় লজ্জাশীলা। তবে ন্যায়ের অনুরোধে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, বয়স পরিপক্ক হইলে, লজ্জার এই অপবাদ প্রায়শঃ থাকে না। সংসারে এক এক শ্রেণীর লোকের এক এক বিষয়ের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ দেখিলাম। কুলবধূদিগের বিশেষ বিদ্বেষ শ্রমের উপর। কোনরূপ শ্রমসাধ্যকার্য্যের নাম শুনিলেই তাঁহাদিগের ভয়ানক বিরক্তি জন্মে, এবং কেমন এক অপূর্ব্ব রক্তিম রাগে মুখচ্ছবি রঞ্জিত হইয়া উঠে। শ্রমের প্রতি এইরূপ মর্ম্মগত ঘৃণা থাকা যে নিতান্ত অনুচিত, ঈদৃশ কথা বলিতে আমি কখনই সাহসী হইব না। কারণ, শ্রমের কার্য্যে দেহকান্তি মলিন হয়, করপদের কোমলতা বিনাশ পায়, এবং হৃদয়ের সেই যে অনির্ব্বচনীয় ভাবতরঙ্গ, সেই যে কবিজনস্পৃহনীয় বিলাসলীলা, তাহাও একবারে লুক্কায়িত হয়। বিলাতীয় কুলবধূরা পড়িতে হইলেও, এই নিমিত্ত, পরের চক্ষে পড়িয়া থাকেন। এক জনে পড়ে, তাঁহারা শুনেন। বাঙ্গালি কুলবধূরা, দৈবাধীন কখনও কিছু একটুকু পড়িতে হইলে, এখনপর্য্যন্তও আপনারাই পড়িয়া থাকেন, অথবা পড়িয়া থাকেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা বেশ ভরসা করা যাইতে পারে যে, স্বরায় আর কোন উপায় কল্পিত না হইলে, এই দুর্ব্বহ গুরুভার অচিরেই স্বামীর স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

কুলবধূরা বালকের নয়নের পুতুল, যুবার মন্ত্রদেবতা, এবং বৃদ্ধের পরমার্থধন। যে গৃহে তাঁহাদিগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে মায়ের নাম হয় পিতার পরিবার ; ভ্রাতার

* এই কবিতা টিকে লছমী রাগিণী ও যৎ তালে হিন্দুস্থানী ধরাণে গান করা যায়।

নাম হয় কুটুম্ব, এবং কুটুম্ব যে কোথায় থাকেন, তাহা বলিতে পারি না। যদি কোন পাঠিকা ফুলবধূচরিত্রের কোন অংশ পাঠ করিয়া আমার প্রতি বিরক্ত হন, তাঁহাকে আমি বিনীতভাবে অগ্রেই জানাইয়া রাখিতেছি যে, আমার পত্রোক্ত কোন কথার সহিতই তাঁহার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই। আমার এই পটে তিনি তাঁহার প্রতিবেশিনীদিগের প্রতিমাই চিত্রিত দেখিবেন। আমি ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে আমি স্বভাবতঃ নিন্দুক নহি, কাহারও নিন্দা করিতে কখনও আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি যেমন দেখিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করিব। যদি স্বরূপবর্ণনাতেও কেহ অসন্তুষ্ট হন, তিনি কখনই দেবতা নহেন, যেহেতু দেবানাং স্বরূপং স্তুতিঃ।

আমার বিবেচনায় এদেশের ফুলবধূদিগের মহিমা অদ্য পর্য্যন্তও বিলাতীয় ফুলবধূদিগের মহিমার অনেক নীচে রহিয়াছে। এদেশের ফুলবধূরা অদ্য পর্য্যন্তও স্বয়ং সন্তান পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু, বিলাতে যে সকল কুলকামিনীরা ফুলবধূ নাম পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সন্তানকে দুগ্ধদান এবং লালনাদি কার্য্যের জন্যেও ধাত্রী নিযুক্ত করেন। কালিদাসের ন্যায় কবিত্বশক্তি থাকিলে, তাদৃশী ধাত্রীর সম্বন্ধে অকুতোভয়ে বলিতাম যে, সাম্রাতা মাতরস্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ। বেশপারিপাট্যবিষয়েও এদেশের ফুলবধূরা আজ তক যথোচিত শিক্ষা কি নৈপুণ্য লাভ করেন নাই। এদেশে মধ্যমাবস্থার একজন ভদ্রলোক অনায়াসে গৃহে একটী ফুলবধূকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়া পুষিয়া রাখিতে পারে। বিলাতে তেমন লোকেরও উহা অসাধ্য হয়। আডিসন নামে বিলাতে এক সময় বড় এক নিন্দুক লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিলাতীয় ফুলবধূদিগের পরিচ্ছদঘটা কমাইবার জন্য তিনি কতই চীৎকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দেখাদেখিই বা কত জনে কত কথা বলিয়াছিল। তাঁহাদিগের চীৎকার অরণ্যে রোদনের সমান হইল। ফরাসিস দেশে ফুলবধূদিগের পরিচ্ছদপরিবর্ত্তন কতকগুলি বহুসমাদৃত সংবাদপত্রসম্পাদকের উপজীব্যস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ঐ কাহিনীই বিশেষ যত্নের সহিত লিখিয়া থাকেন, এবং ঐ উপায়ে তাঁহাদিগের অর্থাগমও বিলক্ষণ হইয়া থাকে। পারীশের ফুলবধূরা শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তাদি ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে মাসে মাসে সপ্তাহে সপ্তাহে, দিবসে দিবসে, এবং দিবসের দ্বাদশ ঘটিকায় যেরূপ নূতন নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া লোকের নয়নপথে সঞ্চরণ করেন, সুবিজ্ঞসম্পাদক মহাশয়েরা তাহা তিল তিল করিয়া বর্ণনা করেন এবং বর্ণনার সঙ্গে আবার সুন্দর ছবি আঁকিয়া দেন। অন্যান্য স্থানের আকুলহৃদয়া ফুলবধূরা সেই বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং সেই ছবি দর্শন করিয়া তদনুসারে নিজ নিজ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন।

রাজপুতনা প্রদেশে কাহারও গৃহে দৈবদোষে কন্যাসন্তান জন্মিলে, গৃহস্বামীর মুখ শুষ্ক হইয়া যায়। চন্দ্র সূর্য্যের বংশ হইতে বর মিলাইতে না পারিলে, স্ববংশের মান থাকে না, এবং সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে না পারিলে, তাদৃশ

বরও মিলান যায় না। সুতরাং, তখন হয় কন্যার গলায় না হয় আপনার গলায় ছুরি দিতে হয়, অথবা ফকীর হইয়া বাহির হইতে হয়। কন্যা জন্মিলে পিতার মন বিলাতেও বিষাদে মলিন হয়। সেখানকার ভাবনা বরের জন্য নহে, বস্ত্রের জন্য। সেদেশে অনুসন্ধান করিলে, চন্দ্র সূর্য্য কেন, রাহু কেতুর বংশ হইতেও বর আনা যাইতে পারে। কিন্তু একটি মেয়েকে শিষ্টব্যবহারসম্মত, সুখপরিধেয় সুদৃশ্য বস্ত্র দিয়া রাখা অনেকের পক্ষে কষ্টকর। যদি সে আবার কালে ফুলবধূমণ্ডলে আসন লাভ করে, তবে তাহার বস্ত্র যোগান সম্পন্ন পিতার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বঙ্গদেশে ইদানীং যেরূপ অজ্ঞানতিমিরবিনাশিনী, অশ্লীলতানিবারিণী সুরাপাননিবেধিনী প্রভৃতি সুন্দরনাম-যুক্ত সুন্দরসভা সকল স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কতকগুলি উগ্রতেজা যুবক কর্ত্তৃক কতিপয় বৎসর অতীত হইল বসনাড়ম্বর নিবারিণী নামে সেইরূপ এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সভা বিশেষ কোন কার্য্যফল প্রসব করেন নাই। তবে, আমাদিগের দেশীয় ফুলবধূদিগের দ্বারা বম্বে ও মানচেষ্টারের তুলাব্যবসায়ী মহাজনদিগের যেরূপ অপকার হইতেছে, বিলাতীয় ফুলবধূদিগের দ্বারা সেরূপ অপকার হইতেছে না। তাঁহারা বরং কার্য্যতঃ ঐ ব্যবসায়ের উপকারই করিতেছেন। কিন্তু রজতকাঞ্চনাদি বস্তুর প্রতি অনুরাগ-বিষয়ে, বিলাতের তাঁহারা আমাদিগের ইহাঁদের দাসী হইবারও যোগ্য নহেন।

ফুলবধূরা এদেশে বসনের প্রতি যতই কেন উদাসীনা হউন না, আভরণ বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুমাত্রও ঔদাস্য নাই। তাঁহারা আভরণের জন্য বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন, স্বকীয় বালকের বিদ্যাশিক্ষা রহিত করিতে পারেন, বাপ মায়ের প্রাণে দগ্ধশেলের মত কথা বিদ্ধ করিতে পারেন, স্বামীকে পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন, এবং যদি অগাধজলে ঝাঁপদিতে হয়, বোধ হয় তাহাও পারেন। তাঁহাদিগের নবনীতনিন্দিত সুকোমল দেহলতিকা প্রাতঃ সূর্য্যের কিরণস্পর্শেও উনিয়া পড়ে; কিন্তু আভরণের অনুরোধে, তাঁহারা নাসা কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গে লৌহশলাকা দ্বারা বেধ করাইতেও আহ্লাদের সহিত, উৎসাহের সহিত, এবং উন্মত্ততার সহিত সম্মত হন। যদি ব্যবহার থাকিত, তাহা হইলে বোধহয় চৈত্রপুজার সন্ন্যাসিদিগের মত জিহ্বা এবং পৃষ্ঠচর্ম্মেও তাঁহারা আরভণ-ধারণের উপায় করিয়া লইতেন। আমি যখন তাঁহাদিগের নাসিকার অঙ্গুরী দর্শন করি, তখন নাসাসূত্রধৃত অগাধ জলসঞ্চারী অবিকারী রোহিতকে আমার স্মরণ হয়;—যখন তাঁহাদিগের কর্ণশোভিরক্ত, পরম্পরা এবং ঐরক্তবি লম্বিভূষণসকল অবলোকন করি, তখন মনুষ্যের গৃহপোষিত প্রভুপদানত প্রাণি বিশেষের কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়ে; এবং যখন তাঁহাদিগের পদসঞ্চারজনিত মঞ্জুমঞ্জীরনাদ আমার শ্রুতি পথে আগত হয়, তখন কারাবাসিদিগের চরণ নিগড়ও সার্থক বলিয়া স্বীকার করি (ইতি পরিব্রাজক শ্রীকল্যাণ ভট্ট শর্ম্মণঃ)

রাজা ও প্রজা।

---০০✻০০---

রাজা ও রাজপদ কোন্ সময়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অবধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। রাজত্বের উৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিতদিগের ঐকমত্য নাই। পণ্ডিতেরা সমাজসংস্থানবিষয়েও যেরূপ নানাবিধ বিচিত্র কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, রাজশাসনের প্রথমপ্রতিষ্ঠাবিষয়েও সেইরূপ বহু প্রকার. কপোলকল্পিত মতকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কেহ বলেন, অতি পূর্ব্বকালে মনুষ্যসমাজে কোন ব্যক্তিই রাজপূজা প্রাপ্ত হইত না। যেমন এখন এক এক পরিবারে এক এক জন কর্ত্তা থাকে, পূর্ব্বেও এক এক পরিবারে ঐরূপ এক একজন কর্ত্তা থাকিত। ঐ পারিবারিক প্রভুতাই নানাকারণবশতঃ কালে বহুপরিবারের উপর প্রসারিত হইয়া রাজশক্তির মূর্ত্তি ধারণ করে। কাহারও মত এই যে, সামাজিকেরা, পরাক্রান্ত প্রতিবেশীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, শারীরিকবল, অস্ত্রনৈপুণ্য এবং সাহসাদি গুণের পরীক্ষা লইয়া, আপনাদিগের মধ্যে এক জনকে রাজপদে অভিষেক করিত, এবং অভিষেকের পর হইতে তিনিই সকল বিষয়ে সকলের অগ্রণী হইতেন। কোন মহাত্মা সিদ্ধান্ত করেন, ইদানীং সংসারে অধর্ম্মের যেরূপ ভয়ানক প্রভাব হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিলনা। পূর্ব্বকালের লোকেরা অসদ্ব্যবহার জানিতনা, অসাধুপথে পাদচারণা করিত না, এবং পরকালের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ইহকালের সেবা করিতনা। তাহারা যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক এবং পরমার্থপরায়ণ বিবেচনা করিত, তাহাকে গুরু বলিয়া পূজা করিত। ক্রমে পারত্রিক মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক মঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণভারও ঐ গুরুদিগের হস্তে ন্যস্ত হইল; এবং এই হেতু গুরুরাই পরিশেষে রাজা হইলেন। অরণ্যচারী আরব, তাতার, এবং দ্বীপ ও পর্ব্বতবাসী অসভ্যজাতিসমূহের বর্ত্তমান রীতি পদ্ধতির পর্য্যালোচনা করিলে, এই সকল বিভিন্ন মতের অনুকূল ও প্রতিকূল নানারূপ নিদর্শন সংকলিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা এইক্ষণ আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। কিরূপে রাজপদের সৃষ্টি হয়, তাহার অনুসন্ধান পরিত্যাগকরিয়া, রাজা ও প্রজা পরস্পর কি সম্বন্ধে বদ্ধ, এবং এই দুইয়ের মধ্যে কে প্রভু, কে সেবক, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

যে সকল রাজ্য, উদিত ও বিকশিত হইয়া, কালশাসনে পুনরায় লয়প্রাপ্ত হইয়াছে,তৎসমুদয়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, মনুষ্যজীবনের যেমন বাল্য, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য এই তিনটী পৃথক পরিচ্ছেদ আছে; রাজনীতিরও বয়ঃকালভেদে সেইরূপ তিনটী পৃথক যুগ নিরূপিত রহিয়াছে। সংজ্ঞা দিতে হইলে, প্রথমকালকে রাজযুগ, মধ্যকালকে মিশ্রযুগ এবং রাজনীতির পরিপক্ক প্রৌঢ় কালকে প্রাকৃতযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

মনুষ্য অতি প্রথমে নিরাকারা নীতির মাহাত্ম্য অনুভব করিতেপারেনা। তখন সে সকল বিষয়েই সাধ করিয়া দণ্ডধারী পুরুষের অধীন হইতে ইচ্ছুক হয়। আমরা রাজাসংস্থানের ঐ কালকে রাজযুগ বলিয়া ব্যাখ্যা করি। রাজযুগে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা, প্রজা কিছুই নহে। ব্যবস্থাপকেরা সে সময়ে রাজার সুখ, রাজার সম্মান,এবং রাজকীয়শক্তির সীমাবৃদ্ধির জন্যই কায়মনোবাক্যে যত্নপর হয়েন. প্রজাকে কোন বিষয়েই গণনাস্থলে উপস্থিত করেন না। অধিক কি, প্রজা যে মনুষ্য এবং তাহার যে মনুষ্যোচিত কতকগুলি স্বত্ব ও কতকগুলি স্বাভাবিক স্পৃহা আছে, তাহাও তাঁহারা ভুলিয়া মনে করেন না। রাজনীতি বিষয়ে মনুসংহিতার ব্যবস্থাকেই অতি প্রাচীন অনুশাসন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণাং অগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
নচৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুং॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥
বালোপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥
একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ং॥
যস্য প্রসাদে পদ্মাশ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥
তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ং।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ"

"জগৎ অরাজক হইলে সকলেই বলবানের ভয়ে বিচলিত হইবে,এই হেতু

বিধাতা সমুদয় চরাচরের রক্ষার জন্য ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই অষ্টদিকপালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া, রাজার সৃষ্টি করেন। যেহেতু রাজা ইন্দ্রাদি প্রধান দেবতাদিগের অংশে নির্ম্মিত হইয়াছেন, অতএব তিনি স্বকীয় তেজে সকল প্রাণীকেই অভিভব করিতে পারেন। রাজা, সূর্য্যের ন্যায়, দর্শকবৃন্দের চক্ষু ও মনকে সন্তাপিত করেন; পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই রাজাকে আভিমুখ্যে অবলোকন করিতে সমর্থ হয়না। শক্তির আতিশয্য হেতু, তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি সূর্য্য, তিনি চন্দ্র, তিনি যম, তিনি কুবের, তিনি বরুণ এবং তিনিই মহেন্দ্র। রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবেক না, যেহেতু তিনি কোন প্রধান দেবতা নররূপে অবস্থান করিতেছেন। যেব্যক্তি অসাবধান হইয়া অগ্নির অতিনিকটে গমন করে, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন: কিন্তু রাজস্বরূপ অগ্নি পুত্রদারভ্রাত্রাদিরূপ কুল, গো অশ্ব মেষাদিপশু, এবং সুবর্ণাদি ধনসঞ্চয় সমুদয়ই দহন করে। রাজা সর্ব্বতেজোময়। তিনি প্রসন্ন হইলে মহতী শ্রী লাভ হয়, তাঁহার পরাক্রমে দুর্দ্দম শত্রুকেও দমন করা যায়, এবং তিনি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ রাজার অপ্রীতিকর কার্য্য করে, সে নিঃসংশয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেহেতু রাজা স্বয়ং তাহার বিনাশের জন্য মনোযোগ করেন"।

এই বচনগুলি পাঠ করিবার সময়, কেহই রাজা ও প্রজাকে একজাতীয় মনুষ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। মনে আপনা হইতেই এইরূপ ধারণা হয় যে, সমস্ত মনুষ্য জাতি ইতর প্রাণী, আর রাজমুকুটমণ্ডিত মহাপুরুষেরা কোন এক বিশেষ প্রকারের অলৌকিক জীব। তাঁহাদিগের শক্তির ইয়ত্তা নাই, ইচ্ছার নিয়ামক নাই, এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপেরও বিচারস্থান নাই। তাঁহাদিগের নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তি, যেদিকে বল সেই দিকেই, প্রধাবিত হইতে পারে। উহার গতিপথে কেহই কোনরূপ বাধা দিতে অধিকারী কিংবা সমর্থ নহে। মনুসংহিতায় যদিও ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত, দুর্ম্মন্ত্রিপরিবৃত, দুর্ব্বিনীত রাজার অখ্যাতি ও বিনাশসম্ভাবনার কথা লিখিত আছে; সে লেখা, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থার মত, লেখা মাত্র। কারণ, রাজা রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া প্রজার স্বত্ব ও অধিকারের উপর আক্রমণ করিলে, সমবেত প্রজাবর্গ তাঁহাকে অপরাধীর ন্যায় বিচারস্থলে আনয়ন করিয়া যথারীতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবে, এমন কোন স্পষ্ট বিধি মনু কিংবা মনুর উত্তরকালবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের গ্রন্থ মধ্যে পরিলক্ষিত হয়না।

ইয়ুরোপেও পুরাকালে রাজারা দেববংশসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইতেন, এবং রাজশক্তি সর্ব্বথা অপ্রতিহত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। মনু যেমন বলিয়াছেন, 'মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি' ইয়ুরোপের কবিও সেইরূপ দেশীয়দিগের হৃদয়ের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন, দৈবী-শক্তি আপনিই আবরণ হইয়া রাজার রক্ষা করেন।" ইংলণ্ডীয় রাজনীতিশাস্ত্রের শিরঃস্থানে অদ্যাপি জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে 'রাজা কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন না'। একথার মর্ম্মার্থ এই,রাজা, প্রভাব ও প্রকৃতি উভয় বিষয়েই, লৌকিক জগতের এত ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন যে, তদীয় চরিত্রে কখনও কোনরূপ দোষস্পর্শ সম্ভবে না।

পূর্ব্বে রোম, পরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়াপ্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরা কোন দিনও আপনাদিগকে কৃতকর্ম্মের জন্য মনুষ্যের নিকট দায়ী বিবেচনা করিতেন না। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন, দেশের কোন শক্তিই তাঁহাদিগের সর্ব্বগ্রাসিনী প্রভুশক্তির সম্মুখীন হইতে পারে নাই। লোকের মান, মর্য্যাদা, বিষয়,বৈভব সমস্তই সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের তরঙ্গায়িত চঞ্চলমতির উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদিগের কৃপাকটাক্ষ নিপতিত হইলে, অতিকুক্রিয়ান্বিত অধম ব্যক্তিও একরাত্রিমধ্যে দেশে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিত, এবং তাঁহাদিগের অকৃপা হইলে বহুদিনের সম্ভ্রান্ত, বহুলোকপূজিত ব্যক্তিও দেখিতে দেখিতেই ধনে প্রাণে অপার দুঃখার্ণবে ডুবিয়া যাইত। ইয়ুরোপীয় সমাজের অনেক সমৃদ্ধ পরিবারই কলঙ্ক সমুদ্রের ফেনাসদৃশ। ভগিনী কি কন্যা ভোগ্যা ভাবে রাজার প্রমোদগৃহে প্রবেশ করিয়াছে; ভ্রাতা অথবা পিতা, লৌকিকমর্য্যাদায় মণ্ডিত হইয়া,সমাজের অত্যুচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াছেন। অনেকে,অতি নিকৃষ্ট ভৃত্যরূপে রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়া, রাজপ্রসাদবলে অতি অল্পকালেই অভিজাতকুলে স্থান লাভ করিয়াছে, এবং রাজার কুক্কুরপালকও অনেক সময়ে প্রধান রাজমন্ত্রী কিংবা সেনাপতির সমান আসনে আসীন হইয়াছে।

রাজশক্তির আধিপত্য সময়ে সকল রাজাই প্রজার স্বত্বকে পাদতলে দলন করিয়াছেন, এইরূপ বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, এবং ইহা বস্তুতঃ ইতিহাস বিরুদ্ধ। মনুষ্য সিংহাসনেই শোভা পাউক, অথবা জীর্ণবস্ত্রে আবৃত হইয়া পর্ণকুটীরেই অবস্থান করুক, তাহাকে অবশ্যই মনুষ্য বলিব। এবং মনুষ্য হইলেই সে মানব জাতির স্তুতিনিন্দারূপ সুদৃঢ় শাসনের অধীন হইল। যদি পৃথিবীস্থ সমস্ত স্বেচ্ছাচার রাজা, নিরো ও কেলিগুলা প্রভৃতি অমানুষ

নরপতিদিগের মত, লোকপীড়নকেই নিজ নিজ জীবনের একমাত্র ব্রত জ্ঞান করিত,—যদি তাহারা সকলেই ন্যায়কে অন্যায়, এবং অন্যায়কে ন্যায়রূপে প্রতিপাদন করিতে যত্নপর হইত,—যদি প্রজার সুখ দুঃখকে রাজার প্রবৃত্তি সাগরে ডুবাইয়া দেওয়াই রাজনীতির প্রধান সূত্র হইয়া উঠিত, তাহা হইলে মানবসমাজের একীভূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়া সমুদায় জগৎকে চমকিত করিত, সন্দেহ নাই। যে সকল রাজা কোন রূপ নিয়মের অধীন নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও যে অনেকে বিনীত, প্রজারঞ্জনরত, ও সদাচারপরায়ণ হইয়া জগতের হিতানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, প্রাগুক্ত লৌকিকশাসনই তাহার কারণ। ইংলণ্ডীয় এলফ্রেড পার্লিয়ামেণ্টের অধীন ছিলেন না, অথচ পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মাধীন কোন রাজাই ন্যায়পরতা কিংবা প্রজাবৎসলতা বিষয়ে এলফ্রেডের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্যব্যক্তি নহেন। সকল দেশের রাজবংশাবলীতেই এইরূপ দুই একটী সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সাধু পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু রাজা সদাচারনিষ্ঠ হইলেই যে রাজশক্তি খর্ব্বীকৃত হইল এবং প্রজার ক্ষমতা বাড়িল, এমন নহে।

আমরা যে কালকে রাজনীতির মিশ্রযুগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অভ্যুদয় হইলেই প্রজাবর্গের মনুষ্যসংখ্যায় গণনারম্ভ হয়। এস্থলে মনুষ্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে রাজ্যের শাসনপ্রণালী, আয় ব্যয়ের সংস্থান, রাজপুরুষনিয়োগ, এবং পররাজ্যের সহিত শত্রুতা কি মিত্রতা ইত্যাদি কোন বিষয়েই প্রজার মতামত থাকেনা;—সিংহাসনারূঢ় একব্যক্তি যে রূপ ইচ্ছা করেন, এক কোটী লোকের অনিচ্ছা হইলেও তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়, এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যদি সকলকে সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইয়া হৃদয়ের শোণিত অজস্রধারায় ঢালিতে হয় তাহাতেও কিছু আসে যায় না। এই সময়ে সেই ভাব অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। রাজার শক্তি অল্প অল্প করিয়া কমিতে থাকে এবং প্রজার ক্ষমতা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়। রাজা এবং রাজকীয় শক্তি যখন একবারে প্রজার শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়, তখনই যথার্থ প্রাকৃতযুগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষীয় রাজারা যদিও শাস্ত্রানুসারে স্বেচ্ছাচারীছিলেন, কিন্তু বস্তুগত্যা তাঁহারা কখনও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ব্যবহার করিতে অবসর পান নাই। ভারতবর্ষ চিরকালই ধর্ম্মনীতির প্রিয় ও পবিত্র বাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং হিন্দুরাজগণের আর কোন গুণ নাথাকুক, দয়াপরতা এবং দেবলোকচিত মাহাত্ম্য

প্রদর্শন বিষয়ে কোন দেশের রাজার সহিত তাঁহাদিগের তুলনা হয় না। তাঁহারা সকলেই শ্রদ্ধা সহকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন পালন করিতেন, এবং পাছে প্রজাপালক নামে কোন প্রকারে কলঙ্ক রেখা নিপতিত হয়, এই ভয়ে সকলেই সতত ভীত থাকিতেন। ভারতবর্ষীয় সম্রাটের নিকট প্রজার সন্তোষ ও অসন্তোষের আদর ছিল কিনা, রাজা রামচন্দ্রের অলোকসাধারণ অদ্ভুত কীর্ত্তিই তাহার প্রমাণ। আর একটী কথা এই, এদেশের ক্ষত্রকুলতিলকেরা প্রতাপে যতই বড় হইয়া থাকুন, তাঁহারা রাজনীতিঘটিত মন্ত্রণা এবং রাজশক্তির প্রয়োগকালে তপোরত ও দয়াশীল ঋষিসমাজের বাক্য লঙ্ঘন করিতে কখনই সাহসী হইতেন না, এবং ঋষিবাক্যই সকল সময়ে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তিস্রোতে ভয়ানক প্রতিবন্ধকের কার্য্য করিত। অতি দুর্দ্ধর্ষ সম্রাটগণও প্রজাবৎসল সামান্য ঋষিদিগকে দেবতার মত পূজাকরিতেন, এবং তাঁহাদিগের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। এই সমস্ত কারনবশতঃ ভারতবর্ষের প্রজা কোন সময়ে একবারে পশুবৎ নিষ্পেষিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে যে, কোন সময়েও রাজশক্তির আদি প্রস্রবণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এমন আমরা দেখিতে পাই না।

রাজা ও প্রজা, সেবাসেবকসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশের সেবায় মিলিতভাবে কার্য্য করিলে, কিরূপ আশ্চর্য্য ফল ফলিয়া থাকে, ইংলণ্ডই তাহার প্রধান উদাহরণস্থান। কিন্তু ইংলণ্ড অদ্যাপি মিশ্রযুগের ছায়ায় অবস্থান করিতেছে। ইংলণ্ডের প্রজা স্বাধীন, কিন্তু প্রভুনাম বিবর্জ্জিত, ইংলণ্ডের প্রজা এখনও রাজা হয়নাই। যে সকল দেশে প্রজার রাজশক্তি অর্থাৎ প্রাকৃতযুগ সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমেরিকাই সর্ব্বাংশে অগ্রগন্য। আমেরিকায় ছোট বড় সকল ব্যক্তিই রাজা, যাঁহারা রাজপুরুষ বলিয়া পরিচিত তাঁহারা সেবক মাত্র।

রাজযুগ, মিশ্রযুগ এবং প্রাকৃতযুগ এই তিনের কোন্‌টী বিধিনির্দ্দিষ্ট এবং পৃথিবীর মঙ্গলকর, তাহার বিচার করা এইক্ষণ আমাদিগের বিষয় নহে। কিন্তু আমরা ইহা অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, মানবজাতির চিন্তাস্রোতের গতি আজ কাল প্রাকৃত যুগের অনুকূল। মনুষ্যের সামাজিকশক্তি, যাহাতে একের হস্তে ন্যস্ত নাথাকিয়া, যথাযথ রূপে সকলের মধ্যে বিভক্ত হয়, এই অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ লক্ষণ। পূর্ব্বে রাজারা প্রভু এবং সকল শক্তির আকর ছিলেন, এইক্ষণ প্রজাই সকল দেশে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রভু এবং সকল শক্তির মূলাধার বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

আর কি দেখিব ?

—০০*০০—

যে সুখ স্বপন আজি, দেখিলাম হায় !
আর কি দেখিব ?
নিদ্রার তামস গর্ভে, এমন উজ্জ্বল মণি,
আর কি পাইব ?
বিষাদনীরদেমাখা জীবন-আকাশে হায়,
দেখিব কি হেন তারা, কি জাগ্রতে কি নিদ্রায় ?

২

নবদুর্ব্বাদলাকীর্ণ শ্যামল প্রাঙ্গণে—
দেখিলাম হায় !
নিদাঘ নিশীথে সুখে, নিশানাথকরতলে
শুইয়া ধবায় ।
মধুর এস্রার তানে, চন্দ্রমা হাসিতে ছিল,
জীবন হইতে ছিল, শীতল কৌমুদীময় !

কখন বাজিতেছিল, মরি সে সঙ্গীত !
মধুর এস্রারে ।
বামাকণ্ঠ সুললিত, প্রণয় পুরিত গীত,
উদাস সংসারে !
কখন গর্জ্জিতেছিল, অভিমানে ঝঙ্কারিয়া
কখন কাঁদিতেছিল, বিরহেতে উছসিয়া ;

৪

বিরাজে চঞ্চলতারে,—বসন্ত, শরত,
ষড় ঋতু গন ;
পিককণ্ঠ বসন্তের, মেঘ মন্দ্র শরতের ;
নিদাঘ দাহন ;
ঘন বরিষারধারা, শিশিরের কুজ্ঝটিকা ;
কভু নন্দনের শোভা; কভু শুষ্ক মরীচিকা

৫

হৃদয়ের কত ভাব, সেই কল কণ্ঠে
উঠিল জাগিয়া,—
সুখের শৈশবকাল, কখন পড়িল মনে,
উঠিল বাঁচিয়া
মৃত স্মৃতি সেই স্রোতে, বহে প্রতিবিম্বি হায় !
স্বর্গীয় জননীমুখ, জনকের প্রতিমায় ।

৬

সিয়রে করুণাময়ী,—জননী রূপিনী !
বসিয়া আদরে ।
স্নেহসিক্ত করপদ্ম, বুলাইতেছিলা মাতা
মম কলেবরে ;
স্বর্গভ্রষ্ট পারিজাত, সুকুমার শিশুগন
মধুমাখা ছাই পাঁশ, করিতেছে বরিষণ !

আর কি দেখিব ? হেন দৃশ্য মনোহর
পবিত্র, নির্ম্মল !
আর কি দেখিব হায় ! উদার মূরতি তব
সরল, সুন্দর !
জননীর স্নেহবাণি, শিশুকণ্ঠ সুধাময়,
আর কি শুনিব কভু ? যুড়াইব এহৃদয় !

৮

পরিবর্ত্তিল স্বপ্ন! সজ্জিত তরণী,
এই নদী তীরে;
আছ দাঁড়াইয়া তুমি! আছি দাঁড়াইয়া আমি।
অশ্রু ঝরে ধীরে।
নৈশ অন্ধকারে হায়, কেহ নাহি দেখি কারে,
যুগল হৃদয় কিন্তু, দেখিতেছি পরস্পরে!

৯

আমারে হৃদয়ে ধরি, বলিলা কাতরে
'আর কি দেখিব'?
তোরে দেখি যেই সুখ, পাই আমি সেই সুখ,
আর কি পাইব?
আশীর্ব্বাদ করি বৎস! তোরা পঞ্চসহোদরে,
রক্ষিবেন অনুক্ষণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে!'

১০

হতভাগা অন্ধ নর! শুনে আজি তব,
কাঁদিবে অন্তর,
কালের করাল স্রোতে, গিয়াছে ভাসিয়া মম,
এক সহোদর!
বহিতেছে নিরন্তর, সেই স্রোত দুর্নিবার!
"আর কি দেখিব?" আহা! ভবিষ্যত অন্ধকার!

শ্রীনঃ

—০০*০০—

ষট্ কারক।

ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্—

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয়, তাহাকে কারক বলে।

পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, তাহাদের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় অর্থাৎ সম্পর্ক নাই। তাহারা কোনদিনও কোন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় নাই, এবং লিপ্ত হইবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যায়না। তাহাদিগকে এই নিমিত্ত কারক বলিতে পারিনা। তাহাদিগকে উপসর্গ কিংবা উপপদ বলা যায় কিনা, ইহা বিচার্য্য রহিল।

ষট্কারকাণি—

অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ কর্ম্ম, কর্ত্তা এই ছয় কারক।

—

অপাদান।

যতো বিশ্লেষঃ—। ১।

যাহাহইতে বিশ্লেষ অর্থাৎ একবারে

ছাড়াছাড়ি হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

এই সূত্রানুসারে সম্প্রদত্তা কন্যা এবং দত্তকপুত্র এই দুইয়ের সম্বন্ধে জনকজননী, এবং দেশী খৃষ্টিয়ান, উচ্ছেদশীল নব্য সভ্য, এবং বিলাতি বাবু এই তিনের সম্বন্ধে পিতৃকুল, পৈতৃক আচার ব্যবহার এবং দেশীয় সমাজ অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

ভয়হেতুঃ—। ২।

যাহাহইতে ভয় হয়, তাহাকে অপাদান বলে। বালকের অপাদান মাষ্টার মহাশয়, কারণ তিনি কথায় কথায় মুষ্টিঘাত করেন; নবোঢ়া বধূর অপাদান শাশুড়ী কিংবা নবরঙ্গিণী ননদিনী, কারণ তাঁহারা কাজে অকাজে ঝঙ্কার দেন; বৃদ্ধের অপাদান যুবতী ভার্য্যা, কারণ তাঁহার আরক্ত অপাঙ্গ, বক্রে গ্রীবা, এবং ক্রোধস্ফুরিত অধরবিম্ব দর্শন করিলেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে; বনে অপাদান ব্যাঘ্র, কাছারিতে অপাদান হাকিম, এবং বাঙ্গালির অপাদান শ্বেতাস্য ফিরিঙ্গী। গরিব ভদ্রলোকের পক্ষে চাকর মহাশয়ও অপাদান বিশেষ।

যত আদানম্—। ৩।

যাহাহইতে আদান অর্থাৎ উশুল করা হয়, তাহাকে অপদান বলে।

জামাই বাবুর পক্ষে এই অর্থে শ্বশুর এক চমৎকার অপাদান। গুরুর অপাদান শিষ্য, যত ইচ্ছা তত উশুল করিয়া লও, কথাটিও বলিতে পারিবেনা। কোন নূতন রকম টেক্সের বেলায়, সরকার বাহাদুরের অপাদান জমিদার, জমিদারের অপাদান তালুকদার, তালুকদারের অপাদান হাওলাদার এবং সকলের শেষ অপাদান মাঠের কৃষক। ইংলণ্ডের সম্বন্ধে ভারতবর্ষ আজ কাল বড় সন্তোষজনক অপাদান হইয়া উঠিয়াছে। অলঙ্কার উশুল করিবার সময়, স্ত্রীর পক্ষে স্ত্রৈণ স্বামীকেও অপাদান বলা যাইতে পারে।

ভুবঃপ্রভবঃ—। ৪।

আবির্ভাবভূমি অর্থাৎ প্রথমপ্রকাশ স্থান অপাদান হয়।

যে স্থানে কতকগুলি লোক একত্র উপবেশন করে, এক জনে কি বলে, আর সকলে করতালি দিয়া দশদিগ পূর্ণকরিয়া লয়, তাদৃশ স্থানকে অপাদান বলি। কারণ তথায় অনেকের মাহাত্ম্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অর্থে আরও অনেক প্রকারের স্থান অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

—

সম্প্রদান।

যস্মৈ দানম্—।

যাহার উদ্দেশে দান করাযায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে।

সংসারে সম্প্রদান কারকের অভাব নাই। সকলেই, কাহারও না কাহারও নিকট, কোন না কোন সময়, সম্প্রদানের

মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করেন। দুর্গাপূজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়ার সময়ে, সম্প্রদান কারকের উৎপীড়নে দ্বার অবরোধ করিতে হয়। সম্প্রদানের মধ্যে এদেশে গুরু, পুরোহিত, ভাট, বামণ, বৈষ্ণব ও ভিক্ষুক প্রভৃতিরই বিশেষ গণনা। বঙ্গের মহারাজ গুরুরা সম্প্রদানের শিরোমণি। কোন দেশেই অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মত সম্প্রদান আবির্ভূত হয় নাই। ছাত্রকে চপেট এবং অশ্রুপূর্ণনয়না অসহায়া বৃদ্ধা জননীকে গালাগালি দিতে হইলে, তাঁহাদিগকে সম্প্রদান বলা যায় কিনা, ইহা মীমাংসিত হয় নাই। খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটং দদাতীতি ভাষ্যপ্রয়োগানুসারে পূর্ব্বোক্ত স্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞার ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিলাতে সম্প্রদানদিগের উপর বড় শাসন। তাহাদিগকে রাজপথে দাঁড়াইয়া লোককে জ্বালাতন করিতে দেয় না। তাহারা কাগজ ছাপাইয়া আড়ম্বর সহকারে দান গ্রহণ করে, অতএব তাহারা মহাসম্প্রদান।

সাধকতমং করণং।

পরকীয় ক্রিয়া নিষ্পত্তির যে সর্ব্বপ্রধান সাধক, তাহাকে করণকারক বলে।

করণকারক অলস ও নিষ্ক্রিয় নহে। সে সর্ব্বদাই ভাল কি মন্দ কোনরূপ ক্রিয়ায় সংলিপ্ত থাকিবে। কিন্তু সে ক্রিয়া, তাহার নিজের নহে। কর্ত্তা তাহাকে যে ভাবে যে ক্রিয়ায় নিয়োগ করেন, সে সেই ভাবে সেই ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়। রাখালের হাতে লড়ি, বাজিকরের হাতে পুতুল, দেওয়ানের হাতে জমীদার মহাশয়, আমলার হাতে গবচন্দ্র সাহেব, স্ত্রীর হাতে নির্ব্বোধ স্বামী, ইঁহারা করণ কারক। কর্ত্তারা যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করেন, ইঁহারা তাহার সহায়তা করেন। কলুর বলদ করণ কারক, তেল কাকে বলে তা চক্ষে দেখিতে পায় না, অথচ দিবা রাত্র ঘানি টানে। আফিসের কেরাণী এবং আদালতের মোহরের করণ কারক; কি লেখে তা বুঝেনা, অথবা বুঝিতে চায়না, কি বুঝিবার অবসর পায়না, অথচ সকল সময়েই লেখে। দলপতির হাতে ভক্তিডোরে বান্ধা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভক্তেরা করণ কারক, তাহাদিগের উদরে প্রকৃত কর্ত্তা যে দুই চারিটি বুলি ফুৎকার সহ পূরিয়া দেন, তাহারা তাহাই সকল স্থানে সতত বলিয়া বেড়ায়, এবং বলিয়া বলিয়া বালক ভুলাইয়া দলনাথের দলপুষ্টি করে। চাটুপটু ব্যক্তিরা, চাটুবাক্যে মনোমোহন করিয়া, যাহার দ্বারা স্বকার্য্যসাধন করিয়া লয়, সে করণ কারক; স্তুতিবাদের শ্রুতিসুখাবহ সুমধুরধ্বনিতে হৃদয় বিমোহিত হইলে, লোকে অতি সহজেই কর্তৃত্বে বঞ্চিত হইয়া করণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাকরণ অনুসারে করণ

কারক আরও অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদিগের সকলের নাম সংকলন না করিয়া, এস্থলে দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল।

অধিকরণ।

আধারোঽধিকরণম্।

ক্রিয়ার যে আধার, তাহাকে অধিকরণ কারক বলে।

অধিকরণ কারক শয়ন মন্দিরের খট্টার ন্যায় কোন একস্থলে পড়িয়া থাকেন, কর্ত্তা তাঁহার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া লোককে নিমন্ত্রণ খাওয়ান। অনুষ্ঠিত কার্য্যের গুণ ও যশ টুকু কর্ত্তার, দোষ ও অপযশখানি অধিকরণের। ইংরেজিতে অনুবাদ করিতে হইলে, অধিকরণ কারককে কোন কোন অর্থে Scapegoat বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়, কারণ সকলেই সকল কর্ম্মের মন্দ ফল অধিকরণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া থাকেন।

যে স্থলে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকেও অধিকরণ বলে, যথা গৃহে উপবেশন করিয়াছে, এই বাক্যে গৃহ অধিকরণ কারক। এ দেশের পুরুষেরা পূর্ব্বকালে অরণ্যে তপশ্চরণ করিতেন, রণক্ষেত্রে সম্মুখযুদ্ধে বিক্রম দেখাইতেন, এবং অন্তঃপুরে পুরবাসিনীদিগের সন্নিধানে বিনীতভাবে অবস্থিত থাকিতেন। তখন অরণ্য, রণক্ষেত্র, এবং অন্তঃপুর যথাক্রমে তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যা, বিক্রমপ্রকাশ এবং বিনয়প্রদর্শনরূপ ক্রিয়ার অধিকরণ ছিল। তাঁহারা এইক্ষণ বহুলোকাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ সভাস্থলে তপস্যা করেন, বিক্রম প্রকাশ অর্থাৎ জাকপাক জাহির করিতে হইলে, অবগুণ্ঠনাবৃতা অন্তঃপুরসুন্দরীদিগের সম্মুখীন হন, আর পদাঘাত সহিয়াও পরাক্রান্ত শত্রুর নিকট বিনয় ও নম্রতা দেখান। সুতরাং সভাস্থল, অন্দরমহল, এবং শত্রুসান্নিধ্যই ইদানীং বিপরীতরীতিক্রমে তাঁহাদিগের প্রাগুক্ত ক্রিয়াত্রয়ের অধিকরণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এইরূপ যে ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বতন টীকাকারেরা বুদ্ধির অল্পতাহেতু অনুমান করিতে পারেন নাই।

কর্ম্ম।

কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।

কর্ত্তা যেটীকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাকে কর্ম্মকারক বলে।

এই অর্থানুসারে ছাগ মেষ প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রিয় বস্তুকে কর্ম্মকারক বলা যাইতে পারে। সুতরাং, যাঁহারা পুরুষকার পরিহার করিয়া ছাগ মেষের মত জীবন যাপন করেন, তাঁহারাও কর্ম্ম কারক। কর্ম্মকারকের আর একটী অপেক্ষাকৃত সরল সংজ্ঞা আছে, তাহা এই —

ক্রিয়য়াক্রান্তং কর্ম্ম।

কর্ত্তার ক্রিয়া দ্বারা যে আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ কর্ত্তার ক্রিয়া যাহার গায়ে যাইয়া ঠেকে, তাহাকে কর্ম্ম কারক বলে।

ইংরেজেরা বিলাতে ক্রিয়া করেন। সেই ক্রিয়া, সাগর পার হইয়া, পাহাড় ভেদ করিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া ঠেকে, অতএব ভারতবর্ষবাসীরা এই সম্বন্ধে কর্ম্ম কারক। গোসাঞি প্রভু আসরে নামিয়া, বাহু নাড়িয়া বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করেন। শ্রোতৃবর্গ অশ্রুধারায় আকুল হইয়া একে অন্যের অঙ্গে গড়াইয়া পড়ে। কোন বক্তা, সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া, গগণভেদি তার স্বরে দুটা কথা ছাড়িয়া দেন; আর অজাতশ্মশ্রু বালকবৃন্দ প্রমত্তবৎ নাচিয়া উঠে। কেহ বা বিকল্পিত কপিবরের ন্যায়, সভ্যতা শিক্ষার অভিলাষে দু চারি দিন দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া দেশে আসিয়া কি দুই একটা চিজ প্রদর্শন করেন, এবং সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়। ইহারা সকলেই কর্ম্ম কারক; কারণ ইহারা অন্যদীয় ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

যাহারা বুদ্ধি স্বত্বেও পরের বুদ্ধিতে চলে, চক্ষু স্বত্বেও পরের চক্ষে দেখে, অন্যে খাওয়াইলে খায়, আপনি কখনও আহারের অন্বেষণ করে না,—অন্যে উঠাইলে উঠে, আপনি উঠিবার জন্য যত্নপর হয় না; চরণে আঘাত কর, তাহা সহিয়া লইয়া, সেই চরণই লেহন করে, তাহাদিগকেও কর্ম্মকারক বলি। বাঙ্গালী সর্ব্বত্রই কর্ম্মকারক, গৌরাঙ্গদিগের নিকট বিশেষতঃ।

কর্ত্তা।

স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।

যে আপনার ক্রিয়াতে কখনও পরতন্ত্রতা স্বীকার করে না, আপনিই স্বকার্য্যসাধনে সমর্থ হয়, তাহাকে কর্ত্তৃকারক বলে। অথবা—

ক্রিয়াসম্পাদকঃ কর্ত্তা।

যিনি আলস্যকীট কিংবা কাষ্ঠলোষ্ট্রের ন্যায় কোথাও পড়িয়া থাকেন না, অথবা বাতোত্থিত তৃণের ন্যায় পরকীয় শক্তিতে ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়েন না, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জগতে স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাকে কর্ত্তা বলি।

যেমন খগসমাজে গরুড়, আর পশুসমাজে সিংহ, সেইরূপ কারক মধ্যে, অথবা মনুষ সমাজে কর্ত্তা। যাঁহারা কর্ত্তৃকারক বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাদিগকে দেখিলেই চেনা যায়। তাঁহাদিগের ললাট প্রশস্ত, মস্তক উন্নত, মর্ম্মস্পর্শিনী, বুদ্ধি গভীর, আত্মা উদ্যমপূর্ণ, আকাঙ্ক্ষা অতীব উচ্চ, বাক্য অর্থযুক্ত এবং গতি স্বাধীনতাব্যঞ্জক। কি তাঁহাদিগের দেহ, কি তাঁহাদিগের মন, কিছুই পরকীয় লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত নহে। তাঁহাদিগের আলস্য নাই, ঔ-

দাস্য নাই, আহার নিদ্রায় দৃক্‌পাত নাই, এবং কালাকালভেদ নাই। তাঁহারা সকল সময়েই কার্য্যলিপ্ত। কর্ত্তা নিকটস্থ হইলে কর্ম্মকরণাদি অন্যান্য সমস্ত কারক আপনা হইতেই পদানত হইয়া পড়ে। কর্ত্তাদিগের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু ভাল মন্দ উভয়ই অবিসংবাদিতরূপে কর্ত্তা। যথা মেরাট ও ওয়াশিংটন, হেমডন, ও রবিস্পিয়র ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট।

অবস্থাবশাৎ কারকাদি।

যে স্থলে যে কারক বিহিত হইল, অবস্থাবশতঃ কোন কোন সময়ে তাহার অন্যথাভাব ঘটিয়া থাকে। যথা, কেহ পুরুষসমাজে কর্ম্মকারক, নারীসমাজে কর্ত্তৃকারক, আর সুচতুর বুদ্ধিমানের হস্তে করণ কারক। বাঙ্গালি জমিদার ও হুজুরদিগের মধ্যে অনেকেই অধীনবর্গের নিকট কর্ত্তৃকারক, তখন গর্জ্জনে বজ্রধ্বনিও নীচে পড়ে, সাহেবদিগের নিকট কর্ম্মকারক, কারণ সর্ব্বদাই শ্বেতাঙ্গপদারবিন্দে প্রণত দেখি।

বক্তব্য—যাহারা পরের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাদিগকে প্রযোজ্য কর্ত্তা বলে। পূর্ব্বতন ভারতবাসীরা স্বকীয় ক্ষমতায় স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতেন, অতএব তাঁহারা প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন। ইদানীন্তন ভারতবাসীরা পরের ক্ষমতায় পরকীয় প্রণোদনে কর্ত্তৃত্ব করেন, অতএব তাঁহারা প্রযোজ্য কর্ত্তা। পরে চালায় বলিয়া তাঁহারা রেলের গাড়িতে চলেন, পরে দেখায় বলিয়া তাঁহারা গ্যাসের আলো দেখেন, ইত্যাদি।

উপসংহার—বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র মানবজীবনরূপ অবিনাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য এই কারক-প্রকরণ পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি পরিশেষ উপদেশ এই, তাঁহারা যেন সকলেই কর্ত্তৃকারকের পদলাভ করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নপর হন। পরের হাতে করণ কারক হইয়া জীবন যাপন করা, অথবা কাহারও ক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদাই কর্ম্মকারকের হীন দশায় পড়িয়া থাকা, বড়ই বিড়ম্বনা।

ইতি শ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

—০০*০০—

রিশিলু

-০০*০০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রিশিলু, বোনাপার্টি ও বিস্‌মার্ক প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী ও সতত-জীবিত রাজপুরুষদিগের জীবন-বৃত্ত কখনই সংক্ষেপে সংকলিত হইতে পারেনা। ইহাঁরা ইতিহাসের স্রষ্টা, অথবা ইহাঁরাই ইতিহাস। ইহাঁরা যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁদিগের জীবনবৃত্ত এবং সেই দেশের সেই সময়ের ইতিবৃত্ত একীভূত হইয়াছে। বোনাপার্টির উদয় হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত ফ্রান্সে ও বোনাপার্টিতে কিছুই প্রভেদ ছিলনা। তাঁহার নিজ শুভাশুভঘটিত কোন কথার প্রসঙ্গ হইলে,তিনি রাজপুরুষসমাজে 'আমিই ফ্রান্স' এই বলিয়া অহংকার করিতেন; এবং তদীয় জীবনচরিত পাঠ করিলে, সত্য সত্যই ফ্রান্সের তদানীন্তন ইতিহাস পাঠ করা হয়। রিশিলুর সম্বন্ধেও এইরূপ। রিশিলু ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের মন্ত্রভবনে প্রবেশ করেন, এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। এইকাল মধ্যে ফ্রান্সে মঙ্গল ও অমঙ্গল যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ফ্রান্সের ব্যবস্থামন্দির হইতে যে কোন বিধি প্রচারিত হইয়াছে, ফ্রান্সের রাজনীতি, সমাজসংস্থান, শিক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতিসম্বন্ধে ভাল কি মন্দ যে কোন ফল ফলিয়াছে; সমস্তই রিশিলুর নামাঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা এই নিমিত্ত রিশিলুর রাজকীয় জীবনের সবিস্তর বিবরণ সংকলন না করিয়া, তদীয় অনন্য সাধারণ চরিত্র ঘটিত যে সকল কথা বিশেষ আলোচ্য তাহাই সংক্ষেপে সমালোচনা করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নবীন রাজা ত্রয়োদশ লুই যে সকল অমাত্যদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাঁহারা সকলেই রিশিলুর বিদ্বেষীছিলেন। রিশিলুর সহিত নিজনিজ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন রূপ শত্রুতার কারণ ছিলনা; বরং রিশিলুর আশ্রয় পাইলেই তাঁহাদিগের সকলপ্রকার উদ্বেগের শান্তি হইবে, এইরূপ ভরসা ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা কেহই রিশিলুর সান্নিধ্য সহ্যকরিতে পারিতেন না। অন্তঃসারহীন কাপুরুষেরা যে কারণে স্বভাবতঃই প্রধান পুরুষদিগকে ঘৃণা করে, তাঁহারাও রিশিলুকে সেই কারণেই ঘৃণা করিতেন। তাঁহারা বৈভবে ও পদমর্য্যাদায় সর্ব্বত্র মান্য থাকিয়াও, একটী সামান্য লোকের নিকট আপনাদিগের মান রক্ষা করিতে পারিতেন না, এবং রাজসংসারে বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও, কোন বুদ্ধির

কথা উপস্থিত হইলে এই নবাগত অপরিচিত ব্যক্তির সন্নিধানে মুখব্যাদান করিতে সাহস পাইতেন না. এই দুঃখ তাঁহাদিগকে রোমে রোমে দগ্ধ করিত। যদি তাঁহাদিগের মন্ত্রণা ফলবতী হইত, তাহা হইলে রিশিলুকে পুনরায় লুসন নগরে প্রতিগমন করিতে হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজমাতা মেরী স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও, রিশিলুর অসামান্য গুণ গৌরব বুঝিতে পাইলেন, এবং যাহাতে রিশিলুর হস্তে রাজ্যযন্ত্রপরিচালনের ভার সমর্পিত হয়, তদর্থ নানারূপ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ রিশিলুকে সহায় না করিলে মেরী ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতেন ; এবং কতিপয় দুর্দান্তস্বভাব ভূস্বামী ও দুর্গাধিপতি তাঁহাকে যাদৃশ কূটচক্রে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কুশলে কুশেলে বহির্গত হওয়াই তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিত। তিনি রিশিলুর দীন দশা দর্শনে দয়ায় বিগলিত হইয়াছিলেন, এমন নহে। তিনিও দয়াশীলা ছিলেন না, এবং রিশিলুও কোন দিন কাহারও দ্বারে দয়ার ভিখারী হন নাই। সত্য কথা বলিতে হইলে, রিশিলুর বুদ্ধি বিনা তাঁহার উদ্ধারের আর পথ ছিলনা ; তাই তিনি অনিচ্ছা সত্বেও রিশিলুরই আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

রিশিলু, মেরীর অনুগ্রহভাজন হইয়াও, পাঁচ ছয় বৎসর কাল এক প্রকার রাজপুরীর বহিরঙ্গণে বিচরণ করেন। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে রীতিমত মন্ত্রভবনে আহ্বান করা হয়। কিন্তু রাজা ও রাজমন্ত্রী সকলেরই বুদ্ধি বড় দৌড়দার ছিল। তাঁহারা বন্দোবস্ত করিলেন যে, রিশিলু মন্ত্রভবনে উপবেশন করিতে পারিবেন, মন্ত্রণা দিতেও অধিকারী থাকিবেন ; কেবল আপনাকে মন্ত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। রিশিলু এই কথাতেই সম্মত হইলেন। তিনি আপনাকে মন্ত্রী জ্ঞান করিয়া রাজ্যঘটিত কোন কথায় স্বনামে আজ্ঞা প্রচার করিতে পারিবেন কিনা, ছয় মাস যাইতে না যাইতেই তাহা মীমাংসিত হইল। কারণ, তখন সকলেই দেখিল যে, তাহারা সিংহকে সাধ করিয়া শৃগাল সভায় আসন দান করিয়াছে।

সাধারণ লোকে কথাপ্রসঙ্গে মনুষ্যের বুদ্ধির প্রশংসা করে। কিন্তু সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধি কীদৃশ ভয়ানক অস্ত্র,—কিরূপ অমূল্য সম্পদ, তাহা সম্যক্ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শুধু বুদ্ধি বলেই সকলকে স্বকীয় পদতলে আনয়ন করিতে পারেন কিনা, রিশিলুর চিরস্মরণীয় জীবন তাহার এক প্রধান উদাহরণ। রিশিলু যখন পারীসে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার কিছুই সংস্থান ছিলনা ; প্রতিদিনের অপরিহার্য্য ব্যয় নির্ব্বাহের

অন্যও তৎকালে তাঁহাকে নিতান্ত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। তিনি যখন রাজসংসারে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন, তখন রাজা অবধি সামান্য মন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধ চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন। যখন রাজকীয় মন্ত্রিসভায় আহূত হইলেন, তখনও সকলেই তাঁহার হাত, পা, মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিল। কিন্তু তিনি একে একে সমুদয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, নিজ বুদ্ধি-প্রভাবেই সকলের মস্তকের উপর নিজ সিংহাসন সংস্থাপন করিলেন।

ক্রমশঃ।

—oo✻oo—

তাজমহল।

একি সেই চিরশ্রুত ভারতকৌস্তুভ
তাজগৃহ, সাজিহান যবন গৌরব।
দম্পতি প্রণয় পুষ্প, নয়ন দুর্লভ
পৃথিবী ব্যাপিয়া যার প্রশংসাসৌরভ॥

—

সেকি এই? মনোহর সুশুভ্র গঠন
তুষার ফলকনিভ মর্ম্মর রচিত।
জড়িত উপলে গাত্র বিবিধবরণ,
মোগল সুন্দরী যেন রতনে খচিত॥

—

অহ! কি অমল শান্ত মধুর দর্শন,
কার্পাসকোমল কান্তি কঠোর মর্ম্মরে।
তুলিতে আঁকিয়া যেন তুলেছে গড়ন
ধন্যরে কল্পনা, যে এ ধরিল উদরে॥

—

যতনে মাপিয়া স্বর্ণ, গড়ে স্বর্ণকার
তবু হয় অলঙ্কারে ভাগ অসমান।
কি তুলে স্থপতি তৌলি শরীর ইহার
গড়িল নির্ভুল হয়ে অঙ্গভাগমান॥

—

মথি কতকাল বসি মানস-উদ্যানে
সৌন্দর্য্য কুসুমসারে শিল্পকারগণ।
গাঁথিল ইহার দেহ, দেহপ্রাণপণে
রূপভরে ভুলাইতে ভবজনমন॥

—

কঙ্কাল কপাল স্থান ভীষণ শ্মশানে
এগৃহ কুসুম তবু দেখায় কি ভাল?
ফুটিতো যদি এ কোন বিলাস উদ্যানে
শচিপতি কেলি গৃহ লাজে হতো কাল॥

—

অনতি উন্নত মঞ্চ সুন্দর বিস্তৃত
চতুষ্কোণ, গাঁথা শ্বেত রক্তিম শিলায়।
স্থাপিত তাহাতে তাজ সুচারুনির্ম্মিত
অবনীর গৃহশিরে শিরতাজ প্রায়॥

—

চারি কোণে চারিস্তম্ভ, সুদীর্ঘ সুসম
শরীর রক্ষক বীর পুরুষের মত।
দণ্ডায়িত কাল সঙ্গে করি পরাক্রম
তবু শুক্লে নভ নীল করিয়া লাঞ্ছিত॥

—

সুনীল যমুনা নীল মেখলা হইয়া
বহিছে রজতনিভ গৃহ কটি তটে।
উপরে শুভ্রাভ্র যেন দেখায় ভাসিয়া
ক্ষির-নিধি-বিম্ব নীল নভ-তল-পটে ॥

সম্মুখে উদ্যান যেন মরকত বন
তরু শ্রেণী দুই পাশে সখিশ্রেণীপ্রায়
শোভে মাঝে জলযন্ত্রে শীত প্রস্রবণ
মোগল মহিষী যোগ্য ভোগ্য সমুদায় ॥

দেখায়ে বিরাগ, মরি ! বিভূতি বিভবে
কোরাণ অক্ষর মালা পড়ি গলদেশে ।
মাঝে স্পন্দহীন গৃহ বসিয়া নীরবে
যেন কোন বিলাসিনী তপস্বিনী বেশে ॥

নির্মেঘ শরদে কিম্বা মধুসুধাকরে
যেকালে এ তনুকান্তি ঝলসে বিজনে ।
কি ছার ! মনুজ মন, দেব মন হরে
নিরখিলে সেকালে এ রূপের কাননে ॥

একে শুক্ল তনু রাজ্যে শুক্ল শশিকর ।
তায় ঋতুকুলে শুক্ল উদ্যানের হাস ।
যাচায়ে ফিরিঙ্গীবালা দেহ শুক্লতর
চারিদিকে রচে সুধু শুক্লেরি আবাস ॥

ইতিহাসে পড়ি যুবা কৌতুহলানলে
জ্বলিয়া যে কালে ধায় দূরদেশ হতে ।
আসিয়া দেখিয়া ভাসে তৃপ্তি সুখ জলে
সার্থক গণনা করে পথ ব্যয় শতে ॥

শিল্প দেখি কেহ প্রশংসয়ে শিল্পিগণে
লুপ্ত যারা দূরগত কালের কবলে ।
কেহ বা অর্থের ব্যয় গণি মনে মনে
বিস্ময় বিস্তার করে নয়ন যুগলে ॥

আসি কত ইয়ুরোপী বিজ্ঞান কুশল
আঁকি তোলে যন্ত্রবলে গৃহবর তনু ।
নানাভাবে স্থিতিভেদে আঁকে অবিকল
আকাশে সহায় করি চিত্রকর ভানু ॥

তুলি ছবি অবশেষে নেয় নিজ দেশে
পড়ায় প্রাসাদ কণ্ঠে আভরণ করি ।
বসি বন্ধু পরিজনে দেখে অনিমেষে
প্রশংসে ভারত ভূক্ত শিল্পকারিকরি ॥

গড়ি ক্ষুদ্র অনুরূপ অনুকারগণ
বেচে বিদেশীর কাছে স্বর্ণমুদ্রা পণে ।
নিয়ে কত জন সেই রূপানুকরণ
রাখে গৃহে শোভাহেতু পরম যতনে ॥

আসি কত কত রাজা দেশান্তর হতে
জ্বালিয়া বিবিধরঙ্গে আলোকের মালা ।
নিরখে রূপের ছটা ঘটার সহিতে
দেখাইয়া লোকে লোল চঞ্চলার খেলা ॥

সংসার সন্তপ্ত কত নগর নিবাসী
আসে নিত্য জুড়াইতে এ শান্তি ভবনে ।
দেখিয়া ইহার ছবি শোকতাপরাশি
পাসরে অমনি যেন মায়া মন্ত্র গুণে ॥

ইহার মধুরাকৃতি শান্তিরসাশ্রয়ে
সিঞ্চয়ে অপূর্ব্ব, চিত্তে শান্তনা সলিল।
আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা ভোগসুখাশয়ে
দেখি এর দশা হয় অমনি শিথিল॥

—

কোন দিন এই স্থানে ইহার জনকে
প্রণমিত লোকরাজ চাটিত ভূতল।
কিবা না সম্ভবে দেখ এমন জনকে
তার মুখ সুখে আজি চাটে ধরাতল॥

—

এই রে গৌরব, আশা, এ গৃহ উদ্যানে
এজন্য সংসারে চির অস্ত্রের বিপ্লব।
সোদর শোণিত বর্ষে এতৃষ্ণা নির্ব্বাণে
এ ফল আশায় হয় নৃমুণ্ডে আহব॥

—

গৃহবর! যদি এত আকাঙ্ক্ষা বিপ্লবে
রহিয়াছ অতিক্রমি আজিও জীবিত।
কোনদিন কোন লোক এমন আসিবে
পাইবেনা খুজি তুমি কোথাছিলে স্থিত।

...

হয়তো এমন হবে, এদেহ পঞ্জরে
রচিবে আবার কেহ আকাঙ্ক্ষা বিমান
প্রবৃত্তির এই খেলা সংসার চত্বরে
শ্মশানে উদ্যান গড়ে উদ্যানে শ্মশান।'

... (প্রবাসী

—০০*০০—

লোকারণ্য।

মনের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে কাহারও সহিত কাহারও একতা নাই। কেহ সাগরের তরঙ্গবিক্ষোভিত সুনীল বক্ষে ফেণায়িত অট্টহাস দর্শনে পুলকিত হয়; কাহারও হৃদয়, ফুল, ফল, লতা, পাতা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সুকুমার সৌন্দর্য্যের জন্যই সতত লালায়িত থাকে। আমি এই উভয়বিধ শোভাই সমান আদরের সহিত নয়ন ভরিয়া পান করিয়া থাকি; কিন্তু একত্র বহুসহস্রলোকের সমাবেশ দেখিলে, আমার যাদৃশ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বোধ হয়, জড়প্রকৃতির কোন পদার্থই আমায় সে আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। আমি বিলাসীর প্রমোদ কাননে পরিভ্রমণ করিয়াছি, নদ, নদী, সরোবর, বন, উপবন ও পর্ব্বতের নৈসর্গিক কান্তি অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়াছি, পূর্ণিমার প্রফুল্ল চন্দ্র তরুর পত্রে পত্রে, মেঘের পটলে পটলে কিরূপ মনোহর ক্রীড়া করে, তাহাও দর্শন করিয়াছি, ইহার কিছুই আমার নিকট লোকারণ্যের সেই বিস্ময়জনক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই।

জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রাণ নাই, উহা নিস্তেজ ও নির্জীব; লোকারণ্যের সৌন্দর্য্য প্রাণ বিশিষ্ট, উহা সতেজ ও সজীব। সংসারে লোকারণ্যের ন্যায় অদ্ভুত দৃশ্য কি আছে, জানি না। যাহার চিত্ত লোকারণ্য দেখিলে ও নাচিয়া না উঠে, সে মনুষ্যসমাজের কেহই নহে, এবং মানবজাতির সুখ দুঃখ ও হর্ষ বিষা

দের সহিত তাহার কখনও সহানুভূতি থাকিতে পারেনা।

ত্রিতন্ত্রী, এস্রার, বীণা, বেণু, মন্দিরা ও মৃদঙ্গপ্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রের ধ্বনি একীভূত হইয়া নিঃসৃত হইলে, শ্রোতৃবর্গ যেরূপ অনুপম সুখানুভব করেন; ভাবুকের মন, লোকারণ্যের সমবেত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর সুখ অনুভব করে। কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ দূর হইতে বন্ধুজনকে তারস্বরে আহ্বান করে, কাহারও কণ্ঠ হইতে ক্রোধের শ্রুতিকর্কশ কম্পিত স্বর বহির্গত হয়, কেহ বা পার্শ্বস্থিত প্রণয়িজনের চিরপিপাসু কর্ণে মৃদু মৃদু মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে; ঐ সমুদয় ধ্বনি, একস্রোতের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া, মানবজীবনের জয়ধ্বনিরূপে গগণাভিমুখে উত্থিত হয়; এবং ভাবুক ব্যক্তি, শ্রবণ করিতে করিতে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ঐ স্রোতেই আপনার হৃদয় ঢালিয়া দেয়। সে আছে কি নাই, তাহাও তখন তাহার মনে থাকে না।

তরু লতার অরণ্য নয়নেরই বিনোদন করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে হৃদয়ের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হয় না। লোকারণ্য নয়নের প্রীতিকর, এবং হৃদয়ের ও উদ্দীপক। যে অসংখ্য লোক একত্র মিলিত হইয়া ঐ রূপ অপূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই এক একখানি কাব্য, অথবা এক একখানি ইতিহাস। প্রতিজনের মানসপটে কতই বা সুখের কথা এবং কতই বা দুঃখের কথা লিখিত রহিয়াছে, প্রতিজনের মস্তকের উপর দিয়া বিঘ্নবিপদের ঝঞ্ঝাবায়ু কতভাবে ও কতবার প্রবাহিত হইয়াছে, সংসারের প্রতিকূলস্রোতে প্রতিজনই কত বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে, মন লৌকিক জগতের কত ঊর্দ্ধে উত্থান করে, তাহা কখনই বাক্যে নির্ব্বচন করা যায় না। লোকারণ্যরূপ বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া, কবি ও দার্শনিক উভয়েই সমান মুগ্ধ হন, কল্পনা ও চিন্তা উভয়ই তখন যুগপৎ জাগরিত হইয়া সমানভাবে ক্রীড়া করে।

মনুষ্যের আলস্য, ঔদাস্য এবং অকর্ম্মণ্য জীবন অবলোকন করিলে, মানবজাতি যে জীবিত আছে, এবিষয়েই সংশয় হয়, এবং সংশয়ের সঙ্গে এক ভয়ানক নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু যখন দৈবাৎ কোন স্থলে হলহলাময় লোকধ্বনি শ্রবণ করি, এবং লোকারণ্যের ভৈরবছবি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করি, তখন সেই সংশয় এবং সেই নৈরাশ্য আপনা হইতেই অপনীত হইয়া যায়। বহু সহস্র লোক কেন প্রমত্তভাবে একত্র হয়, কেন বহুলোকের হৃদয় যন্ত্র একভাবে একসঙ্গে বাজিয়া উঠে, ইত্যাদি চিন্তাসূত্র অবলম্বন করিয়া লোক সংগ্রহের

মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও,একবারে মানব-প্রকৃতির মূল প্রস্রবণের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে, এবং যাহা কখনও জানিতে পাও নাই, তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া, আশায় ও আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করিবে।

বুদ্ধি মনুষ্যের প্রকৃত জীবন নহে,জীবনের পথপ্রদর্শক অথবা আলোকবর্ত্তিকা। মনুষ্যের প্রকৃত জীবন হৃদয়। হৃদয়ের প্রবাহ বন্ধ হইলে, অনুরাগ, বিরাগ, সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, জাগরণ সকলই স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া উঠে। মনুষ্য জাতির সেই হৃদয় আছে, না অদর্শন হইয়াছে, তাহার প্রধান পরীক্ষাস্থান লোকারণ্য। লোকারণ্যে, কোথাও ভক্তির স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও দেশানুরাগ, যুগান্তের মোহ হইতে সহসা উত্থিত হইয়া, ঝটিকাবায়ুর ভীমস্বরে গর্জ্জন করিতেছে, কোথাও বহুদিনের অপমান, ক্লেশ, ও দুঃখ যন্ত্রণা, অকস্মাৎ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া, প্রলয়পয়োধির উচ্ছ্বাসের ন্যায়, সংসার ডুবাইয়া দিতেছে, এবং পুরাতন ও নূতন, ভাল ও মন্দ,যাহা কিছু সম্মুখে পড়িতেছে, সমুদয় ভাসাইয়া নিতেছে।

পৃথিবীর কতকগুলি জাতি মৃত, আর কতকগুলি জীবিত। মৃতজাতীয় মনুষ্য সকলবিষয়েই নির্লিপ্ত,তাহারা ভোগরত হইয়াও যোগী, কারণ কিছুতেই আসক্ত নহে; গৃহী হইয়াও বানপ্রস্থ, এবং বিলাসী হইয়াও উদাসীন। তাহাদিগের প্রধান লক্ষণ এই, তাহারা আপন বই বুঝে না, স্ত্রীপুত্র বই আর চেনেনা, এবং বর্ত্তমান ক্ষণের বর্ত্তমান সুখ বিনা আর কিছুই চিত্তে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের হৃদয় তড়াগের বদ্ধজলের ন্যায়; উহাতে চাঞ্চল্য, প্রবাহ ও তরঙ্গ, কিছুই নাই; এবং আপনার ও বর্ত্তমান ক্ষণের সহিত যে বস্তুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহা তাহাদিগের নিকট সর্ব্বথা অবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। তাদৃশ লোকেরা লোকারণ্যের মহিমা কোন প্রকারেই বুঝিতে পায়না, এবং লোকসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সাধারণের অদৃষ্টের সহিত আপনাদিগের অদৃষ্ট মিশ্রিত করিতে, সাধারণের একাঙ্গ হইয়া সংসারের গতি পরিবর্ত্তের কারণ হইতে, কখনই ইচ্ছুক হয় না। যাহা আছে, তাহা ক্রোড়ে লইয়া,খট্টার তলে, কোন এক কোণে, মাথা লুকাইয়া প্রাণে প্রাণে কুশলে থাকিতে পারিলেই, তাহাদিগের সকল তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়। যে জাতি জীবিত রহিয়াছে, যাহাদিগের হৃদয়ের স্রোত অদ্যাপি তর তর ধারে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগের লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা প্রমত্ত, সুতরাং অতিসহজেই উত্তেজিত হয়। তাহারা জীবন্ত বারুদ-গৃহে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র পতিত হইলেই, ধগ্ ধগ্

করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাহারা হাসিতে জানে, কান্দিতে জানে, লোককে প্রশংসা করিতে জানে, লোককে নিন্দা করিতে জানে, এবং কোন্ সূত্রে গ্রন্থন করিলে সকলের হৃদয় একটি স্তবকের ন্যায় গ্রথিত হইতে পারে, তাহাও বিলক্ষণরূপে জানে। মৃতজাতীয়দিগের মধ্যে কখনও লোকারণ্য দেখিতে পাওয়া যায়না; জীবিতজাতীয় মনুষ্যদিগের বাসস্থলই লোকারণ্যের যথার্থ স্থান।

ফঁরাশিশ দেশ লোকারণ্যের এক প্রধান প্রদর্শনক্ষেত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রণ্ডনামক সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবের কাল হইতে, অদ্য পর্য্যন্ত, ফ্রান্সে নিত্যই নূতন লোকারণ্য লোকের নয়নগোচর হইতেছে। ইহার অর্থ এই, ফঁরাশীরা বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত হইয়াছে, কখনও ভূতলে পড়িয়াছে, কখনও উপরে উঠিয়াছে, কখনও বা যাই যাই হইয়াছে, কিন্তু একবারে মরিয়া যায় নাই। তাহাদিগের লোকারণ্য অভিমানিনী এনের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে, ষোড়শ লুইকে শান্তির শয্যা হইতে চমকিত করিয়া উঠাইয়াছে, এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে বার্ক প্রভৃতি প্রশান্ত চিত্ত, সুস্থির, সুগভীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও পাগল বানাইয়া তুলিয়াছে। ইহা কেন? না ফ্রান্স জীবিত রাজ্য।

ইংলণ্ডে, প্রজাপ্রতিনিধিনির্ব্বাচন অথবা কোন রাজকীয় বিধির পরিবর্ত্তনের সময়ে, কিরূপ লোকভয়ঙ্কর তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা সকলেরই অবগতির বিষয়। তখন পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সকলেই দেশের এক প্রান্ত অবধি আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে। বোধ হয় যেন সমস্ত দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। এক এক স্থলে পঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক লোক মিলিত হইয়া চীৎকার করে, আর সেই চীৎকারে সমুদায় ইয়ুরোপ কাঁপিতে থাকে। ইংলণ্ড কি সভ্য নয়? ইংলণ্ডে কি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক বর্ত্তমান নাই? কিন্তু ইংলণ্ডের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, সামাজিকতা, কিছুই উহার হৃদয়াবেগ এবং লোকারণ্য অবরোধ করিতে পারে না। কারণ, ইংলণ্ড জীবিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ যখন জীবিতছিল, তখন ভারতবাসীরা লোকারণ্য দর্শন করিয়া আহ্লাদে ঢল ঢল হইত। ইদানীং তাহা হয় না, কারণ ইদানীং ভারতবর্ষ জীবিত নাই। পৃথ্বীরাজের পর হইতেই ভারতবর্ষ প্রাণহীন হইয়া এক ভয়ানক শ্মশানের বেশ ধারণ করিয়াছে; চাহিয়াও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ভারতবর্ষে ভক্তির স্রোত অদ্যাপি প্রবহমান রহিয়াছে; এই হেতু, অদ্যাপি তীর্থস্থলে লোকারণ্যের মাহাত্ম্য কিয়দংশে অনুভূত হয়। কিন্তু অন্য কোন একভাব কি কোন এককথাতেই এদেশীয়ের এইক্ষণ আর একহৃদয়বৎ নাচিয়া উঠে না, অথবা একত্র দণ্ডায়মান হয় না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

-০০*০০-

গ্রন্থ সমালোচনা করা বড় কঠিনকর্ম্ম; যদি গ্রন্থকার জীবিত থাকেন, তবে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন কর্ম্ম অল্পই সম্ভবে। সুরূপ হউক, আর কুরূপ হউক, প্রসূতী যেমন নবকুমারের মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হন, গ্রন্থকারও সেইরূপ নিজরচিত নূতন গ্রন্থখানি অবলোকন করিয়া কেমন এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করেন। উহা, পরের নিকট অস্পৃশ্য হইলেও, তাঁহার নিকট যার পর নাই আদরের ধন। একটা সামান্য কথাকে শতবার পাঠ করিলেও,তাঁহার চিত্তের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়না। সুতরাং, মায়ের নিকট সন্তানকে কুৎসিতবলিয়া নিন্দা করিতে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই যেরূপ কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, সহৃদয় সমালোচকও, গ্রন্থকারের মুখের উপর তদীয় লেখার দোষোল্লেখ করিতে. সেইরূপ শঙ্কা প্রাপ্ত হন। পাছে. সত্যের অনুরোধে নির্ঘাত কথা কহিয়া. কাহারও অন্তরে বিষম আঘাত দেওয়া হয়, এই ভয়েই তিনি বিহ্বল থাকেন; আবার সত্যরক্ষা করিতে হইলে, সময়বিশেষে নিতান্ত অপ্রিয় কথা না বলিলেও যে চলেনা, ইহা বুঝিতে পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন। যদি গ্রন্থকারের সহিত প্রণয় কি পরিচয় থাকে, তবে ত বিপদের সীমাই নাই। যিনি অমৃতের আশায় তৃষিত নয়নে তোমার মুখপানে চাহিয়া থাকেন তাঁহার হৃদয়ে কি বলিয়া গরল ঢালিবে, বল।

বাঙ্গলা গ্রন্থের সমালোচক এবিষয়ে বিশেষ দুর্ভাগ্যশালী। কারণ, মন খুলিয়া প্রশংসা করা যায়, বাঙ্গালায এইরূপ গ্রন্থ অতি অল্পই লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রঘুনাথ, রঘুনন্দন, জগদীশ, গদাধর, জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রভৃতির সদৃশ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে এ দেশে গ্রন্থরচনায় সাহস পাইত না। আজকাল বাঙ্গালায় সকলেই গ্রন্থকার। যে লেখাপড়া করিয়াছে সেও গ্রন্থকার; যে কখনও কোন রূপ লেখাপড়া করে নাই, এক্ষণেও লেখাপড়ার কোন ধার ধারেন., কোনদিন যে লেখাপড়া করিবে এমন লক্ষণও দেখায় না,সেও গ্রন্থকার। ইহা ভারতীর কৃপা, না অকৃপা, বলিতে পারিনা। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই। শুনিয়াছি অতি প্রাচীনকালে, মুনিকুমারেরা দন্তোদ্ভেদের পুর্ব্বেই বেদপাঠ করিতেন। ইদানীং দেখিতেছি, এদেশীয় বালকদিগের মধ্যেও অনেকেই শ্মশ্রূদ্গমের পুর্ব্বে, অর্থাৎ কিছুমাত্র শিক্ষা লাভ না করিয়া, বিবাহ, সমাজসংস্কার এবং গ্রন্থরচনা এই তিন কর্ম্ম সারিয়া বসেন। সুতরাং, তাঁহারা মনের প্রতি

উপদেশ, গ্রামের কোন আচার কি অ-ন্নতাপবিষের বর্ণনাচ্ছলে যে সকল অত্যদ্ভুত কাব্য নাটকাদি প্রণয়ন করেন, অথবা সামাজিক কোন দুরবগাহ তত্ত্ব-প্রসঙ্গে সর্ব্বজ্ঞ সার্ব্বভৌমের মত যে সমুদয় বিকট প্রবন্ধ পাঠকবর্গকে উপ-হার দেন, তাহার সমালোচনা করিতে হইলে, সমালোচক কিরূপ ঘোরতর আপদে পতিত হন, তাহা সহজেই অ-নুমিত হইতে পারে। আমরা এই হেতু নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এবার যে কয়খানি গ্রন্থ আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহার একখানিও ঐরূপ নিন্দনীয় নহে। আমরা গ্রন্থ-কারের প্রিয়বন্ধুর মত অজস্রধারে প্র-শংসাবারি ঢালিতে না পারিলেও, শত্রুর মত নিন্দা করিতে বাধ্য হইব না। তবে আমরা যতটুকু প্রশংসা করিব, তাহা যদি প্রচুর বোধ না হয়, লেখক আমাদিগকে দয়া করিয়া ক্ষমা করি-বেন; এবং যদি আমরা কর্ত্তব্য বোধে নিন্দা করিয়া দুই একটি কথা বলি, তাহাও সহিয়া লইবেন।)

—

মিত্রকাব্য। প্রথমখণ্ড। প্রথমসংস্করণ। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ঢাকা ইষ্টবেঙ্গাল প্রেসে মুদ্রিত।

এখানি বালকদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। কোন কোন স্থল পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিলাম।) গ্রন্থের নাম দেখিয়া বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের কথা মনে পড়িল। কিন্তু সে মিত্র আর এ মিত্রকে এক গোত্র বলিয়া বোধ হইল না। একটি সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করি, গ্রন্থকারের নামের অগ্রে "শ্রী" নাই কেন? গ্রন্থকার কি সাধ করিয়া শ্রীহীন হইয়াছেন, না ইহা মুদ্রাযন্ত্রের প্রমাদ? আমরা ইচ্ছা করি, তিনি, দীর্ঘকাল শ্রীসম্পন্ন থাকিয়া, উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়নে যত্নপর হউন।)

কাব্যকৌমুদী।—প্রথমখণ্ড। শ্রী শ্রী-নাথচন্দ্র প্রণীত। কলিকাতা রামায়ণ যন্ত্রে মুদ্রিত।

এখানিও স্পষ্টতঃই বালকশিক্ষার জন্য বিরচিত হইয়াছে। কারণ, তাহা না হইলে গ্রন্থকার কখনও কবিতা লি-খিতে গিয়া, উপক্রমণিকায় অলঙ্কার শাস্ত্রের কতিপয় সহজবোধ্য সামান্য কথা বিনিবেশিত করিতেন না। কিন্তু এখানি বালকদিগের সুপাঠ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রচনা অধিক স্থলেই শ্রু-তিসুখাবহ, ভাবও স্থানে স্থানে সুন্দর। 'শিশুর মধুর হাস—" এই শিরোনাম যুক্ত কবিতাটী যথার্থই মধুর হইয়াছে।

গ্রন্থকার কাব্য ও রস প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অ-ধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ। তিনি আদিরসের নূতন নাম দিয়া যে নূতন লক্ষণ সন্নি-বেশ করিয়াছেন, এবং সেই উপলক্ষে টিপ্পনীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য সংবরণ ক-রিতে পারিলাম না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পবিত্র ও প্রশংসনীয়; কিন্তু মানব প্র-কৃতি ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে দৃষ্টি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। মাতার প্রতি ভক্তি এবং নায়ক নায়িকার পরস্পর আসক্তি একভাবমূ-লক ও একরসাশ্রিত, এই কথা আমরা এই প্রথম শুনিলাম। অধুনাতন লেখক-দিগের মধ্যে অনেকে আদিরসসরো-বরে পঙ্কজদলের ন্যায় টলমল করেন; অনেকে আবার আদিরসের নাম শুনি-

লেই, পিয়ুরিটানদিগের মত, দুইকর্ণে হস্তার্পণ করিয়া 'তোবা তোবা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। কিন্তু যথার্থ আদিরস যে কিরূপ নির্ম্মল পদার্থ, দুইয়ের এক পক্ষও তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করেন না। কাব্যকৌমুদীর রচয়িতা শেষোক্ত পক্ষের পংক্তিমধ্যে স্থান লাভের অভিলাষী।)

—

বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য—সটীক। শ্রীরামকুমার নন্দী প্রণীত। শ্রীরামপুর আলফ্রেডযন্ত্রে মুদ্রিত।

এই অমিত্রাক্ষর কাব্যখানি রসমাধুরীবর্জ্জিত নহে। ইহার অনেক স্থলেই ভাবুকতা এবং শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কবির বন্ধু ইহাকে কৌশলক্রমে যেস্থানে তুলিতেপ্রয়াস পাইয়াছেন, বেলুনের সঙ্গে বান্ধিয়া দিলেও ইহাকে সেস্থানে উঠান যায় না। অনুকরণ করিয়া কেহ কোন দিন বড়লোক হয় নাই; অনুকরণ করিয়া সুকবি হওয়া নিতান্তই দুষ্কর। বিলাতের কতকগুলি লেখক ডক্‌টরজন্‌সনের তরঙ্গায়িত লেখার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লেখায় সেই তরঙ্গ ত খেলিতই না; উহার স্বাভাবিক তেজস্বিতা ও ঐ অনুকরণচেষ্টাতেই বিলুপ্ত হইত। বাবু রামকুমার নন্দী কবিবর মধুসূদনের অনুকারী। তিনি, স্বকীয় মানসসিংহাসনে মাইকেল মধুসূদনের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহার ধ্যান করিয়াছেন, পূজা করিয়াছেন এবং কড়ায় ক্রান্তিতে, পদে অপদে তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু মাইকেলের দোষভাগের অনুকরণে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, যদি তদীয় গুণরাশির অনুকরণে তাহার শতভাগের একভাগ ক্ষমতাও দেখাইতে পারিতেন, তবে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দিতাম। দেখিয়া দেখিয়া কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করা যাইতে পারে, দেখিয়া দেখিয়া কখনই কল্পনা কি কবিত্বশক্তি সঞ্চয়ন করা সম্ভবপর হয় না। পত্রোত্তরকাব্যের প্রণয়ন কর্ত্তা মোচিলা না লিখিয়া মুক্তিলা লেখেন, এবং পরখিয়া না লিখিয়া পরক্ষিয়া লেখেন। এতৎসমুদয়ই পরকীয় ছন্দানুবর্ত্তনের কুৎসিত ফল। যাহাহউক, সকলদিকে দৃষ্টিকরিলে কাব্যখানির প্রশংসা করিতে হয়। আমরা টীকার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতেছি যে, উহা অনর্থক সংযোজিত হইয়াছে। না দিলেই ভালছিল। মূলগ্রন্থ পাঠকসমাজে কি পরিমাণে পঠিত ও পাঠিত হইবে, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে টীকা করিতে যত্নকরা অযশস্কর। অনুমানখণ্ডের টীকাও মূলরচনার সঙ্গে সঙ্গে সংকলিত হয় নাই।)

বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

গ্রন্থের নামই বিষয়াংশের পরিচায়ক, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। বাবু ঈশানচন্দ্র বসু যদিও মনুর কতকগুলি বিধি সংকলনমাত্র করিয়াছেন, কিন্তু সেই সংকলন কার্য্যে নিজের বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র যতই বিলোড়িত হইবে, এদেশীয়েরা সামাজিকনীতি বিষয়ে ততই নূতন আলোক লাভ করিবে। যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী, আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

মানবজীবন।

বৈজ্ঞানিকের পাঠ্য অনন্ত জড়জগৎ; কবি, দার্শনিক, চরিতাখ্যায়ক, এবং ঐতিহাসিক প্রভৃতির পাঠ্য অনন্ত মানবজীবন। মানবজীবনরূপ মহান্ গ্রন্থ সম্মুখে পড়িয়া আছে; কেহ গ্রন্থকীটের ন্যায় একবারে উহাতে লাগিয়া রহিয়াছেন; কেহ দূর হইতে উকি মারিয়া একটুকু একটুকু দেখিতেছেন; কেহ বা তাহা হইতেও দূরে, করে কল্পনারূপ দূরবীক্ষণ লইয়া, দণ্ডায়মান আছেন; কেহ কেহ আবার কিছুই না দেখিয়া, এবং কিছুই না শিখিয়া, আপনা হইতে অনভিজ্ঞের নিকট, অধ্যাপক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন।

মানবজাতি কোথায় কিরূপে উন্নত হইল, কোথায় কিরূপে অধঃপাতে গেল, অথবা মনুষ্যমনের কোন্ বৃত্তি কোন্ পথে কি ভাবে কার্য্য করে, ইত্যাদি জটিল তত্ত্ব কবির মধুলুব্ধ চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। কবি ভ্রমরসদৃশ। ভ্রমর যেমন মন্দমারুত-হিল্লোলে ঈষৎ সন্দোলিত হইয়া ফুলে ফুলে সঞ্চরণ করে, সৌন্দর্য্যসুধালিপ্সু কবিও, সেইরূপ কল্পনাসমীরে সঞ্চালিত হইয়া, মানবজীবনরূপ রমণীয় উদ্যানে যথেচ্ছ বিচরণ করেন, আর মধু সঞ্চয় করেন। ভুবনবাসী সকলে তাহা নিরবধি পান করিয়া কৃতার্থ হয়। দুঃখীর দীর্ঘনিঃশ্বাস, বিরহিণীর অশ্রুকণা, যোগীর ঊর্দ্ধনেত্র; বিয়োগীর বৈরাগ্য উদারচেতা দয়াশীলের নিঃস্বার্থ করুণা, বীরপুরুষের মর্ম্মবিদারক ভৈরবনাদ, এই সমস্ত বস্তুই মানবজীবনবিহারী সুকবির ভাণ্ডারে সকল সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার কাছে এসকল নাই, কেবল কতকগুলি শব্দ আছে, তাহাকে কবি না বলিয়া কবিকুঞ্জের দ্বারস্থ কাক বলিলেই সুসঙ্গত হয়।

মানবজীবন সম্বন্ধে কবির সহিত ডুবারুর ও সুন্দর উপমা হইতে পারে। নিপুণ ডুবারু যেরূপ রত্নলোভে রত্নাকর গর্ভে প্রবেশ করে, নিপুণ কবিও সেই

রূপ মানবজীবনরূপ সুগভীর সমুদ্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে কখনও একটি মনোহর মুক্তা, কখনও বা একটি চারুদর্শন রত্ন উপরে তুলিয়া রূপ দেখিয়া আপনি ভুলিয়া যান এবং রূপদেখাইয়া আর দশজনকে ভুলাইতে যত্নপর হন। যদি বিধিবিড়ম্বনায় মণিমুক্তার পরিবর্ত্তে কোন অস্পৃশ্য অপবিত্র বস্তু হাতে উঠে, তবে দুঃখের গীত গাইয়া গাইয়া হৃদয়কে শান্তি দেন, এবং দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করিয়া ভাবুকের দ্বারে সহানুভূতির ভিখারী হন।

দার্শনিক কঠোরচিত্ত চিকিৎসকের ন্যায়। তিনি কবির মত রূপের জন্য মরেন না, এবং মানবপ্রকৃতি সুন্দরই হউক, আর কুৎসিতই হউক তাহাতে তাঁহার কিছু আশে যায় না। মানবজীবনসম্পর্কিত যথার্থতত্ত্বসংকলন ও রুগ্ন মানবপ্রকৃতির প্রতিকারসাধনই তাঁহার কার্য্য, এবং ঐ দুই কার্য্য সফল হইলেই তিনি চরিতার্থ হইলেন। মনুষ্যের শরীরের সহিত শারীরসংস্থানবিদ্যার যে সম্বন্ধ, মনুষ্যের মনের সহিত মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ, এবং যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র তেমন নীতিবিজ্ঞান। দর্শনতত্ত্বের অনেক অবান্তর ভেদ, অনেক শাখা প্রশাখা আছে। কিন্তু উহার আদি, অন্ত, মধ্য, সমস্তেরই অবলম্ব মানবপ্রকৃতি এবং মানবজীবন।

ঐতিহাসিক মানবজীবনসম্বন্ধে অংশতঃ কবি, অংশতঃ দার্শনিক; অথচ কবি ও দার্শনিক উভয় হইতেই স্বতন্ত্র। কোন একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য কি কোন একটি বিশেষ সত্য তাঁহাকে মোহিত করিতে পারে না। কিন্তু মানবজীবনের যে সৌন্দর্য্য ও যে সত্য,স্রোতের ন্যায়,ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তিনি তাহাতেই সমধিক আকৃষ্ট হন। তিনি সমুৎসুক পরিব্রাজকের ন্যায় কোন উন্নত স্থানে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং সেখানে দাঁড়াইয়া মানবজাতির অবিরামবাহি-জীবনস্রোতের প্রবাহ ও লহরীলীলা সন্দর্শন করেন।

পৃথ্বীরাজ একদিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত কুসুমকাননে উপবেশন করিয়া ভারতবর্ষের তৎকালীন দুর্দ্দশা ভাবিতে ভাবিতে বাষ্পবারি বিমোচন করিয়াছিলেন, শুদ্ধ এই কথাটি ইতিহাসের বিষয় হইতে পারে না। ইহা কবির কথা এবং

এইরূপ বহুকথা আছে বলিয়াই, হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক চাঁদভট্টকে লোকে চাঁদকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ভারতসূর্য্য,সেই আর্য্যমহিমার কাল হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধমুখে উত্থান করিয়া, সহসা কিরূপে যবনাম্বুধিতে ডুবিয়া গেল, সেই পরাক্রান্ত আর্য্যজাতির প্রতাপস্রোতে ক্রমে ক্রমে কিরূপে ভাটা লাগিল, ইহা যিনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিবেন, তাঁহাকে ঐতিহাসিক বলিব।

তবে,কবি,দার্শনিক,অথবা ঐতিহাসিক প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণিস্থ লোক বিনা আর কেহ মানবজীবন পাঠ করেনা,কি পাঠ করিতে সমর্থ নহে, ইহা মনে করা ভ্রম। পৃথিবীতে সকলেই কিছু সেক্সপীয়র কি ভারবি, অথবা বেন্থাম কি গীবন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। বিধাতা যাহাকে চক্ষু দিয়াছেন,সেই এই গ্রন্থের দুচারি পৃষ্ঠা কি দুচারি পংক্তি পাঠ করিয়াছে,যে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, সংসারের গতি বিধি সম্বন্ধে সেই কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ লোক বলে, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ কর; দেখিবে, তাঁহারা কবি, দার্শনিক অথবা ঐতিহাসিক, ইহার কিছুই নহেন; অথচ মানবজাতির প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতি বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ঠেকিয়াছেন, তাই শিখিয়াছেন; কেহ কেহ বা দেখিয়াছেন,তাই জানিতে পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মনের কথা নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত হইলেই কাব্যের এক স্তবক কিংবা দর্শনশাস্ত্রের এক পরিচ্ছেদ সংকলিত হয়।

যাঁহারা মানবজীবন অধ্যয়ন করিয়া মানবজাতি বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা স্তাবক, আর এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা নিন্দুক। যৌবনের প্রথমোল্লাস সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই মানবজাতির স্তাবক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পরে, যৌবনস্রোতের তরঙ্গচাঞ্চল্য তিরোহিত হইলে, শরীরের উত্তপ্ত শোণিত একটুকু একটুকু করিয়া শীতল হইয়া আসিলে, বুদ্ধি কিয়ৎ পরিমানে পরিপক্বতা লাভ করিলে, সেই ভ্রম অথবা সেই সংস্কার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়; এবং তখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক-

কেহ,আবার মানবজাতির নিন্দুক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়া উঠে। এরূপও দেখা যায়, যাঁহারা এক সময়ে ঘোরতর স্তাবক ছিলেন, তাঁহারাই সময়ান্তরে ঘোরতর নিন্দুক হইয়া দাঁড়ান; অথবা যাঁহারা পূর্ব্বে মানবজীবনকে দুর্ব্বিষহ নরকভোগ বলিয়া অদৃষ্টের নিন্দা করিতেন, তাঁহারাই ফিরিয়া উহাকে স্বর্গের পুর্ব্বস্বাদ বলিয়া আহ্লাদে উছ্‌লিয়া পড়েন।

স্তাবকপক্ষ প্রেমিক; নিন্দুকপক্ষ হয় হিতাভিলাষী বন্ধু,নাহয় বিরক্ত সন্ন্যাসী। প্রেমিকের চক্ষু অমৃতাঞ্জনে বিভূষিত। উহার কাছে সকলই ভাল দেখায়, দোষরাশিও গুণরাশি রূপে প্রতিভাত হয়, এবং নিতান্ত অপ্রীতিকর দৃশ্যও শারদীয় পুর্ণিমার চল চল লাবণ্যের ন্যায় সুধাময়ী জ্যোৎস্না বিকীরণ করে। দোষদর্শী বন্ধু অথবা বিরাগীর চক্ষু স্নেহরসশূন্য। উহাতে ভালটিও অনেক সময়ে মন্দ বোধ হয়। স্তাবকেরা মনুষ্যজীবনের সকলই সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদিগের নিকট মনুষ্যের হাস্য সারল্যপূর্ণ, প্রীতি প্রচ্ছাতকুসুমবৎ পবিত্র, বন্ধুতা অমায়িক, চিত্ত কলঙ্কশূন্য এবং আচার ব্যবহার সমস্তই সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তাঁহারা মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনিতে দেবকণ্ঠ শ্রবণ করেন, এবং মনুষ্যের সমস্ত ক্রিয়া কলাপে স্বর্গীয় সৌরভ অনুভব করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হন। মানবজাতি তাঁহাদিগের নিকট নন্দনভ্রষ্ট পারিজাত। যদি কেহ দুঃসাহস করিয়া মানবজীবনের কলঙ্কনিচয় দেখাইয়া দেয়, তাঁহাকে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কলুষিতমতি বলিয়া ঠাউরাইয়া রাখেন এবং তাঁহার কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নহে, এই এক সাধারণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন।

নিন্দুকদিগের সংস্কার আবার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদিগের নিকট মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্করাশি এবং মনুষ্যের মস্তকের কেশ হইতে পদনখপর্য্যন্ত সমস্তই অপবিত্র ও অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যের আত্মা নরকের সজীব প্রতিকৃতি; হৃদয় গরলের অক্ষয় প্রস্রবণ; দৃষ্টি, হাস্য, রসনা, সমুদয়ই গরলোদ্গারী এবং মানবজাতি চিরখলতাময় ব্যালজাতির অবতার বিশেষ। তাঁহাদিগের অভিধানে ভদ্রতা, পবিত্রতা এবং সারল্য প্রভৃতি শব্দ আকাশ-

কুসুম কি শশবিষাণের ন্যায় অর্থশূন্য। স্তাবক পক্ষ যেরূপ রাজার নাম করিতে হইলে, রামচন্দ্র, এলফ্রেড, কি পিটার দি গ্রেট প্রভৃতি মহাত্মার উল্লেখ করেন; নারীকুলে জানকী, জেন, দময়ন্তী ও নাইটিংগেলকে দেখাইয়া দেন, এবং মন্ত্রণার প্রসঙ্গ হইলে বশিষ্ট, সলো, অথবা ধার্ম্মিকতার প্রসঙ্গ হইলে শাক্যসিংহ কি মিলেংথন প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ করেন; নিন্দুক পক্ষও সেইরূপ অবিচলিতভাবে নিরো; কেলিগুলা, টাইবিরিয়াস কি অষ্টম হেনরী প্রভৃতি রাজা, ফ্রান্সের কেথেরিন কি রোমের এগৃপিণা প্রভৃতি রাজমহিষী, কণিক কি মেকিয়াভেল প্রভৃতি মন্ত্রদাতা, ষষ্ঠ আলেকজেণ্ডর প্রভৃতি পোপনামধারী ধর্ম্মযাজক এবং জেফ্রী প্রভৃতি ধর্ম্মাধিকরণস্থিত বিচারপতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মানবজীবনের দুঃখাবহ পঙ্কিল প্রবাহ প্রদর্শন করেন। উভয় পক্ষে প্রতি কথাতেই এইরূপ মত ভেদ।

ইয়ুরোপীয়দিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ বাইবল গ্রন্থ মানব জীবনের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ। বাইবল যাঁহাদিগের লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের কেহই মানবজাতির গুণে প্রেমিকের ন্যায় মুগ্ধ ছিলেননা। কোরাণকে আমরা এ বিষয়ে গণনার মধ্যে আনিতে চাই না। কারণ,কোরান স্পষ্টতঃই বাইবলের অনুকৃতি এবং একজনের মস্তিষ্কসম্ভূত। ভারতবর্ষের অতিপ্রাচীনকালের সরলহৃদয় ঋষিরা মানবজীবনে বিরক্ত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না।

বেদসংহিতার যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনুষ্যের কলঙ্কের কথা অধিক নাই, সমস্তই কুসুমসমাকীর্ণ মাধবীয় উপবন, অথবা অমল কৌমুদীময় শারদীয় যামিনীর ন্যায় পবিত্র ও প্রীতিকর। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র এবং কবিতাকাননের চিরজীবী কল্পপাদপ মহাকবি বাল্মীকিকেও মানবজীবনের নিন্দুক বলিনা! বাল্মীকি মনুষ্যপ্রকৃতির যে সকল ছবি চিত্র করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া মনুষ্যের দগ্ধনয়ন চিরদিন শীতল হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাল্মীকির পর হইতে, এদেশের প্রধান ও অপ্রধান সকলের লেখাতেই মানবজীবনের প্রতি স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ঘৃণার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

এদেশের পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বর্ত্তমান কালের যে মূর্ত্তি লিখিত রহিয়াছে, যদি তাহা সত্য হয়, তবে মানব নকে প্রেতজীবন বলিলেও অসংগত হয় না। ইয়ুরোপীয় ভাবুকেরাও এবিষয়ে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একপক্ষ আনন্দে ডগমগ বুলবুলের ন্যায় নিয়তই প্রিয়গীত গান করিতেছেন ; আর এক পক্ষ, গম্ভীরস্বভাব উলুকের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে দুঃখধ্বনি উত্তোলন করিয়া, সকলের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করাইয়া দিতেছেন।

আমরা মানবজীবনে অনুরক্ত কি বিরক্ত, এবং মানবপ্রকৃতির স্তাবক কি নিন্দুক, তাহা এইক্ষণ বলিতে চাই না। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভাবুকেরা মানবজীবনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যেরূপ অবলোকন করিয়াছেন, তাহাই অদ্য সংক্ষেপে আলোচনা করা আমাদিগের অভিলাষ

কেহ কেহ বলেন, মানবজীবন এক বিশাল বাণিজ্যক্ষেত্র, এবং মনুষ্যজাতির সকলেই বণিক্। দেও আর নেও, অথবা নেও আর দেও, ইহাই এখানকার প্রধান কথা এবং সকল নীতির বীজস্থত্র। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং সামাজিকনীতি প্রভৃতি সমুদয় নীতিশাস্ত্রই বাণিজ্য শাস্ত্রের এক এক পরিচ্ছেদ মাত্র এবং পতি পত্নীতে, রাজায় প্রজায়, প্রভুভৃত্যে ভ্রাতায় ভ্রাতায় এবং সাধারণতঃ মনুষ্যে মনুষ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে কি কল্পিত হইতে পারে, সমস্তই বাণিজ্য ব্যবসায়ের সম্বন্ধ বিশেষ। যে দেয় না কি দিতে পারে না, সে এই হাটে কিছুই পায় না। এস্থলে যাহা কিছু চাও, সমস্তই মূল্য দ্বারা ক্রীত ও বিক্রীত হয়। যদি মূল্যদিতে পার, তবে সকলই মিলিবে। যদি মূল্য দিতে অসমর্থ হও, তবে তুমিও কাহারও নও, এবং কেহই তোমার নহে। মান, মর্য্যাদা, যশ, প্রেম, সমুদয়ই বিনিময় সামগ্রী বিনা বিনিময়ে ইহার কিছুই লাভ করা যায় না। যাহাকে তুমি ভালবাস, অথবা ভাল বাস বলিয়া জানাও, কিংবা যাহার সম্বন্ধে প্রকারান্তরে প্রিয়কার্য্য কর, সেই তোমাকে ভাল বাসে ; যাহাকে তুমি ভাল বাস না, কিংবা যাহার প্রয়োজন সাধনে সতত অগ্রসর হও না, তুমি যত কেন ভাল না হও সে তোমার পানে ফিরিয়াও চায় না।

যাহাকে তুমি প্রশংসা কর, সে তোমার প্রশংসা করে এবং যাহাকে তুমি নিন্দা কর, সে তোমার নিন্দা করে। স্তুতির বিনিময়ে স্তুতি, নিন্দার বিনিময়ে নিন্দা। যদি নিতান্ত নিন্দনীয় কোন ব্যক্তিকেও তুমি স্তুতি করিতে অসমর্থ হও, তুমি যার পর নাই স্তবনীয়স্বভাব হইলেও তাহার জিহ্বা হইতে তোমার স্তুতিবাদ বহির্গত হইবে না।

পৃথিবীর বন্ধুতাও এইরূপ। যে, তোমাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলে, অথবা লোকের নিকট আপনাকে তোমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলে, সম্মান কি সুখবোধ করে, সে তোমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে; এবং তুমিও যেখানে সুখ কি সম্মানের প্রত্যাশা কর, তাদৃশ স্থলেই বন্ধুতা প্রদর্শন করিয়া থাক। যেখানে কাহারও সুখসম্মানলাভের সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে কেহই বন্ধুতা দেখায় না। কুটুম্ব ও স্বজনদিগের মধ্যেও, লোকে, যাহাকে কুটুম্ব কিংবা স্বজন বলিলে লোকসমাজে উচ্চ আসন লাভ করিতে পায়, তাহাকেই উচ্চৈঃস্বরে কুটুম্ব কিংবা স্বজন বলিয়া পরিচয় দেয়; যাহাকে স্বসম্পর্কিত বলিলে লোকের নিকট মানগ্লানি, কি গৌরবহানির সম্ভাবনা থাকে, সে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইলেও তাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়। কেহ কেহ স্বকীয়, ক্ষমতাবলে নূতন সম্মান লাভ করিয়া, দীন দশাপন্ন পুরাতন পিতাকেও পিতা বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তিনবার চিন্তা করে। অবস্থার পরিবর্ত্ত ঘটিলে ঐ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুতাদি প্রিয়সম্বন্ধের দৃঢ়বন্ধন ও যে শিথিল হইয়া যায়, উল্লিখিত শ্রেণীর ভাবুকদিগের বিবেচনায় মানবজাতির এই বণিক্স্বভাবসুলভ লাভপরতাই তাহার প্রধান কারণ। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব জটাচীরধারী বনচারী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "অবস্থা পূজ্যতে রাজন্! ন শরীরী কদাচন।" ইহাঁরা আক্ষেপ করিয়া ইহাও বলেন যে, ভ্রাতা, পিতা, পতি কি পুত্র প্রভৃতি প্রিয়জনের বিয়োগ হইলে, লোকে যে হৃদয়বিদারি করুণকণ্ঠে বিলাপ করে, তাহাতেও বাণিজ্যের গন্ধ থাকে। কারণ,ঐ প্রিয়জনের অভাবনিবন্ধন নিজের কি কি বিষয় কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহাই তখন

প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হয়। আমার কি হইবে এই বলিয়াই সকলে রোদন করে; যে গেল, তাহার কি হইবে, ইহা কেহই মনে করে না।

আর এক পক্ষ বলেন, মানবজীবন এক রমণীয় রঙ্গভূমি এবং মনুষ্যমাত্রই অভিনয়নিপুণ নট। কেহ দাতা, কেহ গৃহীতা,কেহ যাজক, কেহ যজমান, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ প্রেমিক, কেহ গৃহী, কেহ সন্ন্যাসী। কোন ব্যক্তি স্বুবর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজলীলা অভিনয় করিতেছেন, কেহ বা তদীয় সন্নিধানে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনুজীবীর দুরবস্থা ও নীচজীবন প্রদর্শন করিতেছেন। অভিনয়ভূমিতে শৈলূষগণ যে রূপ মিথ্যা হাসি হাসে, মিথ্যা কান্না কান্দে, মৃগের ন্যায় ভীতিবিহ্বল ব্যক্তি মৃগেন্দ্রের ন্যায় ভৈরব গর্জ্জন করিয়া ভীমের অনুকরন করে, ঘোরতর পাষণ্ড দুরাত্মা সহসা শুকদেব সাজিয়া তত্ত্ব শাস্ত্রের উপদেশ দেয়, চটুলনয়না পণ্যবিলাসিনী পবিত্রহৃদয়া দেস্‌দিমোনার পরিচ্ছদ পরে, সাইলকসদৃশ রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর শিবিরাজা কি জীমূতবাহনের অংশ গ্রহণ করিয়া বিপন্নের দুঃখে দ্রবীভূত হয়, এখানেও সকলেই সেইরূপ, যাহা নয় তাহা দেখাইয়া, নটনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে এবং কে কিরূপ পটু পরস্পর তাহা দেখিতেছে। পুনশ্চ, অভিনয়গৃহের ভাগে যেমন একটি নেপথ্যগৃহ থাকে এবং সেখানে প্রবেশ করিয়া সকলে পুরাতন বেশ পরিত্যাগ এবং নূতন বেশ ধারণ করে, মনুষ্য সমাজেরও প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সেই রূপ একটি নেপথ্য আছে। অন্য কাহারও সেখানে যাতায়াতের অধিকার থাকেনা এবং সেই দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে কেহই দৃষ্টিপ্রসরণ করিতে সমর্থ হয়না।

ঐযে অদূরে মৃদুহাসিনী, মৃদু মৃদু হাসিয়া, অতি মৃদুল স্বরে তোমার সহিত আলাপ করিতেছেন, আর দণ্ডে দশবার প্রিয়সম্বোধন করিয়া তোমার তাপিত অঙ্গ শীতল করিতেছেন, উনি মৈথিলী জনকবালা, না মৈসরী ক্লিওপেতরা, তাহা কিরূপে জানিবে, বল। উঁহাকে জনিতে চাও ত একবার নেপথ্যে প্রবেশ কর। ঐযে ধ্যানস্তিমিতলোচন মোহনমূর্ত্তি যুবা, সাক্ষাৎ বৌদ্ধদেবের ন্যায় নিস্তব্ধ উপবিষ্ট

রহিয়াছেন, আর ক্ষণে ক্ষণে নয়ন উন্মীলন করিয়া, তোমাকে ইহলোক, পরলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকের অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বসকল শ্রবণ করাইতেছেন, উঁহার স্বকীয় হৃদয় এই অবসরে কোন্ লোকে বিচরণ করিতেছে, তাহা চিন্তা কর। ঐ যে গূঢ়ার্থদর্শী দেশহিতৈষী মহাত্মা, উন্নতমঞ্চে উত্থিত হইয়া, বাহু তুলিয়া উপদেশ করিতেছেন, আর সকলকে দেশের জন্য বিষয়, বৈভব, প্রাণ,মান এবং হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া দিতে বলিতেছেন, উনি কাহারও জন্য চক্ষের এক ফোটা জলও কখন দিয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা কর। আর দশ জনেও যেমন দশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে, ইহাঁরাও তেমনই অভিনয় করিতেছেন। নির্ব্বোধেরা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে এবং ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; চক্ষুষ্মান্ সুবোধ ব্যক্তি দেখিতেছেন, আর হাসিতেছেন।

তৃতীয় এক সম্প্রদায়ের মতে মানবজীবন এক ভয়ানক সংগ্রামস্থান, এবং মনুষ্যের জন্ম হইতে মরণপর্য্যন্ত সমস্ত জীবন এক সুদীর্ঘ যুদ্ধকাহিনী। কখনও ইহার সঙ্গে, কখনও উহার সঙ্গে আঘাতপ্রতিঘাতেই মনুষ্যের বিতস্তিপরিমিত আয়ুঃকাল ব্যয়িত হয়, এবং অবশেষে কেহ ক্ষতবিক্ষতকলেবরে ধরাশয়নে শয়ান হন; কেহ কণ্ঠে বিজয়মালা দোলাইয়া দিয়া জয়শ্রীতে দিগন্ত আলোকিত করেন। জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ; ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যজন্তু, এবং ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সকলেই মনুষ্যের শত্রু। সকলকে বলে কৌশলে পরাভব করিয়া, প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কার্য্য।

যেমন তরুশাখা হইতে একটি ফল ভূতলে স্খলিত হইলে, শত শত কাক ভয়ানক কোলাহল করিয়া উহার জন্য উড়িয়া যায়; অথবা যেমন একখণ্ড মাংস দূরে ফেলিয়া দিলে, উহাকে কবলিত করিবার জন্য শত শত শৃগাল, কুক্কুর পরস্পরবিরোধে প্রমত্ত হয়, মনুষ্যমণ্ডলীতেও গ্রাসাচ্ছাদন, সম্পদ, সম্মান, যশ, প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার স্থান লাভের জন্য সেইরূপ নিয়ত বিরোধ। এই বিরোধ মনুষ্যে মনুষ্যে, এই বিরোধ পরিবারে পরিবারে, এবং এই বিরোধ

জাতিতে জাতিতে। যে মনুষ্য, যে পরিবার, অথবা যে জাতি, এই বিরোধ-বাত্যায় বিকম্পিত না হইয়া, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই মনুষ্য, সেই পরিবার এবং সেই জাতিই টিঁকিয়াছে; অন্যেরা একবারে বিচূর্ণিত হইয়া লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। মনুষ্যসমাজের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, এই বিরোধের ভাবই তাহার নিদান। ইহা হইতেই শিক্ষা, ইহা হইতেই সভ্যতা এবং ইহা হইতেই মানবীয় শক্তির বিকাশ। এই বিরোধের ভাব তিরোহিত হউক, বসুন্ধরা এই শিল্পাম্বরবিভূষিত মার্জ্জিতবেশ পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় বন্যজীবের আলয় হইবে।

এই মতাবলম্বীরা, ন্যায়কে শক্তির ভিত্তি না বলিয়া, শক্তিকেই ন্যায়ের ভিত্তি বলেন, এবং যে, ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া, পরিণামে কৃতকার্য্য হয়, তাহাকেই কৃতী ও সার্থকজন্মা বলিয়া পূজা করেন। রুসিয়া যে পোলণ্ডকে গ্রাস করিয়াছে, ইয়ুরোপীয় শক্তিসম্পন্ন সুসভ্য জাতিসমূহ যে আমেরিকার আদিমনিবাসিদিগকে লোকালয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছে অথবা একবারে বিনাশ করিয়াছে, অধুনাতন আমেরিকেরা যে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অসভ্যদিগকে বনের পশুর মত ব্যবহার করিয়াছে, ইংলণ্ডীয়েরা যে আইরিশদিগকে গলায় শিঁকল দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে, এবং জর্ম্মণেরা যে আলসেস ও লোরেণনিবাসীদিগের সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও ফ্রান্সের বক্ষঃস্থল হইতে আলসেস ও লোরেণ কাড়িয়া নিয়াছে, তাহা ইহাঁদিগের বুদ্ধিতে অন্যায় নহে। কারণ, এই সমস্ত কার্য্য শক্তিকৃত।

য়াজকসম্প্রদায়ের অধিকাংশের মতানুসারে মানবজীবন এক মহতী পরীক্ষা। বৌদ্ধদিগের বিবেচনায় ইহা পূর্ব্বার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফলভোগ; জীবনজ্যোতিঃ একবারে নিভিয়া গেলেই মনুষ্যের আশা চরিতার্থ হয়। ইপিকিয়ুরিয়ানেরা বলেন, স্বর্গ আর কিছুই নহে, এই যে বর্ত্তমান মানবজীবন, ইহাই সাক্ষাৎ স্বর্গ। আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে কে ইহাকে কিভাবে অবলোকন করেন তাহা, নিজ নিজ হৃদয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বাঙ্গালার বর্ষা।

আসিল বরিষা কাল,
নীল রঙ্ মেঘ জাল,
ঢাকিল আকাশ যেন,
দিনে রাতি করিয়া।

সুগভীর গরজনে,
ঝিরি ঝিরি বরিষণে,
নদ নদী খাল বিল,
জলে দিল ভরিয়া॥

ক্ষেত খোলা তলে তলে,
ঢাকিল নূতন জলে,
মন সুখে ডাকে কোড়া,
ধান বনে বসিয়া।

পুকুরের ধারে ধারে,
ডাকে বেঙ্ উচুতারে,
ডাহুক ডাহুকী ডাকে,
জল রসে রসিয়া॥

লতা পাতা গাছ ঘাসে,
ঢাকে ধরা কুশ কাশে,
সকলি সরস রসে,
মেঘরস পাইয়া।

ভিজা বাস ভিজা গা,
ভিজা ঘর আঙ্গিনা,
হাট মাঠ সব ভিজা,
পথ ঘাট লইয়া॥

কোন মাঝি নৌকা খুলে,
বাতাসেতে পাল তুলে,
ভিজিছে বাবুই যেন,
পাল দড়ি ধরিয়া।

কেহবা লাগায়ে কুলে,
আকাশেতে স্বর তুলে,
ছৈয়ের ভিতরে দিছে,
বার মাসি জুড়িয়া॥

কেহবা নৌকায় চড়ে,
জীবনের আশা ছেড়ে,
চলেছে চাকুরি দায়ে,
তাড়া তাড়ি করিয়া।

নদীর তুফান দেখি,
ভয়েতে মুদিয়া আঁখি,
ডাকিছে মাঝিরে ঘন,
গাজি গাজি স্মরিয়া॥

ধন সুখে সুখী যারা,
আজি দেখ ঘরে তারা,
চপলা চমক দেখে,
বারিন্দায় বসিয়া।

কাঁটালের বিচি ভাজা,
তায় মুড়ি তাজা তাজা,
লবণ মরিচ তেল,
খায় কেহ ঘসিয়া॥

সুরস ইলিস মাছে,
কোল গাদা বেছে বেছে
রাঁধে কুলবধূ ঝোল
সরিসপ বাটিয়া।

বাতাসে বহিয়া গন্ধ,
পথিকে করিছে অন্ধ,
জিহ্বায় ছুটিছে জল
নদী নালা কাটিয়া॥

কেহবা করঞ্জ কাটি,
চর চরি পরিপাটি,
রাঁধিছে মনের সাধে,
বাটী বাটী ভরিয়া।

শ্বশুর শাশুরী ঘরে,
ভয়েতে না কথা সরে,
কাঁদিছে কোণেতে কেহ
প্রবাসীরে স্মরিয়া॥

আজি দেখ ঘরে ঘরে,
উঠে ধুঁয়া চূড়া ফেড়ে,
দিনে দিনে রাঁধা সারে,
বরিষারে ডরিয়া।

ঘরেতে বিছানা পাতি,
দিবসে রচিয়া রাতি
পান মুখে হুকা ধরি
আছে কেহ পড়িয়া॥

বধূরা গিন্নির ডরে,
কাদার সাগরে পড়ে
আজি দেখ হাবুডুবু
খেলিতেছে মরিয়া।

কেহ কাজ কর্ম্ম সেরে
পা ধুয়ে বসিয়া ঘরে
মাখিছে আঙ্গুলে তেল
চুলে তপ্ত করিয়া॥

রসিক পুরুষ যারা,
আজি কোন খানে তারা,
বসে আছে রস ভরে
ঢুলু ঢুলু হইয়া।

পায়ের উপরে পা,
বাবুদের মোছে ভা,
ঘরেতে পোয়াতি কাঁদে
কাঁথা কানি লইয়া॥ **

সমাজবিপ্লব।

১২৭১ সনে কলিকাতাপ্রদেশে বড় ঝড় হইয়াছিল; ঐ ঝড়ে দুই চারিটি আঁবের গাছ মাথা হেলাইয়া দক্ষিণ দিকে পড়িয়াছিল। আবার ১২৭৩ সনের ঝড় সেই গাছগুলিকে উঠাইয়া বায়ুকোণে আনয়ন করে। ঐরূপ যখন যখন সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই নূতন নূতন পরিবর্ত্তন ঘটে; কিন্তু সমাজের মূলপ্রকৃতির ব্যতিক্রম ঘটে না।

লোকে কথায় বলে "বাপকি বেটা, সীপাহিকা ঘোড়া"। তাহার কারণ এই, মনুষ্য স্বভাবতঃ অনুকরণশীল। অনুকরণই সমস্ত শিক্ষার মূল। সুতরাং শৈশবাবস্থায় পিতা মাতার নিয়তনৈকট্যহেতু তাঁহাদিগের অনুকরণে মনের প্রকৃতি গঠিত হইতে থাকে, ও পরিণামে পিতা পুত্রের স্বভাবে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই হেতুতে একবংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগের চরিত্র কিয়দংশে এক প্রকার হইয়া

** যে রসিকলেখক আমাদিগকে এই সরস কবিতাটি উপহার পাঠাইয়াছেন, বাঙ্গলার বর্ষা দ্বাদশবৎসরের মধ্যেও তাঁহার নয়ন গোচর হয় নাই। বোধ হয় এবার কালিন্দীর জলোচ্ছ্বাস দেখিয়াই, স্বদেশের পুরাণ কথা মনে পড়িয়াছে। কবিতাটি একমাস পূর্ব্বে আসিলে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অধিক প্রীতিকর হইত। (সম্পাদক।)

থাকে। একজাতিরও তদ্রূপ। পরম্পরা পুরুষানুক্রমে এক জাতির অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি যুলিয়শ কাইসরের সমসাময়িক আরণ্য ব্রিটন জাতি, ও এক্ষণকার বহুগুণসম্পন্ন সুসভ্য ইংরাজজাতি আন্তরিক অনেক বিষয়ে অদ্যাপি সমান, এবং সপ্তসিন্ধুতীরস্থ গম্ভীরপ্রকৃতি আর্য্য মহাত্মাদিগের সহিত, তদ্বংশজ আধুনিক হিন্দুদিগের অদ্যাপি অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে উভয়ই সমাজের বিপ্লবহেতু আর এক প্রকার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

রাজবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব সকল দেশেই একসময়ে ঘটে। যেখানে শাসনকার্য্যে প্রজাদিগের ক্ষমতা থাকে, সেখানে সমাজবিপ্লব ঘটিয়া রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। আর যেখানে রাজার একাধিপত্য, সেখানে রাজবিপ্লব অগ্রে হইয়া পরে সমাজে বিপ্লব ঘটিয়া উঠে। এখানে আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা কহিব না। কিন্তু এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সমাজবিপ্লব ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী।

ভূমি খনন করিয়া পুনর্ব্বার গর্ত্ত পূর্ণ করিতে হইলে,আর সেই মৃত্তিকায় কুলায় না, নূতন মৃত্তিকার প্রয়োজন হয়। সেইপ্রকার একবার সমাজকে বিপ্লুত করিয়া,পুনরায় সংস্থাপন করিতে হইলে, নূতন লোক না হইলে চলে না। খ্রীঃ ১৬৪০ অব্দে ইংলণ্ডে সমাজ বিপ্লব ও রাজবিপ্লব একসঙ্গে ঘটিয়াছিল; তদ্দ্বারা কুলীনসমাজে ভয়ানক ব্যতিক্রম হওয়ায় অনেক নূতন লোক সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। মহারাণী এলিজেবেথের সময় ইংরেজ সমাজের গ্রন্থি অনেকাংশে শিথিল হইয়া আইসে; ঐ সময় অনেকগুলি নব্য, ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া, দেশাচারের পরিবর্ত্তনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক কারলাইল একস্থলে কহিয়াছেন যে, নব্য ও প্রাচীন মতের সর্ব্বদাই বৈরভাব। তদ্ধেতু যেস্থলে উভয়ের একত্র সংঘটন হয়, সেইখানেই যুদ্ধ, বিগ্রহ ও বিপ্লব। ফলতঃ চিরদিনই এই দুই মতের অবস্থিতি আছে,ও সর্ব্বত্রই এই কারণে মনুষ্যের বিবাদ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলতা। নব্যমতপরিপোষকদল পুরাতন পদ্ধতি পরিবর্ত্তন

করিতে নিয়ত যত্নবান্। পুরাতন দলও সকল প্রকার পরিবর্ত্তনেই অনিচ্ছুক। কিন্তু যেমন জড় প্রকৃতিতে শক্তির সমতা রক্ষার্থে সমস্ত নৈসর্গিক কার্য্য চালিত হইতেছে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও দুইটী বিপরীত তেজ একত্র হইলে, কোন একটীর খর্ব্বতা অথবা বিনাশ দ্বারা শক্তিসাম্য ঘটিয়া থাকে। যখন প্রবল বাত্যাযোগে মহাসাগরে ভীষণ তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, তখন আবার মাধ্যাকর্ষণবলে ক্রমে ক্রমে সাগর স্থৈর্য্য ভাব অবলম্বন করে। তদ্রূপ নূতন ও প্রাচীনমত একত্র সংঘটিত হইলে পরে ক্রমে একটী নূতন প্রণালী দ্বারা সমাজের স্থৈর্য্য হয়। অতএব ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় সমাজবিপ্লবে যে দুই মতের অনৈক্য ছিল, সেই দুই মত হইতে ক্রমশঃ ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী ও সমাজগঠন ঘটিয়া শান্তি স্থাপন হইয়াছে। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসিদিগের মধ্যে সমাজের আলোড়ন হইয়াছিল,ও তৎসূত্রে ভয়ানক রাজবিদ্রোহ উত্থিত হইয়া সমস্ত ইউরোপীয় রাজ্যকে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। যে দুই মতের বৈষম্য হেতু সেই বিপ্লব হয়, তাহাদের অদ্যাপি সাম্য হয় নাই। ফলতঃ ফরাসি সমাজবিপ্লবে যে দুই দলের অনৈক্য ছিল, তাহাদিগের আধ্যাত্মিক বল অত্যন্ত অধিক, ও তজ্জন্য যে তুমুল সামাজিক আন্দোলন ও বিগ্রহ হইয়াছিল তাহাতে সাম্য অনেক বিলম্বে লাভ হইবে। ফরাসিরা গর্ত্ত কাটিয়া একবার ইংরাজি মৃত্তিকা ও একবার জর্ম্মান মৃত্তিকা দিয়াছে, কিন্তু এখনও পূরণ হয় নাই।

যে দেশে পূর্ব্বতন ও নূতন মতের বেগ তুল্য, সেখানে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয় না, ক্রমে ক্রমে দুই মতের তেজ খর্ব্ব হইয়া দুই চারিটি সামাজিক পদ্ধতির ব্যতিক্রমে পরিণত হয়। যে দেশে পূর্ব্ব মত বলবৎ, সেখানে নব্যমতাবলম্বীরা ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব মতের বাহ্যিক কিছু বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করিয়া ক্ষান্ত হয়; কিন্তু যে দেশে নব্য মত প্রবল সেখানে অল্পকাল মধ্যেই বিপ্লব ঘটে। যেখানে রাজবিপ্লব পূর্ব্বে ঘটে, সেখানে একটি অতিরিক্ত তেজ ঐ দুই মতের অন্যতরের আশ্রয় হইয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করে। কিন্তু এমত স্থলে অল্পদিনেই বিপ্লব উপস্থিত হয়।

বস্তুতঃ ত্বরায় যে বিপ্লব হয়, তাহাই বিপ্লব; কালগৌণে যে পরিবর্ত্তন তাহা অনেক অংশে স্বাভাবিক বোধ হয়, ও তাহাতে বাস্তবিকও কোন গোলযোগ ঘটে না। অতএব যেখানে নব্যসম্প্রদায় কালের সহায়তা অবলম্বন করিয়া সহজে মত স্থাপন করিতে প্রয়াসী, সেখানে সমাজবিপ্লবের তাদৃশ আশঙ্কা নাই, বরং ফলের স্থিরতা অধিক। সকল কার্য্যেই স্থিরতা চরম ফল। যতক্ষণ আন্দোলন হয় ততক্ষণ লাভালাভ কিছুই হয় না, কেবল কষ্ট মাত্র। সমাজ আলোড়িত হইলে জাতি সাধারণের লাভ তত সহজ হয় না; কিন্তু উদ্ধতস্বভাব মনুষ্যেরা মনে করেন যে, অতিরিক্তবলপ্রয়োগে অথবা ব্যগ্রতা দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ফল শীঘ্রই লাভ হয়। এই ভ্রান্তিবশতঃ ফল লাভ দূরে থাকুক, আপাততঃ সমাজ বিচ্ছৃঙ্খল হইয়া অনিষ্টোৎপাদন করে। কালের প্রতি নির্ভর করিয়া যে ফল ইংরেজেরা অল্প দিনে লাভ করিয়াছিলেন, অধৈর্য্য ফরাসিদিগের তজ্জন্য কত রক্ত ক্ষয় করিতে হইতেছে। আবার সভ্য ইটালী সেইকাল মধ্যে আশাতীত ফল ভোগ করিতেছেন। তথাচ ইটালিতে গর্ত্ত পুরণে ইটালীয়দিগকে ফরাসি মৃত্তিকা আনিতে হইয়াছে।

অনেকে মনে করিবেন, আমরা রাজবিপ্লবের বিষয় কহিতেছি, কিন্তু পুর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই দুই বিপ্লব এককালে ঘটিয়া থাকে, আর ইহাদিগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ধর্ম্মবিপ্লব। ইতিহাসলেখকেরা রাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের বিষয় যেরূপ পরিচয় দেন, সমাজবিপ্লবসম্বন্ধে তত লিখিবার উপায় পান না ও লেখেন না। উত্তর আমেরিকায় স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় কিয়ৎপরিমাণে সমাজবিপ্লব হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যে ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, তাহা আর একটী সুমহৎ সামাজিক আন্দোলনের ফল। দাসত্বমোচনকামনা এই সামাজিক আন্দোলনের হেতু। তবে ইহাতেও কিছু ভিন্ন মৃত্তিকার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমেরিকেরা নব্যজাতি; ইহারদিগের মধ্যে আবার যাহারা প্রাচীনমতের, তাহারদিগের বহুকালের সহায়তায় যে বল জন্মে তাহা নাই; সুতরাং অচিরকাল মধ্যে সামাজিকবিপ্লব ঘটিয়া শক্তিসাম্য

প্রাপ্ত হইয়াছে। জর্ম্মণীতে একবার সমাজবিপ্লব ঘটিবায় হাপসবর্গ রাজবংশীয়দিগের প্রভুত্বলোপ হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি শক্তিসাম্য হয় নাই। মন্ত্রিবর বিস্‌মার্ক রাজনীতির পরিবর্ত্তন করিয়া এবং প্রুসিয়াধিপকে জর্ম্মণির সম্রাট্‌ করিয়া জর্ম্মণ জাতির কি উপকার করিতেছেন বলিতে পারি না। এক্ষণকার নব্য ইংরেজেরা নব্য জর্ম্মণদিগের চূড়ামণি বিসমার্কের যে প্রশংসা করেন, করুন। আমাদিগের অল্পবুদ্ধিতে পরকীয়বল ব্যতীত ঐ দেশে সামাজিক স্থৈর্য্য ঘটিবেনা।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দেশে দেশীয় ইতিহাসলেখক নাই। যাঁহারা বিদেশী, তাঁহারা আমাদিগের প্রকৃত সামাজিক অবস্থা অবগত নহেন। আবার সাধারণতঃ সকল পুরাবৃত্তবেত্তারা সন্ধি, বিগ্রহ ও রাজবংশ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, সমাজের প্রতি দৃষ্টি করেন না। তবে মধ্যে মধ্যে, তমসাচ্ছন্ন রজনীতে বিদ্যুতালোকের মত, এক এক বার যুদ্ধাদির বর্ণনার মধ্যে সমাজঘটিত দুই একটি কথা বাহির হইয়া পড়ে। প্রাচীনভারতের ইতিহাস নাই; যাহা কিছু আছে, তাহা রূপকালঙ্কারপ্রভৃতি কবিকল্পনাসম্ভূত ইন্দ্রজালে আবৃত। তবে, যদি মহাত্মা বেকনের 'প্রাচীনদিগের জ্ঞানপরিচয়ের' ন্যায় কোন সারবৎগ্রন্থ কেহ কখন রচনা করেন, তাহা হইলে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সারোদ্ধার হইয়া প্রাচীনভারতবাসী আর্য্যগণের সমাজঘটিত কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। যেমন টাইগ্রিস-নদী-তীরস্থ বালুকারাশির গর্ভে নিনাভা নগরের রাজপ্রাসাদনিচয় নিহিত ছিল, প্রাচীনতত্ত্ববি[illegible]প্রধান পণ্ডিতেরা তাহার আবিষ্কার করিতেছেন; যেমন বিস্থবিয়সের অনলোৎপাতে হারকুলেনিয়ম ও পম্পো নগর ভূগর্ভে লুক্কায়িত ছিল, এক্ষণে মৃত্তিকাখননহেতু আবার নগরদ্বয়ের সমৃদ্ধি নয়নগোচর হইতেছে; সেইরূপ পৌরাণিককল্পনাপরিপ্লুত ও মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে সমাচ্ছাদিত ভারতবর্ষীয় প্রাচীনপুরাবৃত্তের পুনরান্দোলন দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের সমাজ কি প্রকার আশ্চর্য্যরূপে বিন্যস্ত ছিল, তাহা নব্যেরা যথার্থ অবগত হইতে পারেন। এতাদৃশ বহুকালব্যাপী ইতিহাসে অবশ্যই দুইএকটি

সমাজবিপ্লবসংক্রান্ত কথা থাকিতে পারে। কিন্তু, এদেশে প্রাচীনমতপোষকের বলই চিরকাল অধিক। সুতরাং সমাজবিপ্লব অত্যল্প সম্ভব। তথাচ,যেমন অমানিশার নক্ষত্রালোকে কিছু কিছু দেখা যায়, তদ্রূপ এই ঐতিহাসিক অন্ধকারেও অল্প একটুকু দেখা যাইতে পারে।

ইহা অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধমতপ্রচারের সময় একবার সমাজবিপ্লব হইয়াছিল। রাজ্যবিপ্লবও ইহার এক অব্যবহিতপরবর্ত্তিঘটনা। এই সমাজবিপ্লবে যে শক্তিবৈষম্য ঘটে, তাহার নিরাকরণার্থ অনেক দিন লাগিয়াছিল। প্রায় তিনশতবৎসরকাল আর্য্যবর্ত্তে শক্তিসাম্য হয় নাই। তৎকালীন নব্যেরা বলবান্ ছিলেন বটে, কিন্তু আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, এদেশে প্রাচীনমতপোষকেরাই প্রবল ছিলেন, কাজে কাজে শক্তিসাম্য হইয়া পুর্ব্বমতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল মাত্র; আবার গর্ত্ত পুরাইতে যাবনিক মৃত্তিকার আবশ্যক হইয়াছিল।

মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা হিন্দুদিগের সমাজের বিষয় কিছু লেখেননা, এজন্য মহম্মদীয় রাজ্যবিস্তৃতির সময় যে ইহাতে বিপ্লব হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই, অথচ সমাজবিপ্লবই তাহার মূল। ইহা নিঃসন্দেহ যে, কান্যকুব্জাধিপ জয়চন্দ্র ও দিল্লীশ্বর মহারথী পৃথ্বীরাজ,উভয়ে দুই মতের পোষক ছিলেন,এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল রাজকীয়বৈর নয়,সামাজিকবিচ্ছেদও প্রবল ছিল। সেইসূত্রেই ঘোরীরাজ সাহাবুদ্দীনের আগমন। আবার অন্যস্থান হইতে মৃত্তিকা আনিতে হইল। মোগল পাঠানের যুদ্ধের সময়েও বাঙ্গালায় সমাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল।

সাধারণতঃ বিদেশীয় রাজাদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে আমাদিগের সমাজবিপ্লব ঘটে না। কেননা এদেশের রাজারা প্রজাদিগের সহিত মিলিত হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় পাঠানেরা বাস করিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে দেশীয় নীচ হিন্দু ও কখন কখন উচ্চবংশের সহিত বৈবাহিকসম্বন্ধবিধানদ্বারা অনেক মিলিয়াছিল। তথাচ হিন্দুসমাজের পার্থক্য ছিল,সন্দেহ নাই। কিন্তু নিকটস্থ কোন স্থানে আঘাত হইলে, যেমন তাহার ঝাঁজ আসিয়া লাগে, তদ্রূপ

পাঠানরাজবিপ্লবে হিন্দুসমাজেও ঝাঁজ লাগিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বেই তাৎকালিক নব্যেরা উৎসাহিত হইতেছিলেন ও কিঞ্চিৎ ফল লাভ ও করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজবিপ্লবের সহিত সমাজবিপ্লব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। এই বিপ্লবকে বৌদ্ধমতের পুনরুত্থান বলিলেও বলা যায়। যাহাহউক তৎকর্ত্তৃক যে শক্তিবৈষম্য ঘটিয়াছিল তাহা অচিরস্থায়ি। নৈসর্গিকবলে হিন্দুসমাজ শীঘ্রই স্থৈর্য্য লাভ করিল।

আজকাল আবার সমাজবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার সূত্র পলাশীর যুদ্ধ। এবারকার বিপ্লবে অনেক ইংরেজী মাটী লাগিতেছে কিন্তু অদ্যাপি সাম্যভাব হয় নাই। নব্যমতের বল কি প্রাচীনমতকে একবারে পরাভূত করিবে? করিলেও, প্রকৃতিগত বড় একটা অধিক বৈলক্ষণ্য ঘটে, এমন বোধ হয়না; আর করিতেও বহুকাল। ব্যগ্রতাসহকারে আন্দোলন করিলে শুদ্ধ সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে এমত নহে; শেষটা অনিষ্ট ঘটিতে পারে; আর ফলও অল্প হইবে। আমাদিগের বিবেচনায়, যেমন বৌদ্ধদিগের সময় প্রাচীন আর্য্য তরু একটুকু হেলিয়াছিল এবং চৈতন্যর সময়ে নড়িয়া চড়িয়া সেইদিকেই রহিল, এবারও দুই চারিটি শাখা ভাঙ্গিয়া বা সেই রূপ থাকে।

ব্যুৎপত্তিবাদ।

নূতন অভিধান।)

ইদানীং এদেশে নিত্য নূতন এতই গ্রন্থ প্রচার হইতেছে যে, কেহ গণিয়াও শেষ করিতে পারে না। বলিতে কি, বাঙ্গালাভাষা, গ্রন্থের ভারে, স্বর্ণরজতকাংসপিত্তলাদিনির্ম্মিত-গুরুভারযুক্ত-বহুবিধভূষণাক্রান্তা তৈলিকবধূর ন্যায়, অথবা মৃত্তারপূর্ণা কুম্ভকারতরণীর ন্যায় নিয়ত দক্ষিণে ও বামে দুলিতেছেন; কোন্ সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়েন, অনুমান করা যায় না। এদেশে যত না লোক, ভরসা হইতেছে কালবশে গ্রন্থকারের সংখ্যা তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়া

পড়িবে। কিন্তু ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয় যে, কোন মহাত্মাই একখানি ভাল অভিধান প্রকাশ করিয়া ভাষার সহজবোধ্যতা সাধন করিতেছেন না। দিন দিন নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে,পুরাতন শব্দ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, নানা ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতেছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট একখানি অভিধানের অভাবে শিক্ষার্থিদিগের ব্যুৎপত্তিলাভ ও ভাব পরিগ্রহ হইতেছে না।

আমরা এই অভাবটি দূর করিবার অভিলাষে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অদ্বিতীয় শাব্দিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয়কে বিশেষ আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি, শুদ্ধ অনুরোধ রক্ষার্থ,ব্যুৎপত্তিবাদ নামক একখানি নূতন অভিধান সংকলন করিয়া,সাহিত্য সমাজের দৃষ্টির জন্য আমাদিগের নিকট কিয়দংশ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা উহা হইতে কএকটি শব্দ অর্থ সমেত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যদি বঙ্গভাষানুরাগী বিজ্ঞ পাঠকবর্গের ভাল বোধ হয়, তাহা হইলে সরস্বতী মহাশয়কে সমস্ত অভিধানখানি ক্রমেই প্রকাশ করিতে বলিব।

নাটক—নট নর্ত্তনে, হিংসায়াঞ্চ। ণিচ্। নাটয়তি—চিত্তং ভ্রাময়তি; বৃদ্ধান্ তরুণান্, বালকাংশ্চ প্রমত্তবৎ নর্ত্তয়তি; যোবা পঠনপাঠনাদিকং ছাত্রধর্ম্মং, লজ্জানম্রতাদিকং কৌমারগুণং পূতাচারপ্রমুখং শূরসেব্যসদ্ভাবসমূহঞ্চ হিনস্তীতি নাটকঃ। হিংসার্থে চৌরাদিকোঽয়ংধাতুঃ।

তাৎপর্য্য—যাহাতে চিত্তকে নাটিত করে অর্থাৎ ঘুরায়; বৃদ্ধ, যুবা ও বালককে পাগলের মত নাচায়; অথবা,পঠন পাঠনাদি ছাত্রধর্ম্ম, লজ্জা ও নম্রতাদি কৌমার গুণ, এবং পবিত্র আচার প্রভৃতি সজ্জনসেবনীয়সদ্ভাবসমূহকে হনন করে, তাহার নাম নাটক।

এই ধাতু হইতে সংস্কৃত নট, নটী এবং বাঙ্গালা নাটাই, নাটুয়া ও নাটিম প্রভৃতি বহু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর বলেন; ইংরাজী নটী শব্দও এই ধাতুজাত। আধুনিকেরা বলেন, নাটক-শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে। ইহা এইক্ষণকার বাঙ্গালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ না টক, না মিষ্ট। সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত

কতকগুলি নাটক এই সংজ্ঞার বিষয় নহে। বাঙ্গালার প্রায় সকল নাটকই নাটক অর্থাৎ এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

বক্কা—বক অপভাষণে, প্রলাপকথনেচ। বকাবকি, বকুয়া, বকনি প্রভৃতি বহু শব্দ এই ধাতুমূলক। অন্ত্য ককারের স্থানে খকার আদেশ করিলে, বখা বখাটিয়া প্রভৃতি শব্দও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। শব্দকৌস্তুভকার বলেন, বহ, সহ এই দুই ধাতুর অকার স্থানে ওকার আদেশ করিয়া যেমন বোঢ়া ও সোঢ়া এই দুই পদ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বক ধাতুর অকারস্থানে ওকার করিয়া বোকা হয়। কোন কোন প্রাচীন বৈয়াকরণ বলেন, বর্করাদি কতিপয় শব্দও এই ধাতু হইতে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শিষ্টপ্রয়োগবিরহে ইহা স্বীকার করা যায় না।

স্ত্রী—স্তু স্তবনে, ড্রট্ প্রত্যয়ঃ, স্ত্রীত্বাৎ ঈপ্। অর্থ—স্তবনীয়া, গুরু কিংবা ইষ্ট দেবতার ন্যায় পুজনীয়া।

শব্দটির এই অর্থ নিবন্ধনই ইদানীন্তন মহানুভাবগন, মাতা, পিতা, ভাই ভগিনী, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লেখা পড়া প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় নবনীতনিন্দি স্ত্রীপদারবিন্দে কুসমাঞ্জলির ন্যায় সমর্পণ করিয়া, নিরতদাসের ন্যায় তাঁহার স্তুতি করেন, অথবা গৃহপোষ্য মেষের ন্যায় তদীয় মুখাপেক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। কুলাচারপরায়ণ তান্ত্রিকেরা এবং প্রত্যক্ষবাদপ্রচারক অগস্ত্যকোমতপ্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা যে, স্ত্রীর উপাসনাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারও ইহাই নিদান, এবং এই হেতুবশতঃই বর্ত্তমান সময়ের অনেক সুরসিক গ্রন্থকার যুগধর্ম্মের উপদেশ দিবার নিমিত্ত (পরিহাসচ্ছলে) গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীর বন্দনা করেন।

ডাক্তর—। ডক ছেদনে, ভেদনে, ক্রন্দনে, বিলুণ্ঠনেচ। তরণ্ প্রত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধার অকার স্থানে আকার। ডাক, ডাকাডাকি, ডাকাতি, ডাকাবুকা, ডাকিনী প্রভৃতি শব্দও ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যোগে এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

সভা—। ভা দীপ্তৌ প্রজল্পনেচ।

সহ ভাস্তি, কালহরণার্থং প্রজল্প-স্তি বা যত্র। যেখানে সকলে যুটিয়া নিজ নিজ তেজ দেখায়, অথবা সময় হরণের জন্য প্রলাপ বলে, তাহার নাম সভা।

হাকিম—। হক তর্জ্জনে, গর্জ্জনে, ভ্রূকুঞ্চনে, লোকপীড়নেচ। ইমণ্ প্র-ত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধা অকার স্থানে আকার। হাঁক ও হাঁকাহাঁকি প্রভৃতি বাঙ্গালা শব্দ এবং হুক্কার প্র-ভৃতি ম্লেচ্ছশব্দও এই ধাতুমূলক। যাঁহার তর্জ্জন নাই, গর্জ্জন নাই, ভ্রূকুটি নাই ও লোকপীড়ণের মতি নাই, তিনি হাকিম নহেন।

সাধু।—সাধ সিদ্ধৌ, ঔণাদিক উঃ প্রত্যয়ঃ। সাধ্নোতি স্বকার্য্যং কৌশলেন বলেন বা ইতি সাধুঃ। যিনি বলে, ছলে, কিংবা কোন অচিন্তনীয় কৌশলে স্বকার্য্য সাধন করেন তিনি সাধু। প্রবঞ্চনাপর বনিকদিগকে এই নিমিত্ত সাধু বলে,এবং যাহারা ‘ সব্ ছোড়্ কে আপ্না বাচানা ’ এই নীতি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্যসাধনে সতত তৎপর থাকেন, তাঁহারাও এই নিমিত্তই সাধু বলিয়া সর্ব্বত্র অভিহিত হন।

ফেরঙ্গী—ফে ইত্যব্যক্তং রৌতীতি ফেরুঃ শৃগালঃ। তংগচ্ছতি, ফেরুত্বং প্রাপ্নোতীতি ফেরঙ্গী। ধূর্ত্তে, হিংস্রে, রাক্ষসেচ।—ফে ফে করিয়া যাহারা রব করে,তাহাদিগকে ফেরু বা ফেরব অর্থাৎ শৃগাল বলে। যাহারা সেই ফেরুর আচার অনুকরণ করে, অর্থাৎ ফেরুত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ফেরঙ্গী। অতএব, ফেরঙ্গী বুদ্ধিতে শৃগাল, ভোজনে রা-ক্ষস, লৌকিক আচারে ধূর্ত্ত অথবা হিংস্রপ্রকৃতি। যাবনিক ফেরেব শব্দও এইরূপে সাধিত।

ভক্ত—ভজ সেবায়াং পরচরণলেহ-নেচ। যাহারা পরকীয় পদসেবায় জীবন উৎসর্গ করে, এবং তদর্থ বিধিদত্ত বুদ্ধি বৃত্তিকে বলি দেয়, তাহারা ভক্ত। স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে, ভক্ত স্থানে ভাক্ত হয়। অতএব যে যে স্থলে ভক্ত শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই স্থলে ভাক্ত শব্দ ব্যবহার করিলে, ব্যাকরণ কি অ-ভিধান অনুসারে কোন দোষ ঘটেনা।

পর[illegible] [illegible]—বব' চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে, [illegible] [illegible]গে, ধৃষ্টব্যবহারেচ। ঔণাদিক [illegible]রের বৃ[illegible]য়ঃ। ণ ইৎ যায়,উ থাকে,অকা-অভিম[illegible] [illegible]।—যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, [illegible]রত এ[illegible]ন গগনস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণ [illegible] বাবু[illegible]বং ব্যবহার ধৃষ্ট, তাহারা বাবু। [illegible] চাঞ্চল্যে ভ্রমরসদৃশ,চিন্তাশক্তি কিছু [illegible]ই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারে [illegible]া; অভিমানে শরতের মেঘ, গর্জ্জে কিন্তু বর্ষে না; অথবা বর্ষার ভেক, নিয়ত শব্দ করে, কিন্তু নিকটে আসিতে সাহস পায় না; পরদেশীয় ছন্দানু-বর্ত্তনে সর্ব্বথা সিগারদিগের সমান, একবার আসবাব ও পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং ধৃষ্টতায় প্রুসি-য়ানদিগেরও প্রপিতামহ, কথায় বোধ হয়, এক লম্ফে সপ্তসাগর উল্লঙ্ঘন করাও বিচিত্র নহে।

পিতা—পত অধোগমনে। নিপাতনে ইকার আদেশ। পূর্ব্বতন বৈয়াকরণ-দিগের মতে পিতৃশব্দ পা-ধাতু-মূলক এবং উহার অর্থ পাতা, রক্ষা কর্ত্তা। অধুনাতন শাব্দিকদিগের মতে পিতৃ-শব্দ পত-ধাতুমূলক,অর্থ পতনশীলপাপী। এই হেতু, দুধের গন্ধ যায় নাই, ঈদৃশ অষ্টমবর্ষবয়স্ক বালকও, পিতা ও পিতৃপুরুষদিগকে অধোগামী নারকী বলিয়া,তাঁহাদিগের পাপ সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে পারে। যে পিতাকে অদ্যাপি পাতা বলে, তাহার ব্যাকরণ ও অভিধানে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

-:※:-

সমালোচক ও সমালোচনা

(প্রাপ্ত)

লেখক শিক্ষক, সমালোচক ছাত্র। অথবা লেখক বিচারক, তিনি বিচার্য্য বিষয়ের উপযোগী প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া বিচার করিবেন; সমালোচক কেরাণী, সেই বিচার লিখিয়া লওয়া তাঁহার কার্য্য। লেখক ও সমালোচক দিগের মধ্যে প্রাথমিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল। সমালোচক লেখক দিগের গ্রন্থ

পাঠকরিয়া কাহাকে কি বলে, কি উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট, কি সুন্দর কি কদর্য্য, কি অনুকরণীয়, কি পরিহার্য্য, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিবেন; তাঁহার সহিত লেখকের প্রথম বন্দোবস্ত এইরূপ।

দ্বিতীয় বন্দোবস্ত এইযে, যেমন কেরাণীরা প্রথমে মোকদ্দমার নম্বর, তৎপর বাদী প্রতিবাদীর নাম, তদনন্তর মোকদ্দমার হেতু ইত্যাদি যথাস্থানে লিখেন, সমালোচকগণ ও তদ্রূপ দোষ, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতি গ্রন্থমধ্যে যাহা কিছু দেখিবেন, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শন করিবেন। কিছুদিন পরে লেখক দেখিতে পাইলেন, ছাত্র তদীয় উপদেশ কণ্ঠস্থ করিয়া স্বয়ং শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ছাত্রের উপর শিক্ষকের অত্যন্ত স্নেহ, বিশেষত তাঁহাকে চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিশ্বাস ছিল; সুতরাং শিক্ষক তাহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 'আদুরে ছেলে বাপের ঘাড়ে চড়ে।' সমালোচক আশ্রয় পাইয়া, সংপ্রতি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে বিচারও করিতে লাগিলেন। এপর্য্যন্ত অধিকার প্রদান করিতেও লেখক ছাত্র করিলেন না। সুতরাং পুহাসভা প্রশ্রয় পাইয়া, ছাত্রের 'গু ইলেন বিদ্যা হইল। এইক্ষণ কতিপয় রত সমবেত হইয়া, একটী ব্যব স্থন সংস্থাপন করিলেন; একজন হ রব সভাপতি অপরেরা সদস্য। ভা বর্ষীয় ব্যবস্থা সভার ন্যায় তৎ আইন কানুনের ছড়া ছড়ি হইতে লাগিল। কেবল সাহেব যেমন গবর্ণমেন্টের সকল বিভাগে কোন না কোন নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন; আমাদিগের সমালোচক সভা তদ্রূপ সাহিত্য রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে অভিনব নিয়ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ কাব্যসভা নিয়ম করিলেন, কাব্যে নয়টী রস থাকিবে। তন্মধ্যে কোন কাব্যে সমস্ত, কোন কাব্যে কএকটী থাকিলেই যথেষ্ট; ইত্যাদি এবং রসাত্মক না হইলে কোন রচনাই কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কিন্তু কিছু দিন পরে সদস্যেরা দেখিতে পাইলেন, কোন কোন রচনায় পূর্ব্বোক্ত কোন রসের সমাবেশ নাই, অথচ তাহা অত্যন্ত

ন্দর, মধুর ও কাব্যনামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং পূর্ব্বতন আইনের সংশোধন করিতে বাধ্য হই. লেন। এইরূপে সঞ্চারিভাব ব্যভিচারিভাব, স্বভাব, অভাব, ভাবাভাব, কত কিছুরই আবির্ভাব হইল। তখন শিক্ষকের আর সহ্য হইল না, তিনি তৎসমুদয় নিয়ম গ্রাহ্য করিলেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আমি রচনা করিব,তাহাতে নিয়ম রক্ষা হয় ভাল, না হয় আমি যা লিখিব তাহাই নিয়ম। ছাত্র, অপ্রস্তুত হইয়া, পুর্ব্বনিয়মের পুনরায় কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন আইনে কতকগুলি ‘ বর্জ্জিত বিধি ’ করিলেন। ইহাদের নাম ‘ কবিপ্রসিদ্ধি ’ ‘ আর্ষপ্রয়োগ ’ প্রভৃতি। কিন্তু সুচতুর সদস্যেরা বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের মত বুদ্ধিমান্ লেখক ভিন্ন, কেহই এ সকল গ্রাহ্য করিবে না। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকেরা কালে এই সংশোধনের সংশোধনও তৃণ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়তঃ,—দৃশ্যকাব্যসম্বন্ধেও নানা নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। কেহ কহিলেন, নাটক শোকান্ত হইবে না;—কেহ কহিলেন, কেবল পাঁচটি অঙ্ক থাকিবে, ইহার অধিক বা অল্প হইবে না;—কেহ কহিলেন সময়, স্থান, ও কার্য্যের একত্ব রক্ষা আবশ্যক,ইত্যাদি। এইরূপে রূপক, উপন্যাসপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রচনারই কিছু না কিছু নিয়ম করা হইল। কিন্তু লেখকেরা, একে একে সকল নিয়মই, কোন না কোন অংশে, ভঙ্গ করিয়া নূতননিয়ম স্থাপন করিলেন। সমালোচকেরা যদিও বিচারকের পদ অধিকার করিয়াছিলেন, তথাপি, গুরু বলিয়া সম্মান করিয়াই হউক, কি শেষ রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ার ভয়েই হউক, কিংবা নূতন চুক্তি ভঙ্গ-আইন জারি হয় নাই বলিয়াই হউক, নিয়মভঙ্গের জন্য উক্ত লেখকদিগের দণ্ডবিধান করিতে সাহসী হইলেন না। বরং অপরাধীর আনুকূল্যে নূতন ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপরে যে সকল বিচারকের ও অর্থিপ্রত্যর্থীর কথা হইল,তাঁহারা উভয়েই ক্ষমতাবান্,সুতরাং উভয়েই স্ব স্ব পদ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু ইহাঁদের দৃষ্টান্তে নিতান্ত শোচনীয় ফল ফলিতে লাগিল। কতকগুলি লোকে ভাবিল,রচ-

নায় কোন নিয়ম রক্ষা না করা, অর্থাৎ কোন নিয়মের অধীন হইয়া না চলাই প্রতিভার লক্ষণ। এবং তাহারা 'খঞ্জরীতত্ত্ব', 'কি ঘোরকলিকাব্য', 'হায় কি মজার শনিবার', 'মাসীর মার কান্না' প্রভৃতি গদ্য, পদ্য, সদ্য, মদ্য রচনা করিয়া স্বচ্ছ প্রতিভা প্রকাশ করিল। আবার কতকগুলি লোকে মনে করিল, সমালোচনাব্যবসায়টি বেশ সহজ। পুর্ব্ব পুর্ব্ব সমালোচকদিগের 'অলঙ্কার' গ্রন্থ মুখস্থ করা, আর লেখকমাত্রকে গালি দেওয়া হইলেই, মম্মটভট্টের আসন সহজলভ্য হয়। এই শেষোক্তশ্রেণীর মহাত্মারা বাঙ্গালাসংবাদপত্রাদির সম্পাদক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।)

এই সকল সমালোচনা নানাভাগে বিভক্ত। আপনি ইদানীং সম্পাদকতা কার্য্যে ব্রতী, সুতরাং বোধ হয়, আপনার উপদেশার্থে কএকটি নিয়ম প্রদান করিলে, আপনি আমাকে ধন্যবাদ না করিয়া পারিবেন না। যার তার নিকট উপদেশগ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। কুস্থান হইতেও রত্ন গ্রহণ করিবে। বিশেষতঃ আমি একজন শিক্ষক, উপদেশ দেওয়া আমার ব্যবসায়। সুতরাং আপনার কোন আপত্তি হইতে পারে না।

✓১ম। মার্কিন সমালোচনা, ইহাকে সাধরণতঃ 'কাটা ছেঁড়া' কহে। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ এই, মার্কিন দেশে 'তাম্রকূটসংশোধিনী' নামে একটি সভা ছিল। জাহাজে তামাক আসিয়া বোস্টন বন্দরে উপস্থিত হইলেই,সদস্যেরা তাহা পরীক্ষা করিতে যাইতেন, এবং অপকৃষ্ট হইলে বস্তা সমেত সমুদয় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেন। কিছু দিন এইরূপ করিলে, লোকে উৎকৃষ্ট তাম্রকূট প্রস্তুত করিতে যত্নশীল হইল। অধুনা মার্কিনের তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি সম্পাদক এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে উৎকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ সমালোচনায় প্রথমে গ্রন্থের আগা গোড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লেখকের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতে হয়। লেখকের জন্মদাতা ও শিক্ষাদাতাকে ভৎর্সনা করিতে পারিলে, আরও সরস হয়। সংক্ষেপে একটি নমুনা দিতেছি।

" চিত্রপ্রভা কাব্য—ইহার রচনা অতি কদর্য্য, ভাষা কর্কশ, কবিতার

স্থানে স্থানে ছন্দঃপতন, ও মিলের দোষ; ভাব পুরাতন। এই গ্রন্থ লিখিতে, আমরা জানি না, লেখকের পিতৃশ্রাদ্ধ না মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল? গ্রন্থকারের শিক্ষাকার্য্য যে কত সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থেই প্রকাশ।"

২য়। আইরিশ সমালোচনা।—ইহাকে সামান্যতঃ 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে।' গ্রন্থকারের ভাষা এত দুরূহ, ভাব এত গভীর এবং রচনা এত গূঢ় যে, সমালোচক তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন না, ক্রোধে গ্রন্থকারকে গালি দেন। কিন্তু আয়র্লণ্ড বিষহীন ভুজঙ্গের দংশনের ন্যায়, তাহাতে লেখকের অঙ্গে আঁচড়টিও লাগে না। নমুনা যথা—

'ইন্দ্রজিতনাশ কাব্য।—এই গ্রন্থখানি বীররসপ্রধানকাব্য, কিন্তু ইহাতে প্রসাদগুণের অত্যন্ত অভাব। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের সারল্য, কবি কখনও অভ্যাস করেন নাই। ক্রোধ ব্যতীত (বুঝিতে নাপারিয়া এ ক্রোধ) আমাদের অন্তঃকরণে করুণরসের লেশমাত্রও উদয় হইল না, চক্ষে একবিন্দু জলও আসিল না। সুতরাং এ কাব্যখানি যারপর নাই কদর্য্য, অশ্লীল, গ্রাম্যতাপূর্ণ, ইত্যাদি।'

৩য়। কাকতালীয় সমালোচনা।—উক্ত নামযুক্ত ন্যায় সকলেই জানেন, সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা করা বাহুল্য। এরূপ সমালোচনায় গ্রন্থের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ থাকেনা; শিরঃস্থানে বা টীকায় গ্রন্থের নামমাত্র ধৃত হইয়া সমালোচনাতে সমালোচকের যত কিছু বিদ্যা বুদ্ধি থাকে, তাহার সমুদয়ই খরচ করিতে হয়। এরূপ সমালোচনার আবিষ্কর্ত্তা লর্ড মেকলে।

৪র্থ। গ্রন্থাবরণস্পর্শি, বা 'ছালুনচাকা'! এইরূপ সমালোনার মত সহজ আর কিছুই নাই। ইহাকে তৃতীয়শ্রেণীস্থ সমালোচনার শাখা বলিলেও ক্ষতি নাই। গ্রন্থের টাইটল পেজ, বড় জোর বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়াই, এরূপ সমালোচনা করা যায়। নমুনা দেখুন।—

'ষড়্দর্শনসংগ্রহ।—এখানি দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ। তিমিরবিকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত, ইহার অবয়ব রয়েল আটপেজি ফরমার ২০৪ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকারের নাম

নাই, প্রকাশক শ্রীবেচারাম দত্ত। মূল্য ১॥০, সংস্কৃত পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা অনবকাশবশতঃ সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারি নাই; কিন্তু পুস্তকখানি মন্দ নহে। মুদ্রাঙ্কণ সুচারুরূপে হইয়াছে।'

৫ম। মাক্ষিক সমালোচন।—মক্ষিকাগণ যেরূপ কেবল ক্ষত স্থানেরই অন্বেষণ করে, এরূপ সমালোচনাতেও তদ্রূপ দোষের স্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে হয়। ইহার নমুনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আপনি যখন একখানি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক, তখন ইহা অবশ্যই বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, আপনি আদর্শ না দিলেও এরূপ সমালোচনা করিতে সক্ষম হইবেন।

টীকা—একনেত্র সমালোচন, ইহার একাঙ্গ। ইহাতে স্বসম্পর্কীয় হইলে,কেবল গুণ; অপরের পক্ষে কেবল দোষ, দেখাইতে হয়।

৬ষ্ঠ। মুরব্বি 'গরি। সমালোচক খড়্গহস্ত না হইয়া মৃদুভাবে গ্রন্থকারকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করেন, এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থকার তাদৃশ দোষ না করেন, এজন্য তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন। নমুনা যথা—

'বীরবিজয় নাটক।—এখানি বীররসাত্মক ঐতিহাসিকগ্রন্থ। স্থানে স্থানে বীররসোদ্দীপক বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার আগা গোড়া বীররসের ছড়াছড়ি করিয়াছেন। এটি তাঁহার বিশেষ দোষ, হাস্যরস, কি করুণরসের নাম গন্ধও নাই। ইহাও তথাচ মার্জ্জনা করা যাইতে পারে, কিন্তু আদিরসের অভাব দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। এবার যে রৌদ্ররসের প্রখরতা, তাহাতে অন্ততঃ "আনারস" দিলেও কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হওয়া যাইত। যাহাহউক, শান্তশীলের প্রণয়িনীর 'প্রণয়রস' পান করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থকারের বিলক্ষণ রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তি আছে। অতএব আমরা ভরসা করি, তিনি ভবিষ্যতে নাটক লিখিবার সময়, প্রাগুক্ত উপদেশগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।' (শ্রীজ)

—এই প্রস্তাবের লেখক একজন কৃতী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। আমরা সেই হেতু প্রস্তাবটি আদর সহকারে গ্রহণ

করিয়াছি, কিন্তু ইহার অনেক কথার সহিতই আমাদিগের মতের একতা নাই।

আমরা দেখিয়াছি, গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই, যশোলালসার অসহ্য কণ্ডূয়নে অস্থির হইয়া, অগ্রে সমালোচকদিগের চিত্তবিনোদনে যত্নপর থাকেন; পরে যখন দেখিতে পান যে, সমালোচকেরা তাঁহাদিগের আশানুরূপ যশঃকীর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না, তখন ফিরিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। লর্ড বাইরণ, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, 'আলস্যের অবসর' নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দেন। এডিনবর্গ রিভিয়ুর তৎকালীনসম্পাদক, ঐ কবিতাগুলির সমালোচনাপ্রসঙ্গে বিলক্ষণ পরিহাসরসিকতা প্রদর্শন করেন। সে রসিকতাকে মর্ম্মচ্ছেদিনী বলিলেও অসংগত হয় না। বাইরণের তাহা সহ্য হইল না। তিনি অমনি 'ইংলণ্ডের কবি ও স্কটলণ্ডের সমালোচক' ইত্যভিধেয় একখানি খণ্ড কাব্য প্রণয়ন করিয়া মনের সমুদয় বিষ উদ্গীরণ করিলেন।

প্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক বুলওয়ার লিটন, স্বপ্রণীত পলক্লিফর্ড নামক কাব্যে মেকগ্রলার নামে একটি সমালোচককে দণ্ডায়মান করিয়া, তাহার কিরূপ বিড়ম্বনা করিয়াছেন, এবং কত প্রকার সমালোচনপদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই পাঠকবর্গের মনে হইতে পারে।

বর্ত্তমান প্রস্তাবলেখক ও, বোধ হয় দয়াপরবশ হইয়াই, উক্ত মহাত্মাদিগের অনুকরণে বঙ্গীয় গ্রন্থকারবর্গের সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকারদিগের সহিত সমালোচকদিগের বিরোধ কিসে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থকারেরাও জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যরাজ্যের সীমাবিস্তার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিতে অভিলাষ করেন, সমালোচকদিগেরও ইহাই আন্তরিক অভিলাষ। তবে প্রভেদ এই, গ্রন্থকারেরা প্রায়শঃই আপনার যশের জন্য লালায়িত থাকেন। যশোলাভে অধিকার থাকুক আর না থাকুক, আহ্লাদের শিশু যেমন আকাশের চাঁদ ধরিবার জন্য আবদার করে, তাঁহারাও সেইরূপ যশোলাভের জন্য

আকুল হন। সমালোচকেরা, আপনাদিগকে ব্যক্তিবিশেষের যশ কি অপযশের সহিত সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া, সাধারণ সাহিত্যসমাজের যশোরক্ষার্থই সতত সাবধান থাকেন। ইহাতে যদি কাহারও বক্ষঃস্থলে নিদারুণ আঘাত করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। কারণ, তাহা হইলে ব্রতরক্ষা কঠিন হইয়া উঠে।

আজ কাল অনেকেই বাঙ্গালার প্রধান প্রধান সমালোচকদিগকে নিষ্ঠুর বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু যে সকল গ্রন্থকার বিকাশোন্মুখ বঙ্গভাষাকে অধঃপাতের দিকে লইয়া যাইবার জন্য, কালি, কলম, কাগজ, শরীরের বল, সময় ও অর্থের অপচয় করেন, তাঁহারাই প্রকৃত নিষ্ঠুর, না সমালোচকেরা নিষ্ঠুর, ইহা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করা উচিত। বাঙ্গালার যন্ত্রমুখ হইতে বিগত মাসত্রয়ে দুই শতের অধিক পুস্তক উদ্গীরিত হইয়াছে। এই দুই শতের মধ্যে এক মহন্ত ও এলোকেশীর প্রসঙ্গেই চৌদ্দখানা নাটক। যন্ত্রালয় সমূহের, এই উৎপাতজনক সজীবতা, এই অনিৰ্ব্বাৰ্য্য চাঞ্চল্যকে সমাজের উপকারক বলিব, না অপকারক বলিব?

আমরা, প্রস্তাবলেখকের মতে সায় দিয়া, গ্রন্থকারদিগকে শিক্ষক ও সমালোচকদিগকে ছাত্র বলি না। সেইরূপ গ্রন্থকার এখন অল্পই জন্মে, এবং তাদৃশ ব্যক্তিরা গ্রন্থ প্রকটন করিলে, লোকে আপনা হইতেই 'স্বাগতং' বলিয়া, আদর করিয়া, মাথায় তুলিয়া নেয়। এইক্ষণ যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একটা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে, আমাদিগের বিবেচনায় গ্রন্থকারেরা গ্রাম্য ব্যাপারী,আর সমালোচকবৃন্দ আড়তদার। গ্রন্থকারেরা সাহিত্যের হাটে মাল পহুঁচান, সমালোচকেরা দেখিয়া শুনিয়া, পরীক্ষা করিয়া, মাল চালান করেন। গ্রন্থকারেরা তাহা আবার আনিবার সময় আপনা হইতেই বিশেষ সাবধান হইয়া থাকেন। অথবা গ্রন্থকারেরা কুলীন, সমালোচকেরা তাঁহাদের কুলাচার্য্য। কে কুলীন, কে অকুলীন, কার কুল গেল, কার কুল বাড়িল, তাঁহারা তাহা লিপিবদ্ধ করেন।)

(সম্পাদক)

বঙ্গের ইতিবৃত্তঘটিত কথা।

(সাতশতী।)

বল দেখি, ৯৯৯ শকে * যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানপরম্পরায় বঙ্গদেশের সমস্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়াগেল; কিন্তু কি চমৎকার কথা, যাঁহারা সাতশত ঘর ছিলেন, আজি তাঁহাদিগের বংশাবলীর নামগোত্রও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাঁহাদিগের বংশ এককালে লোপ পাইবার সম্ভব নহে। লোপ হইয়াছে বলিলেই কে বিশ্বাস করে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে, তাঁহাদিগের নাম গন্ধ এককালে লোপ পায় নাই। তাঁহারা কান্যকুব্জাগতব্রাহ্মণগণের আগমনে একেবারে হেয় ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনবংশ্যেরা সমাজমধ্যে আপনাদিগকে সাতশতীরূপ ঘৃণিত উপাধিতে পরিচয়দানে লজ্জিত হইতে লাগিলেন; এবং কান্যকুব্জসন্তানগণের কৃপায় তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্তর্ভাব হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা মিশ্রিত হইবার মত গুণসম্পন্ন ছিলেন না, তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিলেন, ও কালক্রমে নবাগত বৈদিক ও বিভিন্ন সম্প্র

---

* আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতী-
শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়য়ামাস।
(কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র।)

ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ
ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ
সমাগতাঃ।
শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ
কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি
স্মৃতঃ।
(কুলদীপিকা।)

দায়িকব্রাহ্মণগণমধ্যে মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে, অধম বর্ণের পৌরোহিত্য স্বীকারপূর্ব্বক বর্ণ ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন; কোথাও বা অগ্রদানী, কোথাও বা গ্রহাচার্য্য, স্থলবিশেষে বিদ্যাবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যাদির প্রভাবে স্বভাবেই আছেন।

যাহাই হউক, কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে, এক্ষণেও যাহারা সাতশতী আছেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে স্পষ্টতঃ সাতশতী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে চাহেন না; তাহাতে লজ্জিত হন। কি দুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয়, কালের কি কুটিলগতি, সমাজগৌরবের কি অত্যাশ্চর্য্য মহিমা, দেখ, সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ পাঁচ জনের সন্তানমধ্যে গৌরবান্বিত হইব বলিয়া, তদীয় দলে ক্রমে লীন হইতেছেন, তথাপি আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন না। ভাবিয়া দেখ দেখি, যাঁহারা উড্ডীন হইয়া আসিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে সর্ব্বে সর্ব্বা; যাঁহারা এখানকার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা এককালে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছেন; রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক, ইহারাই একতম বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের গাঁই গোত্র সংখ্যা করা আছে, সুতরাং সহজে মিসিবার সুযোগ নাই। বৈদিকদিগের গোত্র আছে, গাঁই নাই। সাতশতীদিগের গাঁই গোত্র উভয়ই আছে, অতএব বৈদিককুল বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাঁহাদিগকে ধরা পড়িতে হয়। ইহাঁদিগের এক্ষণে উভয় সঙ্কট ঘটিয়াছে।

সাতশতীদিগের মধ্যে, অদ্যাপি মিশিতে পারেন নাই, অথবা মিশিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাদিগের পরিমাণ অতি অল্প। যথা—পিথুরি, বালথবি, নানকসাই, জগাই, ভাগাই, সাগাই, যবগ্রামী, কাটনীগাঁই, আরথ ইত্যাদি।

সাতশতীগণ পঞ্চগোত্রাতিরিক্ত গোত্রভাগী, সুতরাং ইহাদিগকে ধরিতে পারা যায়। যেহেতু এই সকল গাঁই পঞ্চগোত্রমধ্যে দেখা যায় না, সুতরাং ইহারা সাতশতীব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ নহেন। মুলুকজুরী প্রভৃতি কএকটি গাঁই যে মিশিয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে মুলুকজুরী নামে

একটি দোষ আছে। যাঁহারা ঐ দোষে লিপ্ত হন, প্রথমে তাঁহাদিগের কুল যায় যায় হইয়াছিল। পরে দেবীবর ঘটকের প্রসাদাৎ, তাঁহারা পুনর্ব্বার কুল প্রাপ্ত হন। বুড়োল পরগণাঞ্চলে কাটরাগাঁই, সিংলের কোন অঞ্চলে যবগ্রামী গৌতম গোত্র, বর্দ্ধমানপ্রদেশের লাড় গ্রামের রায়েরা সাতশতী আছেন। ইহাঁরা সাতশতী বলিয়া পরিচয় দেন।

যে প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যে অল্পসংখ্যক সাতশতী আছেন,তাঁহারাও কিছু দিন পরে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, মধ্যশ্রেণী,ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া যাইবেন।

মধ্যশ্রেণী।

মেদিনীপুর ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তি পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে দুই শ্রেণীর লোক অনেক। ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, ইঁহারা মধ্যশ্রেণী.—অর্থাৎ রাঢ়ী বারেন্দ্র, উৎকলে,ও সাতশতী দাক্ষিণাত্যে। বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে,এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, এই প্রকার শ্রেণিবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন,তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধবংশের লোকেরা মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন। তদবধি তাঁহারা সমাজমধ্যে মধ্যশ্রেণী বলিয়া চলিত। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইঁহাদিগের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত। ঋগবেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। যজুর্বেদী নিতান্ত বিরলপ্রচার।

ইঁহাদিগের গোত্র আছে, সকলের গাঁই নাই। পুরুষের প্রকৃতি ধরিয়া ইঁহাদিগের গাঁই ধরা যায়। ইঁহাদিগের প্রথমসংমিশ্রণকালে পুরুষের যে গাঁই ছিল, তাঁহার সন্ততিরা সেই গাঁই বলিয়া পরিচয় দেন। যেস্থলে পুরুষের গাঁই ছিলনা, অর্থাৎ বৈদিকপুরুষে অথবা পশ্চিমা ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাঢ়ীয়া বরেন্দ্র কন্যার বিবাহ হইয়াছে, তথায় তাঁহাদিগের সন্ততিরা গাঁই পান নাই।

ইঁহারা আপনাদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক কৌলীন্য রাখেন নাই। সদাচার ও সৎক্রিয়াসম্পন্ন ব্যক্তিকে মর্য্যাদাপন্ন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিই কৌলীন্যগৌরব প্রদান করিয়া থাকেন।

তথাপি, প্রথম পঞ্চ গোত্রের সন্তানের প্রতি ইঁহাদিগেরও আস্থা ও পূজা অধিক দেখা যায়। সুতরাং শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চজনেরই সম্মান অধিক।

ইঁহারা কহেন, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানদিগের মধ্যে যৎকালে সংগ্রাম হয়, তৎকালে ঐ প্রদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে সমর্থ হন নাই, এবং বিদেশীয়েরাও ঐ প্রদেশে আসিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীদিগের একপ্রকার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রেণিবন্ধনশৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট হয়, এবং সর্ব্বত্র বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, এবং সকলেই বৈদিকব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। তৎকালে যাঁহারা শ্রেণি বন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্বান্, তেজস্বী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরমমান্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে এদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল-প্রতাপ-তপন অস্তমিত হইল। বিবাহভঙ্গরূপ তদীয় কীর্ত্তিকোকনদ ম্লান হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ এদেশে বিকীর্ণ থাকিলে, মধ্যশ্রেণীরই শোভা অধিক হইত। তখন সকলেই কহিত, আমরা বৈদিক। ইঁহারাই কি এখনকার মত মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দিতে যাইতেন? কদাচ সম্ভব বোধ হয় না।

ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ।

এদেশে যাঁহারা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই, অথচ স্বদেশেও সমান ঘরে, সমান বরে, আদান প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন না, এবং এদেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের পরস্পরের ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত নাই, তাঁহাদিগকে ঔপনিবেশিক বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ কহা যায়। ইঁহারা প্রায় দোভাষী, এবং বাঙ্গালিপরিচ্ছদ ও হিন্দুস্থানি পরিচ্ছদের মধ্যবর্ত্তী একপ্রকার দোরোকা পরিচ্ছদে আপনাদিগকে শোভিত করেন। ইঁহারা আপনাদিগের জ্ঞাতি, কুটুম্ব ; স্ত্রী পরিজনদিগের সঙ্গে অনেক সময়ে হিন্দী কথা কহেন, এবং বাঙ্গালিদিগের সঙ্গে বিষয় কার্য্যানুরোধে সর্ব্বদা বাঙ্গালা কথা কহেন। ইঁহারা যথায় বাঙ্গালি পুরোহিত ও গুরু গ্রহণ করিয়াছেন, তথায় এদেশীয়দিগের আচার,ব্যবহার অনুসারে চলেন।

তথায় ইঁহাদিগের আচারব্যবহারের সহিত রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিকাদির আচার ব্যবহারের বিশেষ অনৈক্য দেখা যায় না। যে স্থলে ইঁহাদিগের পুরোহিত পশ্চিমা, আচার্য্য গুরু পশ্চিমা, তথায় তথায় ইঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণসন্ততির ও বৈদিকদিগের আচার ব্যবহারের বিস্তর অনৈক দেখা যায়। ইঁহারা বৈদিক কার্য্যে নিতান্ত অনুরক্ত, তান্ত্রিক কার্য্যে তাদৃশ যত্নবান্ বলিয়া প্রতীত হন না।

স্থলবিশেষে, তান্ত্রিক গুরুর কথা দূরে থাকুক, বৈদিকমন্ত্রে উপাসনার পর তান্ত্রিকমন্ত্রের আবশ্যকতাই স্বীকার করেন না। ইঁহাদিগের মতে গায়ত্রী-উপদেষ্টা আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ। উহাই ব্রহ্মমন্ত্র। যাঁহাদিগের সাবিত্রীগ্রহণে অধিকার নাই অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও শূদ্র জাতির জন্যই তন্ত্রের সৃষ্টি, এই কথা কহেন। তদনুসারে অনেক পুরুষের একমাত্র আচার্য্যই গুরু বলিয়া গণ্য। তবে স্থলবিশেষে, কোন আচার্য্য তান্ত্রিক কার্য্যে পটু নাহওয়ায়, স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্রগ্রহণজন্য কোন কোন পরিবারকে এদেশীয় তান্ত্রিক ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। কালক্রমে গুরু ও শিষ্যের সন্তানে সৌহার্দ্দসূত্রে, পুরুষগণমধ্যে তান্ত্রিকমন্ত্রের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু তথায়ও আচার্য্যের মান খর্ব্ব হয় নাই। উপনিবেশিকমধ্যে সারস্বত, কান্যকুব্জ, পাঞ্জাবী, শৌরসেণী মৈথিল, সকলদিপী প্রভৃতি অধিক। কোন কোন স্থলে দ্রাবিড়ী,মাগধী,মাথুরী,কামরূপী ও উড়িয়াও দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইঁহাদেরমধ্যে দোবে,চোবে,তেওয়ারী, পাঁড়ে, মিশ্রী,ত্রিপাঠী,ত্রিবেদী,সবপীথী শুক্ল, রাজপেয়ী,অগ্নিহোত্রী, দশাশ্বমেধী প্রভৃতি উপাধি আছে।

ইঁহারা কখন আসিয়া উপনিবেশ গ্রহণ করিলেন, কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। তথাচ এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইঁহারা শাস্ত্রীয়চর্চ্চা বা বৈদিকক্রিয়া, কলাপের অনুষ্ঠান প্রচার জন্য এদেশে আইসেন নাই। ইঁহারা বিষয়কার্য্য ব্যপদেশে এদেশে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তদুপলক্ষে শ্রীমন্ত হইলেন, অন্ন সংস্থান হইল, লোকের

সঙ্গে সদ্ভাব হইল, অর্থের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা মায়া বাড়িল। বঙ্গীয় সুস্বাদু অন্ন পানীয়ের আস্বাদ বুঝিতে পারিলেন। তখন মায়াজালে বদ্ধ হইলেন। ক্রমে জন্মভূমির প্রতি বিতৃষ্ণা হইতে লাগিল। কালক্রমে সন্তানসন্ততির বসতি হইয়া গেল। ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালি ভাবাপন্ন হইলেন। তখন ইঁহাদিগকে আর কে তদ্দেশীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে? ইঁহারা বাঙ্গালিমধ্যে পরিগণিত হইলেন। শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে তাদৃশসম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই, ইঁহারা সমাজমধ্যে প্রাধান্যসংস্থাপন করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। নতুবা ইঁহারা দশজনের মধ্যে একজন হইতেন।

এই সকল ব্রাহ্মণগণমধ্যে দ্বিচত্বারিশদ্‌গোত্র আছে। এই বিয়াল্লিশটি গোত্র ব্যতীত ব্রাহ্মণাদির মধ্যে আর গোত্র নাই। যে গোত্রের সহিত যাহার সাদৃশ্য আছে, তাহার সম্বন্ধ নিম্নলিখিত গোত্র ও প্রবরের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়। (শ্রীলালঃ)

(ক্রমশঃ।)
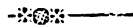
আমরা কিরূপ সভ্যতা অবলম্বন করিব।

সভ্যতা বা সামাজিক উন্নতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ও ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। একসময়ে একদেশে যেরূপ আচারব্যবহার, রীতিনীতি, রাজধর্ম্ম ও প্রজাব্যবহার উৎকৃষ্ট ও উন্নত বলিয়া পরিগণিত হয়, অন্যসময়ে সেই দেশে কিংবা অন্যদেশে, সেইপ্রকার আচার ব্যবহার ইত্যাদি তদ্রূপ গণ্য হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকে ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরুদ্ধ আচারব্যবহার ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করে, এবং তৎসমুদয় জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা পায়।

মনুষ্যেরমন কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা ও তৎসমুদয়ের তৃপ্তিসাধনোপযোগি শক্তি ও তেজের আধার। সঙ্গীত, সাহিত্য বা সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি, ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা, এবং সেই সম্ভোগলাভোপযোগিনী চেষ্টার প্রনোদকপ্রবৃত্তি, মনুষ্য মনের একটি প্রধান অঙ্গ। সংখ্যা ও ব্যাপ্তিবিষয়ক তত্ত্ব

এবং ভৌতিকপদার্থের প্রকৃতি ও শৃঙ্খলা, গুণ ও কার্য্যের নিয়ম, ইত্যাদি সম্বন্ধীয় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা; তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের স্পৃহা; এবং সেই জ্ঞান লাভ দ্বারা ভৌতিক জগতের উপর কর্তৃত্বস্থাপন করিবার প্রবৃত্তি, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিসম্বন্ধীয় আর একটি প্রধান অঙ্গ। আত্মসুখ সাধন ও সংসারিক উন্নতির বাসনা; পরিবার, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসি জনগণের মঙ্গলসাধনস্পৃহা; এবং এই সমুদয় প্রবৃত্তি সম্ভূত জীবনসংগ্রামে জয় লাভ করিবার উপযোগী উদ্যম ও বীর্য্য, মনুষ্যমনের আর এক অঙ্গ। বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বগণের সংসর্গলিপ্সা; তাঁহাদিগকে লইয়া সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন পূর্ব্বক তজ্জনিত শান্তিরসাশ্রিত-সুখভোগপ্রবৃত্তি; তদুপযোগিকোমলতা, মৃদুতা, মমতা ও হিতৈষণাপ্রভৃতি গুণ; এবং কল্পনার ক্রীড়াভুমিস্বরূপ ধর্ম্মনীতি ও দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা স্বপ্নোপমচিন্তাসুখ-ভোগ-বাসনা, ইত্যাদি মনুষ্যমনের আর একটি প্রধান অঙ্গ।

মনুষ্যমনের এই সমস্ত প্রবৃত্তি ও গুণের সহিত বাহ্যজগতের অতি নিকট সম্বন্ধ। আকাশ, পর্ব্বত, অরণ্য, প্রান্তর বা নদীর শোভা, উষ্ণত্ব ও শীত-পরিমাণ, ভুমির উৎপাদিকাশক্তি, ইত্যাদি বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয়। রাজনিয়ম, সমাজবন্ধনপ্রণালী, ব্যবসায় ও বাণিজ্য ইত্যাদির তারতম্যবশতঃ লোকসমাজের মনোবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন দিকে অধিকতর বেগের সহিত চালিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মযাজক, নীতিকার ও পণ্ডিতমণ্ডলীও, লোকের শিক্ষার ও আলোচনার স্রোত ভিন্ন ভিন্ন দিকে চালিত করিয়া, সভ্যতার স্রোত অনেক অংশে সেই সেই দিকে প্রেরণ করিতে পারেন।

প্রাচীন আর্য্যজাতির সভ্যতা পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। সেই জাতির সমকালীন কালডীয়, ফিনীসীয়, আসীরীয় ও ইহুদীজাতির এবং মিশর ও চীন দেশের, প্রাচীনসভ্যতাবিষয়ে ইতিহাস অনেক অংশে নিস্তব্ধ। সুতরাং আর্য্যজাতির সভ্যতার সহিত ঐ সমুদয় দেশের সভ্যতা তুলনা করিবার

বিশেষ উপকরণ নাই। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের সভ্যতা অনেক অংশে প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্ভূত সভ্যতার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। যে প্রকার অবস্থায় এই কয় জাতির সভ্যতা উদ্রিক্ত হয়, তাহা অনেক অংশে একরূপ ছিল বলিয়াই. তাহাদিগের সভ্যতার প্রকৃতিও প্রায় একরূপ।

ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ। ইহার উত্তরাংশ অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত শৈত্যোষ্ণতাসম্বন্ধে মধ্যাবস্থ। এ দেশ স্বভাবতঃ অত্যন্ত উর্ব্বর। অন্নপূর্ণা বসুন্ধরা অশেষবিধ সুখাদ্য ফল মূল সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যৎসামান্য যত্ন করিলেই, প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার্য্য, কৃষিজাত ও খনিজ পদার্থ আহরণ করা যায়। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি স্রোতস্বতী প্রশস্ত ক্রোড় প্রসারণ পূর্ব্বক গতায়াতের যৎপরোনাস্তি সুবিধা করিয়াছে। অসামান্য শোভাসম্পন্ন পর্ব্বত, সমভূমি, অরণ্য, সুবিমল অথবা বিচিত্রবর্ণমেঘবিশিষ্ট আকাশ সর্ব্বদাই মনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

প্রাচীন আর্য্যজাতি এরূপ দেশে বসতি স্থাপন করিলে পর, অনায়াসে সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক সামগ্রীর প্রাপ্তি-নিবন্ধন, চতুষ্পার্শ্বস্থ অসামান্য শোভা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগের স্ফূর্ত্তিযুক্ত মন, কবিতারসপানে অধিকতর আগ্রহের সহিত লিপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃতি স্বকীয় গর্ব্ভনিহিত ঐশ্বর্য্যনিচয় মনুষ্যের আবশ্যক হওয়ামাত্র সহজেই প্রশস্ত হস্তে দান করিয়াছেন বলিয়া, প্রকৃতির সমুদয় অংশ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ভৌতিক জগতের উপর মনুষ্যসমাজের কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিবার আবশ্যকতা তখন বিশেষরূপে উপস্থিত হয় নাই। সমাজের সমুদয় লোকই তৃপ্তস্পৃহ ও সন্তোষ-পরিপূর্ণ ছিলেন বলিয়া,কোন ব্যবহার্য্য সামগ্রী লইয়া পরস্পরের সহিত বিসংবাদ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। অভাবপূর্ণ দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি, স্ব স্ব জীবনধারণোপযোগি সামগ্রী আহরণ করিতে গিয়া, পরস্পরের সহিত যে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, আর্য্যজাতির ঐ অবস্থাতে সেই জীবন-সংগ্রাম প্রচুররূপে উপস্থিত হইতে পারে নাই। সমাজের প্রত্যেকব্যক্তির সকলপ্রকার সাংসারিক অভাব

যখন সহজেই পরিপূর্ণ হয়, তখন মনে সাংসারিক উন্নতির স্পৃহা ভালরূপে উত্তেজিত হয় না। সেই অবস্থায় লোকের মনে স্বার্থসম্বন্ধে উদ্বেগ ছিল না বলিয়া,তাঁহারা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও সদ্ব্যবহারে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া, মিষ্টালাপও শিষ্টাচারের শান্তিরসামৃতভোগে কালযাপন করিতেন।

অনায়াসলব্ধ বস্তু সহজেই পরিত্যাগ করা যায়। এইহেতু প্রাচীন আর্য্যদিগের মনে কিঞ্চিন্মাত্র সাংসারিক যন্ত্রণা বা উদ্বেগের সঞ্চার হইলেই, ত্যাগের ভাব ও বৈরাগ্য অমনি উপস্থিত হইত। ব্রাহ্মণেরা সংসারের সমুদয় সম্পদ ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ ও শাস্ত্রালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। ক্ষত্রিয় রাজপুরুষেরা, রাজভোগলালসায় নহে, কিন্তু রাজনীতিপ্রতিপালন ও ক্ষত্রিয়ের জাতীয়ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই, রাজ্যশাসন, শিষ্টপালন ও যুদ্ধ করিয়া আততায়ী নিবারণ করিতেন। তাঁহারা, এই সমুদয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের শাসনাধীনে আনিয়া, এমন আশ্চর্য্য রাজনীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর কুত্রাপি তদ্রূপ ভাব দৃষ্ট হয় না।

বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকল শ্রেণির লোকেই, স্ব স্ব বংশের বা পরিবারের অবলম্বিত ব্যবসায় অনুসরণ পূর্ব্বক, ধর্ম্মোপাসনার ন্যায় তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন,এবং অল্প পরিশ্রমদ্বারা নিজের ও পরিবারের সমুদয় অভাব নিরাকরণপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে সুখ ও স্বচ্ছন্দতাতে জীবনাতিপাত করিতেন।

স্বার্থশূন্যতা, বৈরাগ্য ও পরিতৃপ্তি এই সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ ছিল। এই দৃঢ় ও বলবিধায়ক ভিত্তির উপর মূল স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মরূপ অত্যাশ্চর্য্য মহীরূহ উত্থিত হইয়াছিল। এই সভ্যতার চরমউদ্দেশ্য ও শেষ ফল শান্তি।

(শ্রীদীঃ)—

(ক্রমশঃ)

———০০০———

বাঙ্গালির সুখ।

১

বাজিছে মুরলী সুমধুর তানে,
বীণার মাধুরী প্রবেশিছে কানে,
গুঞ্জরিছে অলি বঙ্গীয় উদ্যানে,
আহা কি মধুর মধুর রবে।
বসন্তের পিক কুহরিছে ধীরে,
ধীরে ধীরে বহি দক্ষিণ সমীরে,
নব জলধর ধ্বনিছে গম্ভীরে,
মরি কি মধুর মধুর রবে॥

২

আহা কি সুখের কুসুমের বাস,
শ্যামল আকাশে সুধাংশু বিলাস,
সুখের সকলি সুখের আবাস,
সুখ অপ্রবাস, পুরাণ বাণি।
সুখের শ্যামল বিটপি সকল,
সুখদ সুস্বাদু সুধাসম ফল,
নদ নদী বহে নিরমল জল,
সুখের সামগ্রী দিতেছে আনি॥

৩

আহা মরি মরি কি মধুর রবে,
হোতেছে সঙ্গীত শুনিতেছে সবে,
আর কি বাঙ্গালি কাঙ্গাল রহিবে,
দাও করতালি সঘনে দাও।
রাজার আদেশ বাজাও ভেরি
বাজাও দুন্দুভি দশদিক পুরি
ওই দেখ বঙ্গে সুখের লহরি,
আবার বলিছে ভেরি বাজাও॥

৪

বঙ্গ হৃদি মাঝে সুখের লহরি,
উঠিছে খেলিছে কতলীলা করি,
সুখের হিল্লোলে ভাসাইয়া তরি,
হের বঙ্গবাসি হল মগন,
সুখ যারে বলি এই সেই সুখ,
সুখে সকলের ঢল ঢল মুখ,
নিরখিবে যদি স্বচক্ষে এ সুখ,
ছাড় চিন্তা ছাড়, মেল নয়ন॥

৫

আবার সঙ্গীত মিষ্ট তান লয়ে,
দেখিবে কি ? এস ধনীর নিলয়ে,
দুলিছে পিঞ্জর স্ফটিক বলয়ে,
আবরি সুন্দর শ্যামার দেহ।
দেখ দেখ ওই দুলিছে বীজন,

ছুলিতেছে ঝাড়　　বালসি নয়ন,
দেশীয় আলোক　　আলোহীন হয়ে,
অনাদর ভয়ে ত্যজেছে গেহ ॥

৬

বিলাতি আসন　　বিলাতীয় যান,
বিলাতি পোষাক　　বিলাতি নিশান,
দেশে যাহা ছিল　　কোথা তাহে মান,
বৃটন সকল　　সুখের হেতু ।
ধন্য ধন্য জয়　　জয় বৃটনিয়া,
আশাতীত সুখ　　দিতেছে আনিয়া,
ধর রে বাঙ্গালি　　গরব মানিয়া,
উড়াও বঙ্গেতে সুখের কেতু ॥

৭

বাঙ্গালি অসুখী　　একথাটি ভুল,
কিছুর ই ত নাহি　　দেখি অপ্রতুল,
দীপের শলাকা　　খেলার পুতুল,
যোগায় বৃটন যা তুমি চাও ।
দেশে যাহা ছিল　　দাও দূরে ফেলে,
দেশের মমতা　　ফেল পায়ে ঠেলে,
বিলাতীয় সুখ　　স্বদেশে কি মেলে,
জয় বৃটনিয়া জয় জয় গাও ॥

৮

বাঙ্গালির দেহে　　বাড়াইতে বল,
লঙ্ঘি নদ নদী　　সাগর অচল,
শরীরের রক্ত　　শ্রমে করি জল,
যোগায় বৃটন　　মদিরারাশি ॥
স্ফাটিক গেলাসে　‘ ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল ’
দুখের যামিনী　　রবে কতকাল,
‘ ঢাল ঢাল ব্রাণ্ডি　　আর বার ঢাল ’
সুখের তরঙ্গে　　যাইবে ভাসি ॥

৯

অমর বাঞ্ছিত　　এই সুধারাশি,
সুখে পানকর　　বঙ্গ-অধিবাসী,
ধর রে গেলাস　　মৃদু মৃদু হাসি,
ধর, নিভে যাবে দুখ দারুণ ।
সুখ যারে বলে　　এই সেই সুখ,
সুখে সকলের　　ঢল ঢল মুখ,
নিরখিবে যদি　　স্বচক্ষে এ সুখ,
ছাড় চিন্তা ছাড় মেল নয়ন ॥

১০

আবার সঙ্গীত　　হইল নিভৃতে,
ভেদিয়া পশিল　　চিন্তা-রত-চিতে,
চিরদুখী আর　　কে আছে মহীতে,
বাঙ্গালির মত হায় হায় হায় !
বাঙ্গালির মান　　বৃথা অভিমান,
সুখের অমৃত　　গরল সমান,
সকলি আঁধার　　সকলি শ্মশান,
মরমের দুখ　　বলিব কায় ॥

(প্রতিধ্বনি ।)

তুমি কার ?

প্রাচীনাদিগের মুখে, ছোটবেলায়, উপকথায় শুনিতাম, কোন এক রাজকুমার, কি কোন এক মন্ত্রিকুমার, মনের সুখে পাদচারে বিচরণ করিতে করিতে, রাজপথপ্রান্তে দৈবাৎ একটি অপূর্ব্বদৃশ্য অঙ্গুরীয় দর্শন করিতে পাইলেন। বড় আদর করিয়া,হাতে তুলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অঙ্গুরীয় ! তুমি কার ? সেকালে তরু, লতা, গিরি, নদী, বনের ফুল, অঙ্গের আভরণ, সকলেই কথা কহিতে পারিত। অঙ্গুরীয় মৃদুমধুস্বরে উত্তরকরিল,—পূর্ব্বে ছিলাম রাজনন্দিনীর, এক্ষণ তোমার।

পাঠক ! যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কার ? তুমি একথায় সরলহৃদয়ে কি উত্তর দিবে, বল। তুমি কি যখন যার হাতে থাক, তখন তার ? ছি ! ছি ! এমন কথা মুখেও আনিও না। তাহা হইলে, ঐ যে অচেতন অঙ্গুরীয়, উহার অপেক্ষায় তোমাকে সচেতন বলিব কেন ? তবে কি তুমি, অভিমানভরে মোহনগ্রীবায় মোহনতর ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া, নয়ন বাঁকাইয়া বলিবে, ' আমি আমার '।

আমি একথায় প্রত্যয় করি না। তুমি যে তোমার, তাহার নিদর্শন কোথায় ? তোমার শরীর ক্ষণে ক্ষণে নূতন পরিবর্ত্তনের অধীন হইতেছে ; তুমি নিবারণ করিতে পারিতেছ না। তোমার শৈশবের শরীর যে সকল পরমাণু দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, যৌবনে তাহার একটিও বিদ্যমান নাই। এবং যৌবনের এই লাবণ্যতরঙ্গায়িত কমনীয় কলেবরে, যে সকল ভৌতিকপদার্থ রূপের ডালি সাজাইয়া রাখিয়াছে, বার্দ্ধক্যের অসহনীয় শীত ঋতুতে ইহার কিছুই বিদ্যমান থাকিবে না।

ভূত ও ভবিষ্যতের কথা পরিত্যাগ কর ; বর্ত্তমান ক্ষণেও ত তোমার শরীরকে তোমার বলিতে পারিতেছি না। এই অনিশ্চিত ইজারার স্বত্ব কখন তোমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, তাহা তুমি জান না। রোগ নিঃশব্দপদসঞ্চারে সতত তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলি-

তেছে, তুমি দেখিতেছ না। তুমি যাইতে চাও, পা চলে না ; তুমি বসিতে চাও, পা উঠি উঠি করে ; তোমার কর্ত্তৃত্ব কোন সময়েই মানে না। তুমি রসনাকে শাসন কর,মুখরা রসনা, মনের ভাল ও মন্দ কত কি কথা, মুখরা গৃহিণীর ন্যায়, লোকের নিকট কহিয়া ফেলে। তুমি, যার কথা শুনিবে না বলিয়া, মনে শত বার সংকল্প কর ; অবাধ্য কর্ণ, তার কথা শুনিবার জন্যই, সতত পিপাসু থাকে। তুমি চক্ষুকে যে পথে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কর ; চক্ষু, যেন তোমাকে অবহেলা করিয়াই, সে পথে যাইতে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে। তুমি অনেক সময়ে অশ্রুসংবরণ করিতে যত্নশীল হও, অথচ অবারিত অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। আবার, তুমি কাঁদিতে চাও, কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিতে ইচ্ছা কর ; চক্ষু কাঁদিব না বলিয়া, ফিরিয়া বসে। শত চাও,শত অনুনয় কর,এক ফোঁটা জলও বর্ষণ করিয়া, তোমার তুষানলদগ্ধ ভস্মীভূত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে না।

শরীর যদি তোমার না হইল, তবে কি হৃদয় ও মনকে তোমার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে ? যদি তাহা কর, তবে আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিব না। কেন হাসিব, তাহা তুমিও বুঝিতেছ, আমিও বুঝিতেছি ; অথচ কেহই মনের মর্ম্মকথা মুখ ফুটিয়া কহিতে পারিতেছি না।

এসংসারে, মানুষীর গর্ব্ভে জন্ম ধারণ করিয়া,কে কবে আপনার হৃদয় ও আপনার মনকে,আপনার বলিয়া বলিতে পারিয়াছে,তাহা গভীরভাবে ক্ষণকাল চিন্তা কর। তোমার হৃদয় যদি তোমার হইল, তবে পরের জন্য নিয়ত পুড়িয়া মর কেন ? পরে হাসিলে, তুমি হাস ; পরে কাঁদিলে, তুমি কাঁদ। সপ্ততন্ত্রী যন্ত্রের মত, তোমার হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে ; আর যার সাধ হয়, সে ই, উহাতে এক গদ বাজাইয়া, কিছুকাল আমোদ করিতেছে। স্রোতস্বতীর চিরচঞ্চল তরঙ্গখেলার ন্যায়,তোমার হৃদয়োত্থিত ভাবময়ী তরঙ্গমালা, এই পূর্ব্ববাহিনী, এই পশ্চিমবাহিনী। অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনা, অনুকূল ও প্রতিকূল সমীরণের ন্যায়, প্রতিক্ষণেই উহার সহিত পরিহাস করিতেছে। তুমি,দেখিয়া, নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছ।

ক্ষমতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ঐ তরঙ্গচাঞ্চল্যে আপনি হাবু ডুবু না খাও, এই ভাবনা ভাবিয়াই তুমি অস্থির থাক।

তোমার হৃদয় কোন্ সময়ে ঘরে থাকে, তাহা কি তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ? তোমার শরীর এখানে, তাহা দেখিতেছি। কিন্তু তোমার হৃদয় কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, বৃন্দাবন, সিংহল, জাপান, আমেরিকা কি নক্ষত্রলোক, ইহারই কোথাও বিচরণ করিতেছে। হয় ত, গতকল্য সেই যে একটি সুন্দর বালক দেখিয়াছিলা, দেখিয়া অবধি যাহার সারল্যশোভিত মুখচ্ছবি এবং হাসো হাসো চক্ষু দুটি মুহূর্ত্তের তরেও পাসরিতে পার নাই; তাহার কাছেই তোমার হৃদয় ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছ। হয় ত, সে দিন রায়দের প্রমোদকাননে একটি নবপল্লবিত মাধবীলতা দেখিয়া, ক্ষণকাল বসিয়া কি যে ভাবিয়াছিলা, আর আধ আধ হাসিয়াছিলা, আসিবার সময় হৃদয়টি সেখান হইতে আর আনিতে মনে হয় নাই। অথবা হয়ত, কে তোমায় বঞ্চনা করিয়া, উহাকে কোথায় নিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা অদ্যাপি তুমি বুঝিতে পার নাই। তুমি অন্ধের ন্যায়, এদিকে, ওদিকে, হাত ফেলিতেছ, আর ঘুরিতেছ; সে দূরে থাকিয়া, দেখিয়া দেখিয়া, হাসিতেছে। তবে, এ হৃদয় তোমার হইল কিসে?

তোমার হৃদয় যদি তোমারই হইবে, তাহা হইলে, তুমি যখন, ভয় করিব না বলিয়া, বারংবার সংকল্প কর; তোমার হৃদয় তখন থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে কেন কাঁপিয়া উঠে, বল। হৃদয় কোন কালে তোমার ছিল? যখন তুমি শিশু ছিলে, তখন যে তোমায় মিঠামুখে সম্ভাষণ করিয়া দুটা মিঠাকথা বলিয়াছে, আর একটা কিছু খেলার সামগ্রী দেখাইয়াছে, তোমার হৃদয় বংশীনাদমুগ্ধ অবোধ মৃগের ন্যায়, তখন তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়াছে। তুমি এখন যুবা হইয়াছ। এখনকার কথা আমি বিশেষ কিছু বলিব না; কেননা তোমার বুদ্ধি বিকসিত হইয়াছে এবং হৃদয়ই হৃদয়ের ভাব অনুভব করিতে পাইতেছ। যদি জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে তোমার অন্তরে, হয় আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে, না হয়, ধারায় অমৃত-বৃষ্টি হইবে। বা-

র্দ্ধক্যে এ হৃদয় তোমার থাকিবে কি না, উহার বর্ত্তমান লীলাতরঙ্গ দর্শন করিয়া, তুমিই তাহা বিবেচনা করিতে পার।

পাঠক! আমি তোমার শরীর ও হৃদয় সম্বন্ধেই দুটিমাত্র কথা বলিলাম। তোমার বুদ্ধি, তোমার মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুই বলিলাম না। ইহার কোনটি তোমার, ও তুমি কার, তাহা বিচার্য্য রহিল। কিন্তু তোমার হৃদয়যন্ত্রের যে স্থান স্পর্শ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, যদি তুমি ভাবুক হও, তবে তোমার মনে অনেক ভাব ও অনেক ভাবনার উদয় হইবে। হে সৌম্য! তোমায় আজ অবসর দিলাম। কিছুদিন পরে, তোমায় আবার জিজ্ঞাসা করিব,—মনুষ্য! তুমি কার?

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসমালোচনা।

শ্রীশুক্লযজুর্ব্বেদঃ, বাজসনেয়ী সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা। কাশ্যধীতবেদাদিশ্রীসত্যব্রতসামশ্রমিণা সংটিপ্য, সংশোধ্য চ প্রকাশ্যতে।

বেদবিদ্যাবিষয়ে, বঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজ চিরদিনই অনভিজ্ঞ। বোধ হয় সরস্বতীর অভিসম্পাত আছে। এ দেশের অতিপূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণেরা বেদ ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপ জানিতেন না। এই হেতু, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বঙ্গে আনয়ন করেন। মৃত্তিকার এমন মহিমা, যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আসিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণও কালক্রমে বেদশিক্ষাবিষয়ে নিতান্ত বিমুখ ও একান্ত উদাসীন হইলেন। অধিক আর কি, অধুনাতন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে গায়ত্রীর অর্থও অবগত নহেন। উদাত্তাদিস্বরসংযোগে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে এদেশের কোন ব্রাহ্মণই সক্ষম নহেন, একথা বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহা তাঁহাদের কলঙ্কের কথা। অপার কলঙ্ক।

এদেশে বেদের প্রধান চর্চ্চাস্থান বারাণসী, আর ইয়ুরোপে জর্ম্মণী। বারাণসীর পণ্ডিতেরা বেদকে সাধার-

নের ভোগ্যসামগ্রী করিতে যত্নশীল হন নাই। বঙ্গীয় সুশিক্ষিতসম্প্রদায় ইদানীং বেদের দুচারি কথা যাহা শুনিতেছেন, শিখিতেছেন, ও লোকসমাজে প্রচার করিতেছেন, তাহা জর্ম্মণীর প্রসাদাৎ। ইহাও আর এক কলঙ্ক।

প্রত্নকম্রনন্দিনীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমি মহাশয় এই দুরপনেয় কলঙ্ক অপনোদন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা এই হেতু তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া অভীপ্সিত মহৎকার্য্য সুসমাপন করুন, এই আমাদিগের আন্তরিক অভিলাষ; এবং তাহা হইলে বঙ্গীয় গ্রন্থালয়ের কত গৌরব বাড়িবে, তাহা বলিতে পারিনা। এদেশে যাঁহারা আর্য্যনামের অহংকার করেন, তাঁহারা অবশ্যই সর্ব্বতোভাবে সামশ্রমিমহাশয়ের আনুকূল্য করিবেন।

সামশ্রমিমহাশয় মূলের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া আরও ভাল করিতেছেন। পূর্ব্বে এদেশীয়েরা কাশীরামদাসের পুঁথি ও পাঠকদিগের মুখে যাহা শুনিত, তাহাই প্রকৃত মহাভারত বলিয়া মানিয়া লইত। চিরস্মরণীয় কালীপ্রসন্নসিংহ সেই অভাব দূর করিয়াছেন। যিনি বাঙ্গালায় সমগ্র বেদ সংকলন করিবেন, তিনি তদপেক্ষাও মহত্তর কার্য্য সাধন করিবেন, সন্দেহ নাই।

হেমনলিনী। বিয়োগান্ত নাটক। শ্রী উমেশচন্দ্রগুপ্ত প্রণীত।

উমেশ বাবু গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে নাটকলখাকে নিতান্ত দুরূহ কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজিতে ভাল নাটক পড়িয়াছেন, তাই একথা বুঝিয়াছেন। অনেকে ইহা বুঝে না। তাঁহার নাটক খানি পাঠ করিবার সময় অনেক স্থলে সুখানুভব হয়। কিন্তু তিনি যাদৃশ গ্রন্থকে নাটকসংজ্ঞা প্রদান করেন, ইহা সেই শ্রেণিতে পরিগণিত হইতে পারে কি না, সংশয়ের বিষয়। আমাদিগের বিবেচনায় বাঙ্গালায় ভাল নাটক নাই। উমেশ বাবু এই কাহিনীটিকে, কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া, উপন্যাসের আকার দিলে, ইহা হইতে অধিক মনোজ্ঞ হইত।

শিক্ষানবিশের পদ্য।—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া, কদমতলা, সাধারণীযন্ত্রে মুদ্রিত।

গ্রন্থকার যে ভঙ্গিতে এই কাব্যখানির পরিচয়পত্রিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি ইহার বড় একটা অধিক গৌরব করেন নাই। কিন্তু আমরা ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত আদর করিয়া পড়িয়াছি, এবং তাই বলিতে পারি, বুদ্ধিমান্ ও রসজ্ঞ পাঠক ইহার অনেক স্থলেই নিতান্ত গৌরবের সামগ্রী প্রাপ্ত হইবেন। ইহার কতকগুলি কবিতা বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে সে গুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন। বায়রণের কবিতায় কি এক অপূর্ব্ব মাদকতা আছে, তাহা যাঁহারা বায়রণ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। দুর্ব্বল বাঙ্গালা ভাষায় সে মদিরা ঢালিয়া দেওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু অক্ষয় বাবু এ বিষয়ে অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা। যে কয়টি কবিতা, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিজস্ব, তাহাতেও সুন্দর কবিত্বশক্তি ও শব্দবিন্যাসপারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য কাননে একটি নূতন কোকিল। তাঁহার কণ্ঠলহরীতে একটুকু নূতনত্ব আছে। অন্যের তাহা নাই। পাঠকসমাজ ক্রমেই সেই নূতনত্বের পরিচয় পাইয়া সুখী হইবেন। বাঙ্গালাভাষা অনেকের গৃহে দন্তহীনা বর্ষীয়সীর ন্যায়, শ্রুতিকঠোরস্বরে আলাপ করেন। অক্ষয় বাবুর বাঙ্গালা, সর্ব্বথা শুদ্ধচারিণী হইয়াও, সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা নবীনার ন্যায়, অভিমানিনী অথচ মিষ্টভাষিণী, চঞ্চলা অথচ চিত্তহারিণী।

বরদাচরিত। অর্থাৎ বনিতা-বিয়োগ-বিলাপ।—শ্রীজগচ্চন্দ্রবসুপ্রণীত। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। স্ত্রীবিয়োগহেতু মনে যে সকল দুঃখের কথা উঠিয়াছে, তিনি তাহা গ্রন্থবদ্ধ করিয়া ৶১০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। আমরা এই গ্রন্থের প্রশংসাও করিব না, নিন্দাও করিব না। প্রশংসা করিব না, কারণ গ্রন্থকার কিছু প্রশংসালিপ্সু হইয়া বিলাপ করেন নাই। নিন্দা করিব না, যেহেতু ব্যথিত চিত্তে ব্যথা দেওয়া দোষ। তবে প্রশংসা বা নিন্দা, যে ভাবে যে গ্রহণ করুন, এ কথা আমরা বলিতে পারি যে, বিলাপের স্থানে স্থানে

অনুপ্রাস ও যমক আছে। যথা—

"কত কটু বলিয়াছি করি লেখা লেখা।
কেজানে কপালে মম আছে হেন লেখা?
কখন জানিলে আর না হইবে দেখা।
কভু কি কৈতেস কটু করি লেখা লেখা॥"

ঐতিহাসিক রহস্য। প্রথমভাগ। শ্রীরামদাসসেন প্রণীত।

এই গ্রন্থে যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমুদয়ই পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকটিত হইয়াছিল। সুতরাং সাহিত্যরসানুরাগী পাঠকসমাজে তৎসমূহের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। গ্রন্থকারবর্গের গুণগান ও দোষকীর্ত্তন করা, যাঁহাদিগের ব্যবসায়, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে রামদাস বাবুকে প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া, প্রশংসা হইতে অধিক, কৃতজ্ঞতা উপহার দি।

ঐতিহাসিকরহস্যলেখক সম্পদহীনা, নিরাভরণা বঙ্গভাষাকে একখানি বহুমূল্য আভরণ প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গালির ইহা মনে থাকিবে। এদেশের ধনিসন্তানেরা প্রায়ই ভোগরত এবং শাস্ত্রানুশীলনে অনাসক্ত। আমরা জনসনের ভাষার অনুবাদ করিলে, এইরূপ বলিতে পারি যে, রামদাস বাবুকে এত দিন ধনিসমাজে বিজ্ঞ বলিয়া জানিতাম; এক্ষণ হইতে তাঁহাকে বিজ্ঞসমাজে ধনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা।—রামদাসবাবুর এই ইংরেজী বক্তৃতাটি বহরমপুরের সাহিত্যসভায় পঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এখানিও লেখকের বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। ফলতঃ, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বিষয়ে রামদাসবাবু মান্য লোক হইয়া বসিয়াছেন। বক্তৃতার জন্য অধিক সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং গ্রন্থকারের ভাণ্ডারে যে সকল তত্ত্ব সংকলিত আছে, তাহার সম্যক্ ব্যবহার হয় নাই। এই প্রবন্ধটি পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইলে নিতান্ত উপকারী হইবে। বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ হওয়াও আবশ্যক। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্তবিষয়ে বাঙ্গালায় কিছুই নাই বলিলেও, অন্যায় হয় না।

•০০০•

জাতীয় জীবন।

জীবন আর মৃত্যুর মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য হইলেও, সকলেই দেখিয়া দেখিয়া এই দুইয়ের কতকগুলি স্থূল লক্ষণ অন্তঃকরণে স্থির করিয়া রাখে। লতা, পাদপ, পশু, পক্ষী, কিংবা মনুষ্য কি অবস্থায় থাকিলে তাহাদিগকে জীবিত বলা যায়, এবং কি কি লক্ষণ দেখিয়া তাহাদিগকে মৃত বলা হয়, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। কেননা সকলেই ইহা বুঝে। কিন্তু জাতীয়জীবন কি পদার্থ,—পৃথিবীর কোন্ কোন্ জাতি অদ্যাপি জীবিত আছে, কোন্ কোন্ জাতি মৃতের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে, ইহা সাধারণ লোকে বুঝে না। একথা বুঝিবার জন্য চিন্তাজগতের যে স্থানে আরোহণ করা আবশ্যক হয়, সেখানে তাহারা উঠিতে পারে না। বুদ্ধিরই দোষ হউক, অথবা হৃদয়েরই অপূর্ণতা হউক, তাহাদিগের পরিমিত ক্ষমতায় তাহা কুলায় না।

জীবনের প্রধান লক্ষণ গতি; মৃত্যুর প্রধান পরিচয় গতির অভাব। এই গতি স্থানত্যাগ নহে, এবং এই গতির অভাবও একস্থানে অবস্থান নহে। তরু গমনাগমন করে না; তথাপি উহাকে জীবিত বলি। কারণ, উহার ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, এবং ঐ ক্ষয় বৃদ্ধিই উহার জীবনী গতি। আর, ঐ যে তৃণটি কি তুলাটুকু বাতহিল্লোলে একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে, একবার উত্তরে যাইতেছে, আবার দক্ষিণে সরিতেছে, উহার গতি থাকিলেও উহাকে মৃত বলি। যেহেতু, ঐ গতি উহার নহে। মনুষ্যের মৃতদেহ যখন পরকীয়বলে একস্থান হইতে অন্যত্র নীত হয়, তখন তাহাতে কেহই জীবনের চিহ্ন দর্শন করে না।

গতি যে জীবনের এক প্রধান লক্ষণ তাহা নদ নদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই গাঢ়তররূপে প্রতীত হয়। বদ্ধ তড়াগ যতই কেন মনোহর হউক না, উহাকে দেখিলেই মৃতবস্তু বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। তীরে তরুরাজি তপস্বীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মৃদুবাহি সমীরণের প্রিয়সংস্পর্শে জলে মৃদু মৃদু লহরীলীলা হইতেছে, নির্ম্মাল্য পুষ্প সকল সেই সমীরণভরে উহার ইতস্ততঃ নাচিয়া বেড়াইতেছে, তথাপি উহাকে দেখিলেই মৃত বলিয়া অন্তরে খেদ হয়।

কারণ তড়াগের জলে গতি নাই। কিন্তু সজীব স্রোতস্বতী যখন করধৃত দর্পণের ন্যায় অতিগভীর প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, যখন উহার জলে একটী বুদ্বুদও দৃষ্টিগোচর হয় না, একটি মৎস্যের উল্লম্ফনশব্দও শ্রুতিপথে প্রবেশ করে না, যখন নির্ম্মল নীল আকাশ উহার বক্ষঃস্থলে প্রতিভাসিত হয়, এবং ঊর্দ্ধে ও অধোতে একই স্থিরতা দৃষ্ট হইতে থাকে, তখনও উহার অবিরামবাহিনী ধারা দেখিয়া, আমরা জীবিত জ্ঞানে উহাকে ভয় না করিয়া পারি না।

যে জাতীয় লোকদিগের জীবন আছে, তাহাদের গতি আছে, যাহারা মৃত হইয়াছে, তাহাদের গতি নাই। তাহারা উন্নতও হয় না, অবনতও হয় না; উঠেও না পড়েও না। যে ভাবে কেহ একবার ফেলিয়া রাখিয়াছে, সেই ভাবেই পড়িয়া আছে;—লোষ্ট্রবৎ নিস্পন্দ ও নিশ্চল। যদি আবার কেহ চালায়, হয় ত আবার তবে চলিবে। কিন্তু যাবৎ নিজে না চলিবে, তাবৎ পুনর্জ্জীবনের ভরসা নাই। সিডানের প্রহারে ফঁরাশিশদিগের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মর্ম্মাস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়াছে। তথাপি ফ্রান্স মরে নাই। আহত ব্যক্তি যেরূপ ঘোরান্ধ যামিনীতে চৈতন্য লাভ হইলে, বাহুর উপর ধীরে ধীরে ভর করিয়া আশাশূন্য সমরাঙ্গনে আপনার বলে আপনি উঠিয়া বসে, ফ্রান্স ও এইক্ষণ সেইরূপ উঠিয়া বসিতেছে। যখন দণ্ডায়মান হইবে, তখনই বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা পুনরায় প্রধুমিত হইবে এবং সেই ধূমবলে সমস্ত দেশে নবীকৃতযন্ত্রের ন্যায় নববীর্য্যসহকারে চলিতে থাকিবে।

জীবনের আর চিহ্ন বেদনাবোধ। যাহার যে অঙ্গে বেদনাবোধ নাই তাহার সেই অঙ্গ মৃত। ব্যাধিদোষে বাহু অবশ হইলে, উহাতে দগ্ধশলাকা ধরিয়া দাও, একটুকুও কষ্ট হইবে না। চিকিৎসকেরা কহিয়া থাকেন যে ক্ষত স্থানে যতদিন বেদনা থাকে, ততদিনই আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে। বেদনার সম্পূর্ণ অভাব হইলে, আরোগ্যের সম্ভাবনাও বিনষ্ট হইল। জাতিগত জীবন সম্বন্ধেও একথা হাড়ে হাড়ে খাটে। যে জাতির বেদনাবোধ নাই, সে জাতির কোন ভরসা নাই। আর জীবিত কোন জাতিকে আঘাত কর; দেখিবে, উহার অন্তর্দ্দাহে, আর্ত্তনাদে এবং অন্যবিধ উপদ্রবে দূরস্থিত প্রতিবেশীও শান্তিতে নিদ্রা সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না।

কে বলে যে অভিমান দোষের কথা? শরীরের পক্ষে যেমন বেদনা, জাতীয় জীবনেরপক্ষেও সেইরূপ অভিমান। যদি

কোন জাতির জাতীয় অভিমান পরকীয় পাদুকাঘাতে একেবারে নাশ পাইয়া যায়, তবে কি আর সৃষ্টি উলটিয়া গেলেও সেই জাতির অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা থাকে ? তরঙ্গাকুলজলধির মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ যেরূপ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, ইয়ুরোপীয়রাজ্যসমূহের মধ্যেও সুইজরলেণ্ডের ক্ষুদ্ররাজ্য সেইরূপ শোভা পাইতেছে। রুশিয়ার বন্য ভল্লূক অদূরে আরক্তনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে; প্রুশিয়ার হুঙ্কার, তামসী নিশার ঝাটিকানিঃস্বনের ন্যায়, অবিশ্রাম সোঁ সোঁ করিতেছে, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স প্রভৃতি খলপ্রকৃতি প্রতিবেশীরাও অবসর মত, এক এক বার মাথা উঠাইয়া তাকাইতেছে। কিন্তু কেহই অভিমানী সুইজরলেণ্ডের গায়ে হাত দিতে সাহস পাইতেছে না। সকলেই জানে, উহার অঙ্গে বেদনা বোধ এবং আত্মায় ভয়ঙ্কর অভিমান আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রত্যূষসময়ে উইলিয়ম টেল এবং তদীয় সহচরবর্গ বিলক্ষণরূপে ইহার প্রমাণ দিয়াছে

জীবনের আর এক মুখ্যলক্ষণ একতা। একতাকে জীবনের আর দশ লক্ষণের মধ্যগত একটি লক্ষণ বলাপেক্ষা, উহাই জীবন এরূপ বলিলেও অসংগত হয়না। জীবিত দেহে মস্তকের কেশ হইতে পাদদ্বয়ের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত একই অভিন্ন ভাব। একস্থানে কোনরূপ সুখের সংস্পর্শ হইলে, সেই সুখ শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করিয়া শরীরের সকলস্থানে ব্যাপিয়া পড়ে, এবং একস্থানে আঘাত হইলে, সেই আঘাতজন্য দুঃখও ঐরূপ অচিরকাল মধ্যেই প্রতি রোমকূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। কোন অঙ্গের সহিত কোন অঙ্গের বিচ্ছেদ নাই। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্য করিতেছে, অথচ তাহাদের সকলেরই এক প্রাণ। এই একপ্রাণতাই উহাদের একতা। যখন মৃত্যু আসিয়া শরীরকে ক্রমে ক্রমে কবলিত করে, তখন প্রথমেই এই একপ্রাণতার বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। যখন একপ্রাণতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, তখন জীবনেরও কোন চিহ্নই আর পরিলক্ষিত হয় না। জীবিত জাতীয় মনুষ্যদিগকেও এইরূপ সর্ব্বতোভাবে একপ্রাণ বলিয়া জানিবে। যে জাতির যত দিন একতা আছে, ততদিনই সেই জাতির প্রাণ আছে, একতার ধ্বংস হইলেই, উহা মৃতদেহ বলিয়া গণিত হইল।

যেমন শরীর হইতে প্রাণ একবারে বাহির হয় না, ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করে, অবশেষে চলিয়া যায়; অথবা যেমন তৈলহীন দীপালোকও একবারে নি-

ভিয়া যায় না, ধীরে ধীরে নিভিতে থাকে,—ক্ষণকাল নিভুনিভু জ্বলে, শেষে সম্পূর্ণরূপে নিভিয়া যায়, সেইরূপ জাতীয় জীবনও একবারে তিরোহিত হয় না। ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, একটু একটু করিয়া ভাটার জলের মত অপস্থত হইতে থাকে। লোকে দূর হইতে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। পরিশেষে দেখিতে দেখিতে এককালে চক্ষুর অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন জাতি মরিতে মরিতেও কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া বহুকাল বাঁচিয়া থাকে। হয়ত, ভাগ্যের বলে আবার পুনর্জীবিত হইয়া দণ্ডায়মান হয়। গ্রীকজাতি যায় যায় বলিয়া আজপর্য্যন্তও জীবিত রহিয়াছে। যাঁহারা স্বজাতির গৌরব রক্ষার্থ থর্ম্মপলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং আর আর সহস্র ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা স্বদেশের মান দেশে বিদেশে বিস্তার করিয়াছিলেন, যদি তাঁহাদের পুণ্যের বল থাকে, তবে হয়ত সেই বলেই জীবন্মৃত গ্রীক জাতি আবার জীবিতবৎ কার্য্য করিবে।

ইটালীর দুর্দ্দশা দেখিয়াও এতদিন কেহ উহার পুনর্জ্জীবনের আশা করেন নাই। ইটলীর বাহুতে আঘাত করিলে, চরণে ব্যথা বোধ হয় নাই, এবং চরণে আঘাত করিলে বাহু বেদনা অনুভব করে নাই। রায়েনজী ঔষধ লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছে, কান্দিয়া কান্দিয়া বিদেশীয় কবিদিগের অন্তঃকরণও বিগলিত করিয়াছে। কিন্তু ইটালীতে কেহই তাহার দুঃখে দুঃখী হয় নাই। সেই ইটালী আজ আবার জাতীয় সমাজে আসন পরিগ্রহ করিয়া, সকল জাতির সহিত সমানভাবে সামাজিকতা করিতেছে। ইটালীর যে গতি স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় সঞ্চালিত হইয়াছে, ইটালীর বেদনা বোধ জন্মিয়াছে এবং যে একপ্রাণতার বিরহে উহা মৃততুল্য ছিল, ক্ষণজন্মা পুণ্যাত্মাদিগের প্রাণগতপ্রযত্নে তাহাও আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

এইক্ষণকার যে সকল জাতি পৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, এবং পৃথিবীর অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তন করিয়া নিজ বীর্য্য বলের পরিচয় দিতেছে, তন্মধ্যে জর্ম্মণজাতি অবিসংবাদিতরূপে সর্ব্বাগ্রগণ্য না হইলেও, নিঃসন্দেহ অগ্রগণ্য। কিন্তু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কে জর্ম্মণীকে গ্রাহ্য করিত? একটি দেহকে শতধা বিভক্ত করিলে, তাহার যাদৃশী শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়, জর্ম্মণীও ঠিক সেই দশাপন্ন হইয়া কোনপ্রকারে দিনপাত করিতেছিল। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যদ্বারা জর্ম্মণ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, তত্তাবতের পরস্পরসম্বন্ধ একপ্রকার বিনষ্ট হই-

য়াছিল। জর্ম্মণীর একজন কাঁদিলে আর একজন হাসিতে থাকিত, এবং এক অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে আর এক অঙ্গ আপনাকে সুস্থ জ্ঞান করিত। কি পথ্য, আর কি অপথ্য, কেহই তাহা বিবেচনা করিত না। যাহা একজন পথ্য বলিয়া সেবন করিত, অপর কেহ তাহা অপথ্য বলিয়া উপেক্ষা করিত, এবং যাহা প্রতিবেশী কর্ত্তৃক অপথ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইত, তাহা সকলে পথ্য বলিয়া তুলিয়া লইত। কে যেন সহসা আসিয়া কি একটি মন্ত্র পড়িতে লাগিল, আর সেই মন্ত্র মহিমায় জর্ম্মণীর অঙ্গে অঙ্গে পুনরায় সম্মিলন এবং পুনঃশোণিত সঞ্চালন হইল, এবং দুদিন দশদিন যাইতে না যাইতেই জর্ম্মণী নিদ্রোত্থিত সিংহের ন্যায় ভৈরবনাদে গর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দিগে নিজ নিদ্রাভঙ্গের বার্ত্তা প্রেরণ করিল। এই নিদ্রাভঙ্গ অথবা এই নবজীবনের প্রথম ফল ১৮৬৬ খৃঃঅব্দের সাডোবার জয়দুন্দুভি, এবং তৎপরের ফল সিডান। ইহা হইতে আরও কি কি ফল ফলিতে পারে, তাহা ভবিষ্যতের তামসগর্ভে। ইতঃপূর্ব্বে জর্ম্মণীর মস্তকচ্ছেদন করিলে পাদাঙ্গুষ্ঠ পীড়াবোধ করিত না। এইক্ষণ কেহ সাহস করিয়া জর্ম্মণীর পদনখও স্পর্শ করেনা। কারণ সকলেই ইহা জানে যে, তাহা হইলে সিংহের সমস্ত শরীরে বেদনা বোধ হইবে।

স্বজাতির দুঃখে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই অসহ্য দুঃখ অনুভব করেন। যে স্বজাতির দুঃখেও দুঃখিত হয় না, তাহাকে পণ্ডিতেরা কাক কুক্কুর শৃগাল হইতেও হীন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে স্বজাতির দুঃখ দূর করিতে হয়,—কি মন্ত্র সাধন করিলে অথবা কি মহৌষধি প্রয়োগ করিলে, স্বজাতির অর্দ্ধমৃতদেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হয়, সে বিষয় অনেকেই অন্ধ। যাঁহারা কোন জাতির পুনরুত্থান কামনা করিয়া স্বজাতীয় লোকদিগের মধ্যে অনৈক্যের অঙ্কুর রোপণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে জাতীয় শত্রু বলিয়া ব্যাখ্যা করি। যে বন্ধনে কোন জাতির পরস্পরবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পুনরায় দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে, যাঁহারা তাহা ছেদন করিবার জন্য করে অস্ত্র ধারণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে স্বগোত্রবৈরী বলিয়া দূর হইতে, অভিবাদন করি। যাঁহাদের বাক্য কিংবা কার্য্য কোনরূপেও দেশের একপ্রাণতার মূলে আঘাত করে, আমরা তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য সকলকেই অন্তরের সহিত উৎসাহ দি।

যদি কেহ কোন মৃতকল্পজাতির যথার্থ হিতকামনা করেন, তাহা হইলে বা-

হাতে সেই জাতির গতিশক্তি পুনরায় উজ্জীবিত হয়, উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পুনরায় বেদনা বোধ হইয়া উঠে, এবং সকল অঙ্গে একাঙ্গতা ও একপ্রাণতা জন্মে, তদর্থই তাঁহার কায়মনোবাক্যে যত্নপর হওয়া উচিত।

(প্রাপ্ত।)

তাপিত দম্পতী।

১।

সুনীল আকাশে যথা বালার্ক সুন্দর,
অলকা আবৃতভালে সিঁন্দুরের ফোঁটা,
সদা হাসি হাসি মুখ
উপজিত কত সুখ
(সরস-সলীল, শশী কৌমুদী পরশে)
সরলতা মধুময় বেলফুল বাস
ললিত ললিত অঙ্গে কত পরকাশ !

২।

সাজিতে সুন্দর সেই মনোহর কালে,
কৃত্রিম বিলাস ভ্রমে নারিত পশিতে
পবিত্রতাময় মনে,
সখীসহ আলাপনে
খেলায় হেলায় যেত সময় সকল ;
সেদিনকোথায়,প্রিয়ে ! সেদিনকোথায় ?
সরল সে ভাব আঁখি নিরখিতে চায়।

৩।

চাঁদের সোহাগে কৌমুদীর পরকাশ
প্রণয় পরশে রসে জীবন তখন,
নিরখি নিরখি তব
মনে ভাব অভিনব
আশায় বিরতি নাই, প্রণয়ী এমন,
কথা নাই মুখে, কিন্তু নয়নমিলনে,
প্রণয় সুধার সিন্ধু উথলিত মনে।

৪।

অপ্রশস্ত সামান্য নদীর স্রোতগতি
বায়ুগতি অবহেলে কলকল ধ্বনি ;
গম্ভীর জলধি তলে
অপ্রকাশ স্রোত চলে
গম্ভীর প্রণয় স্রোত প্রকাশ নীরবে ;
তেমতি তোমার ভাব ছিল এত দিন.
আজি কেন প্রেম সিন্ধু নয়ন মলিন ?

৫।

শুভ পরিণয় পরে নূতন প্রণয়
বান্ধা থাকিতাম দোহে অভিন্ন হৃদয়,
নয়নে নয়ন দিয়ে
মনে মন মিশাইয়ে
নাই আগা নাই শেষ হইত আলাপ
সময় সুখের পক্ষে কাল সনাতন
যাইত সকালে, ঘুমে বিবশ নয়ন।

৬।

এখন কি আছে প্রিয়ে মনে সমুদয়

তবে কেন হেন ভাব স্বভাব অভাব ?
ফুলসাজে সুখ যার
সোনায় না চিত্তে তার
সুখ চিহ্ন দেখি, হায় সবে অনাদর ?
যদি সুলোচনে ! তব এত ছিল মনে
তখন সরল ভাব দেখাতে কেমনে ?

৭

প্রভাতে উঠিয়া বসি জীবিকা চিন্তনে
সামান্য জীবিকা তরে এত পরিশ্রম ?
থাকি বল কোন্ সুখে
হাসি নাই তব মুখে
হাসি, পরাধীন বাঙ্গালির সুখ সার ?
আর কি কহিব প্রিয়ে ! আঁধার সকল
চারিদিকে অসুখের আসার কেবল।

১

অহো নাথ ! সুখদিন হইয়াছে গত,
আর কি হইবে হেন কপাল আমার
হাসিব তোমায় দেখি
জুড়াবে তৃষিত আঁখি
নাচিবে হৃদয় সদা সুখের আগার !
সুখের সেদিন প্রিয় ; ছিল সেইদিন
যেদিন তোমার মুখ দেখিনি মলিন।

২

মানসে মনের তুল্য নাই মূল্যবান্,
রমনীর মন সেই হৃদয় রতন
প্রাণেশ, যাঁহার স্থান
হৃদিপদ্মে বিদ্যমান,
তাহার অসুখে কোথা হৃদয়ের সুখ ?
ধিক্ সে ললনা যার সুখে থাকে মন
নিরখিয়া প্রাণেশের মলিন বদন।

৩

বালিকা যখন, কিছু বুঝি নাই আমি,
তোমার প্রণয় পূর্ণ পিযূষ ভাণ্ডার
সরল সদয় মন
ভাল বাসি অনুক্ষণ
শিখাইল ভাল বাসা, শিখিনু যতনে
যাপিতে সময় সদা জ্ঞান আলোচনে
তবমুখে হাসি দেখি হাসিনু বদনে।

৪

পড়িতে পুস্তক নাথ ; হাসি হাসি মুখ,
সে মুখ সে আঁখি ছিল আমার পুস্তক।
কত ভাব কালিদাসে
ভবভূতি বেদব্যাসে
যে সুখ লভেছি নাথ ! নিরখি বদন
তুমি কি লভেছ পড়ি ষড়দরশন ?

৫

হাসিতে রে প্রিয়তম ! ভাসিত হৃদয়
প্রণয়ের সরোবরে কেননা হাসিব ?
শুধু মুখ নিরখিয়া
জুড়াত তাপিতহিয়া
(তাপিত কেবল দরশনের অভাবে।)
কি করি প্রকাশ করি সে সুখ যখন
শত প্রিয় সম্ভাষণে যুড়াতে জীবন।

৬

চপলা চালিত জলধরে জলধরে
আকাশে সতত দেখি প্রিয় আলিঙ্গন

প্রণয় চপলাভাস
হৃদে সদা পরকাশ
কেমনা মিলাবে সুখে প্রণয়ীর মন ?
হেন ভাব অহো নাথ ! আছিল যখন,
কেমনা হাসিব আমি সদাই তখন ?

৭

এবে কোন্ সুখ ? হায় সকলই গত
আমার কারণ তব এত পরিশ্রম !
কোথা সে সোণার বর্ণ
দেহ দেখি শুষ্কপর্ণ
কোথা তব হাসি নাথ ! বল একবার।
জীবিকার তরে হায় ! এতবিড়ম্বনা
শরীর শোণিত জল সদা ক্ষুণ্নমনঃ।

৮

কেবল আমার তরে যতন তোমার,
আপনার সুখে দেখি সদা অনাদর।
সুস্থতা হতেছে গত
দেহ অস্থি পরিণত
চিন্তায় চিন্তায়, হায় ভাবিতে না পারি,
যেদশা দেখিতে পাই হইবে কি আর।

৯

অভাগিনী তরে তব এত পরিশ্রম !
হাসি কি আসিতে পারে বদনে আমার ?
দিন দিন ক্ষীণ দেখি
চাহিতে না পারে আঁখি
তাতেই সতত নাথ ! মলিন বদন।
এই মোর কপটতা এইত সকল
আছত হৃদয়ে, দেখ সকল সরল।

১০

কাজ নাই পরিশ্রমে কাজ নাই সুখে
বনিক করুক গিয়ে সোনায় আদর।
সব আমি ভস্ম গনি
তাহে বল অভিমানী
তোমার প্রণয় ভুষা মম অভিমান।
সেই মোর হৃদয়ের সুখের সম্বল
সংসার চক্রেতে মাত্র সেই পরিমল।

১১

চল নাথ ! কাজ নাই ক্লেশ করি এত
চলহে পয়াণ করি মলয় অচলে।
সুরস সুরস ফলে
নির্ঝর শীতল জলে
পোষিবে শরীর, মন হইবে সুস্থির।
সদা তব পাশে বসি সুখ বিলোকন
সুখেতে সুখেতে হবে সময় যাপন।

১২

চল নাথ ! সেই দেশে আমোদ প্রমোদ
উন্নতির পরিনাম, নাই হেন স্থানে !
সীতা পঞ্চবটীবনে
সুখে শ্রীরামের সনে
ছিলেন যেমন সুখে, লভিব তেমন।
কাজ নাই কাজ নাই গৃহে করি বাস
সরল নূতন সুখে যাবে বার মাস।

১৩

তবেই হাসিবে, প্রিয় ! এমুখ আবার
নিরখিয়ে তব মুখ প্রফুল্ল উজ্জ্বল।
তুমি মম আমি তব
অবনীর সুখ সব

আমাতে তোমার হবে, তোমাতে আমার।
বনের ফুলের মাল
রবি মুক্ত কেশ জাল,
ঢাকিয়া বদন আধ, প্রেমের মুরতি।
বসিয়া তোমার পাশে থাকিব যখন,
আমার বদন সাথ। হাসিবে তখন।

ভারতে আশা।

"আশা কি?" এই প্রশ্ন লইয়া কবির সমক্ষে উপস্থিত হও। কবি অস্থিরমতি। তিনি একবার বলিবেন "আশা এক পরমসুন্দরী সিমন্তিনী,—হৃদয়ানন্দবিধায়িনী।" আবার পরক্ষণে বলিবেন, "আশা মরীচিকা, মায়াবিনী।" ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য?

উপদেষ্টৃগণকে জিজ্ঞাসা কর "আশা কি অবলম্বনীয়?" তাঁহারা বলিবেন, "শুধু আশাই মানবজীবনের অবলম্বন। দুস্তর সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে আশা মনুষ্যের সুখের তরণী।" দ্বিতীয় বিবেচনার পর বলিবেন, "আশার বশবর্ত্তী হইও না। এই রঞ্জিত দর্পণের মধ্যদিয়া যত কিছু সুন্দর দেখা যায়, জ্ঞানচক্ষে দৃষ্টি করিলে সকলই কুরূপ, কদাকার। আশা করিয়া নিরাশ হওয়া অপেক্ষা আশা না করাই ভাল।" এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ উপদেশের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়?

তুমি বালক, সংসারে প্রবেশ করিতেছ, দেখিতেছ সকলই সুন্দর, সকলই নূতন। তোমার জীবনের সরস বসন্ত আগত। আনন্দবিস্ফারিত চক্ষে প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অভিনব ভাব উদ্দীপ্ত হইল। আশা তোমার হৃদয়চক্রে মধুক্রম রচনা করিয়া গুন্ গুন্ রবে চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল। সুতরাং আশার বিপক্ষ কবিগণ তখন তোমার বিবেচনায় বাতুল ও নির্ব্বোধ। ক্রমে তোমার বয়সের পরিণতি আরম্ভ হইল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তেজস্বিতাও কমিয়া গেল। যে সংসারকে এতদিন সুখসরোবর বিবেচনা করিয়া মানসসরোবরে রাজহংসবৎ বিরচণ করিতেছিলে,—উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্ম ধরিবার জন্য যত্ন করিতেছিলে, এইক্ষণে সেই সরোবরে তরঙ্গ বাঁধিল। তোমার সুখের স্বর্ণকমল রত্নময় মৃণালসহ গভীর জলধি তলে নিক্ষিপ্ত হইল।

দীর্ঘকাল যে বিষয়ের অনুসরণ করিতেছিলে, এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিলে

সে প্রকৃত সুখ নয়, তোমার কল্পনা-প্রসূত ছায়া মাত্র, ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত উষ্ণ নিশ্বাস মাত্র, দুস্তর সংসার মরুতে মরীচিকা মাত্র।

সংসারে আশার সুখ যদি মরীচিকা হইল; রবিকিরণে বালুকারাশিই যদি মনুষ্যচক্ষে ভ্রম জন্মাইল; পিপাসায় যাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, তাহাকে জল দানের আশা দিয়া যদি জলাশয় ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল, তবে আর ফ্রিজিয়াধিপতি টান্টেলসের অবস্থা শোচনীয় কেন?

যদি সকলের অবস্থাই এইরূপ হয়, তবে মনুষ্য আশা করে কেন? অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে যত্ন করে কেন?

আশা মনুষ্যজীবনের জীবন। অপরিণামদর্শিতার জন্য এক জন কষ্ট পাইবে বলিয়া জগৎ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। আশাবিহীন হইয়া জীবন ধারণ অসম্ভব; যদি সম্ভবপরও হইত তথাচ অসুখের সীমা থাকিত না। প্রবল আশা সুখপ্রাসাদের ভিত্তিভূমি। যাহার অন্তঃকরণ নিরন্তর শোকসন্তাপে দগ্ধ হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসারসুখ সম্ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া অহোরাত্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, তাহার মনেও আশা আছে। কারণ ও কার্য্য এতদুভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, আশা ও জীবনধারণে তদ্রূপ। কারণ ব্যতীত কার্য্য নাই, আশা ব্যতীত জীবন ধারণও হইতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যের অভ্যন্তরে ফল লুক্কায়িত থাকে। সেইরূপ প্রত্যেক আশার অভ্যন্তরে সুখ আছে। সুতরাং আশায় ও সজীবজগতে কার্য্যকারণ বন্ধন। যাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহময়ী জননী মুমূর্ষ সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বসিয়া থাকেন, যাহার উত্তেজনায় ছাত্রগণ সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া নিদ্রাক্লিষ্টনয়নে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, কৃষক মধ্যাহ্ন সময়ের অগ্নিকণাবর্ষী আতপতাপে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়াও হল চালনা করে, তাহারই নাম আশা।

আশা চিরসঙ্গিনী, আশার তুল্য বিশ্বস্ত আর নাই। বালক নিরাশ্রয়, আশা তাহার প্রতিপালিকা স্নেহময়ী ধাত্রী। যুবক আশার বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহায় মধুরতা বুঝিতে পারে, আশা তাহার রসময়ী সহচরী। বৃদ্ধ, কালশয্যায় শয়ান; জীবনের পাপানুষ্ঠান স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে; শয্যা কণ্টকময়; আশা কণ্টক দূরীকরণে যত্ন করিতেছে, অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যৎ পথ সুগম করিতে প্রদীপ হস্তে অগ্রে অগ্রে যাইতেছে।

গ্রীক-কবি-কল্পনা-প্রসূত প্যাণ্ডোরার উপন্যাস হইতে আশার মহীয়সী

শক্তি পরিগ্রহ হইতে পারে। দুঃখ দুর্দ্দশায় জড়িত বিকৃত দেহ টিপিমিথিয়স্ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াও আশার অবলম্বনে সুখে ছিলেন।

এক্ষণে ভারতও টিপিমিথিয়সের অবস্থাপন্না; শোকে দুঃখে জড়িতা, বিকৃতাঙ্গী, বিবর্ণা। কেবল বিশেষ এই ভারতে তেমন আশা দেখিতে পাইনা। উত্তালতরঙ্গসঙ্কুলসমুদ্র মধ্যে নির্ব্বোধ কর্ণধার, পোতের কর্ণ ছাড়িয়া দিয়া যেমন ভাগ্য পরীক্ষা করে, উপর্য্যুপরি উপপ্লবে ভীতা ভারতেরও সেই দশা ঘটিয়াছে! ভারতের আর সে দিন নাই। যে সময়ে বিনির্ম্মল আশাজ্যোতিতে ভারতবাসিগণের অন্তঃকরণের অভ্যন্তরভাগ আলোকময় করিয়াছিল; যে সময়ে তাঁহারা উন্নতিশৈলের শিখর দেশ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; যে সময়ে, গ্রীস, রোম, মিসর প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য সকল ভারতের নিকট জ্ঞানের জন্য ঋণী ছিল, এক্ষণে আর সেদিন নাই। ষড়দর্শন-প্রযোজিকা বুদ্ধি এইক্ষণ অনুকরণে রত! ক্ষত্রীয় প্রভৃতির বাহুবল আত্মদ্রোহে পর্য্যবসিত। যবন বিপ্লবে বীরপ্রসবিনী আর্য্যভূমি ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে; পৃথুরাজের সহিত সমস্ত আশার মূল উৎপাটিত হইয়াছে, পণ্ডিত মণ্ডলীর বিজ্ঞান-বিতর্ক সাঙ্গ হইয়াছে! ভারত বীর্য্যহীনা ভূপতিতা!

পতন হইতে উত্থান প্রকৃত মহত্বের লক্ষণ। ভারতের পতন দেখিলাম, পুনরুত্থান দেখিতে আশা হয় না কেন? আমরা দেখিলাম, রোমপদানত গল রাজ্য বিজ্ঞান-প্রসূতি ফঁরাশিদেশে পরিণত হইল। সময় পাইয়া অশ্রুসিক্ত, মলিনবসন গ্রীস ও রোম রাজ্যকে আবার অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে ফ্রান্স প্রধান সহায় হইয়াছিল। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর অত্যুন্নত অবস্থায় দেখিতে দেখিতে নিজভূমিতে ফঁরাশীরাজ্যের পতন হইল, অমনি যেন দৈববলে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া ফঁরাশি রাজ্য আবার পূর্ব্বপদবী লাভ করিল। এ দৈব বল কি? আশা। এক নেপোলিয়ন সিংহাসনচ্যুত হইল বলিয়া ফঁরাশিদেশ হীনশ্রী হয় নাই; কোটিনক্ষত্রসমুজ্জ্বল নভোমণ্ডল একটি নক্ষত্রপাতে নিস্তেজ দেখায় না। সহস্র সহস্র প্রাণিনাশ হইল, তাহাতেও আশা খর্ব্ব হয় নাই। যে দেশ উন্নতির চরমসীমা দেখিতে ব্যস্ত, সে দেশ উন্নতির সোপান দেশে নিক্ষিপ্ত হইলে ভীত হইবে কেন? 'অভাবই প্রভাব' এবাক্য প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ভারতে আশা নাই, উন্নতিও

নাই। স্পেনীয়গণের রাক্ষসবৎ ব্যবহার হইতে আমিরিকা আশার সাহায্যে উন্নতি লাভ করিল কিন্তু পতিত-ভারত আর উঠিতে পারিল না। দরিদ্রের রাজা হওয়াও সম্ভবপর দেখিতে পাই, কিন্তু ধনীর দুঃখী সন্তান অপেক্ষাকৃত উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, ইহার কারণ কেবল আশার অভাব।

অনেকে বলেন, আশা শক্তি-সাপেক্ষ। ভারতে শক্তি নাই,আশা কোথা হইতে আসিবে ? এ নিতান্ত অদূরদর্শীর কথা। আশা শক্তি-সাপেক্ষ নহে,বরং শক্তিই আশার অনুগামিনী। শক্তি স্থিতিস্থাপক, আশার আকর্ষণ ব্যতীত বড় হয় না। আশাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাহা হইলে শক্তিও সীমাবদ্ধ হয়। মহাবল নেপোলিয়ন বোনাপার্টী যখন এজেসিয়োর মিলিটেরি স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন,তখন তাঁহার শক্তি কত ছিল ? যদি তাঁহার গগণবিহারিণী আশা সেই সময়ের অনতিপরিস্ফুট কুসুম কোরক সদৃশ বালশক্তিতে সীমাবদ্ধ করিতে পারিতেন তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশের আরম্ভ পর্য্যন্ত ইয়োরোপে যে অত্যাশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। আশা প্রণোদিত না হইলে মহাবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের রাজ্যাংশ হইতে সামান্যাবস্থ পার্ব্বতীয় কখনও স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারিত না, শিবজিকে মহারাষ্ট্রকুলতিলক বলিয়া কেহ স্মরণ ও করিত না।

আশার প্রভাব কতদূর কেহই নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি অলস-মানস-প্রসূত দিবাস্বপ্নকে আশা বিবেচনা করে,কেবল সেই ব্যক্তিই যৌবনের মনোহরভাব গত হইলে নিরাশ হৃদয়ে অনুতাপ করে। কিন্তু ঈপ্সিত লাভে যাহার জীবন পর্য্যন্ত পণ,সে যত আশা করে ততই উন্নত হইতে থাকে। আশার শেষসীমা নিরূপণ তাহার অসাধ্য।

মনুষ্যের সুখ সসীম নয়, সুতরাং আশা সীমাবদ্ধ থাকে না। ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয়। অনন্ত বায়ুরাশির উপর ভর দিয়া জগতে জগতে উড়িয়া বেড়ায়। প্রতিভাযুক্ত মন সেই আশার অনুবর্ত্তী হয়, এবং অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার গমনমার্গ পরীক্ষা করে; তৎপর শক্তিকে সেই পরিমাণে উত্তেজিত করিয়া দুর্ব্বলের অগম্যস্থান লাভ করে। যাহার শোণিতে উষ্ণতার অভাব কিছুতেই উত্তেজিত হয় না, সে ধ্রুবনক্ষত্রের অপরপার্শ্ববর্ত্তিনী অত্যুচ্চ আশার অনুগমনে অসমর্থ, সুতরাং উড্ডীয়মানা আশার পক্ষযুগ প্রস্তর বাঁধিয়া দেয়।

ভারতে শক্তির অভাবে আশার অভাব, একথা নিতান্ত অলীক। চেষ্টায় অলসতার সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়, ভারতে নিরাশার এইমাত্র কারণ। আশার সঞ্চার হইতেই "চেষ্টা করিতে হইবে" এই ভাবনা মনে উদয় হয়, সুতরাং "আশা করিয়া নিরাশ হওয়া অপেক্ষা, আশা না করাই ভাল" এই রূপ বিতর্ক সাধারণের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। মনে কর নানাকারণে আশা বিফলা হইল। তখন দেখিতে হইবে সুখের মূলোচ্ছেদ হইল কি না। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, জ্ঞানোপার্জ্জনে যে সুখ উপার্জ্জিত জ্ঞান বিনিময়েও সে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বড় হইব আশায় মনে যে আহ্লাদ ও উৎসাহ থাকে বড় হইলে তত থাকে না; সাধারণতঃ উন্নাতবস্থায়ই তত আহ্লাদ ও উৎসাহের অভাব। সুতরাং নিরাশ হইলে আশা করিবার সম্বল সম্মুখেই রহিল, এইরূপ অনুধাবন করিলেই মনে সুখ ও উৎসাহ জন্মে।

একথা বলা যাইতে পারে, ভারত কখনও আশা করিয়া নিরাশ হয় নাই। যখন ভারতে আশাছিল, উন্নতিও ছিল। রঘুবংশীয়গণ উন্নতির আশায় উত্তেজিত হইয়া বীরদর্পে বিপক্ষবিজেতা বলিয়া পরিচিতছিল; যবনের অভ্যুদয়ের আরম্ভে অগ্নিকুলোজ্জ্বল বীরগণ তাহাদিগকে খর্ব্ব রাখিয়া ছিলেন। তখন যেমন ভারতের বহিঃস্রোতছিল, অন্তঃস্রোত ও তেমনই প্রবল ছিল। কবিগণ কল্পনাসঙ্গে উড্ডীয়মান হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলের অপর পার্শ্ব হইতে অতলস্পর্শ জলধির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত, এবং মনোহর বিলাস ভবন হইতে অন্ধকারাবৃত গিরিগহ্বর পর্য্যন্ত এবং ততোধিক অপরিজ্ঞাত মানবহৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেন। দর্শনের অন্তস্তত্ত্বদর্শন করিয়া দার্শনিকগণ অপূর্ব্বকীর্ত্তি লাভ করিতেন। সেই উন্নতির সময়ে গণিতশাস্ত্র, ভারতবর্ষ তুঙ্গ গম্ভীরভাবব্যঞ্জক হিমাচল শৃঙ্গের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, আপন উন্নতমস্তক পাশ্চাত্য জাতি সকলকে প্রদর্শন করিয়াছিল; তখন নিরাশা কোথায়? কোন্‌বিভাগে আশা বিফলা?

যখন এতদিন নিরাশার কারণ হয় নাই, তখন আলস্যপরতন্ত্রতার অপবাদ হইতে মুক্ত হইতে বৃথাছলানুসন্ধান উপহাসের কারণ মাত্র।

অনেকে বলেন আমাদের এত অভাব যে আমরা সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া কখনও উন্নত হইতে পারিব না। এটি গুরুতর ভ্রম। অভাবই উন্নতির ভিত্তিভূমি। রোমের স্বাধীনতার লোপ হইল। পিশাচবৎ নরমাংস প্রিয়

সম্রাট্‌গণ সমস্ত ইয়োরোপ ব্যতিব্যস্ত করিল। অভাবে সর্ব্বস্থান হতাশায় পরিপূর্ণ। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত ইয়োরোপ অজ্ঞানতমসাবৃত। পূর্ব্বদিকে আসিয়াখণ্ডের শিরোভাগে ভারত হিরকখণ্ডবৎ দেদীপ্যমান, পশ্চিমে ইয়োরোপখণ্ড অন্ধকারাবৃত। উপপ্লবে সকলের মন দৃঢ় হইল; অভাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল, নানাপ্রকার উপায় চিন্তনে সাধারণের মন নিবিষ্ট হইল। সুতরাং উন্নতি না হইবে কেন? যেমন অন্ধকারগৃহে একটী আলোক জ্বালিলে সমস্তগৃহ আলোকময় হয়, ইয়োরোপেও তাহাই হইল। আশানল অন্তরায় নিবন্ধন দীর্ঘকাল প্রধূমিত হইতে ছিল, হঠাৎ একপার্শ্বে হইতে জ্বলিয়া উঠিল; অমনি যেন দৈববলে সমস্ত ইয়োরোপ আলোকময় হইল। আমরা পৃথিবীতে যত যন্ত্র যত কৌশল দেখিতে পাই, সমস্তই অভাব বৃক্ষের ফল। যে জাতি যত উপদ্রুত; উৎপীড়িত,ও উৎক্রান্ত থাকে, তাহার উন্নতি তত দ্রুত।

সুনীতিপরায়ণ ও সৎশিক্ষাপ্রদ ইংরেজের অধিকারে ভারতবর্ষে আশার সঞ্চার দেখাযায়, উন্নতির বীজও উপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এসমস্ত প্রকৃত উন্নতির কারণ নহে। আমাদের প্রত্যেক ধমনীতে অভাব রহিয়াছে, তথাপি উন্নতি হয় না কেন? অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের অভাব দূরীকরণে চিন্তা ও চেষ্টা করি না, সুতরাং উন্নতি হইবে কেন? আমরা বস্ত্র পরিধান করিব; আমরা তাহার জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য নই, কিন্তু সে চিন্তায় মাঞ্চেষ্টরের নিদ্রা হয় না। লেখনী প্রস্তুত করিব, তজ্জন্য বর্মিংহাম্‌ ব্যস্ত। আমাদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য ফরাশিও ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে, সুতরাং আমরা কেন আত্ম অভাব অপনোদনের চেষ্টা করিব? আমরা অধ্যয়ন করিব, তজ্জন্য প্রাচীন ভারতের গণিত বিজ্ঞান সংগ্রহে শ্বেতাঙ্গগণ দিন যামিনী পরিশ্রম করিবেন; তাঁহারা আপন আপন ছাত্রদিগকে প্রতিদিন যাহা শিক্ষা দিবেন সেই সমস্ত কথা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে, এবং আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপকগণ তাহাই অপকৃষ্ট প্রণালীতে আংশিক শিক্ষা দিয়া আমাদের মনে অভিমানের বীজ রোপন করিবেন। সুতরাং আমাদের উন্নতি কিসে হইবে?

যেমন ইংরেজের শাসনে আমাদের মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইয়াছে, বোধ হয়, তেমনি আমাদের একটি মহৎ

অনিষ্টও হইতেছে। আমরা আমাদিগকে ভুলিতেছি। অভাবসকল পরকীয় সাহায্যে অপনীত হওয়াতে, আমাদের আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিতেছি। সহস্রবৎসর পূর্ব্বে ভারতের উন্নতিক্ষেত্রে যে ফল ফলিয়াছিল, এবং যাহার বীজ পুনর্ব্বার এইক্ষেত্রে পতিত হইয়া আপনা আপনি সুবৃক্ষ উৎপাদন করিবে বলিয়া আশা ছিল,তাহাতে আমরা যত্নকরিতে ভুলিয়া আছি।

ভারত ভূমি কি অনুর্ব্বরা, না অসার? তাহানহে, আশাই প্রধান সার, তাহার অভাবই সকল অনিষ্টের মূল। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অভাবের সহিত আশা ও চেষ্টার অভাব সংযুক্ত থাকায় ভারতে অবনতি! কে যত্ন করিয়া ভারতক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ বপন করে? কেই বা প্ররোহপ্রেক্ষী? কেইবা বারিসিঞ্চনে রত? যদি কেহ কিছু করিয়া থাকে, সে বালকবৎ। বালক স্বহস্তে বীজ রোপন করে, ভূমির উপযোগিতা পরীক্ষা করে না। তাহার প্ররোহদর্শনলালসা এত বলবতী হয় যে প্রতিদিন তিন চারি বার উৎপাটন করিয়া নিরীক্ষণ করে। সুতরাং বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ভারতে এক্ষণে বালকতা! উপযুক্ত আশা নাই, উদ্যোগ নাই। ভারতে বার্ক্ নাই, পিট্ নাই, মন্ট্গমরি নাই, ডিমস্থিনিস্ নাই,—যাহার বাক্যে চেষ্টা ও আশা যুগপৎ উত্তেজিত হইতে পারে এমন কেহই নাই। নেপোলিয়নের প্রাদুর্ভাবে ইংলণ্ড ব্যতিব্যস্ত; সমস্ত মহাদেশ জেতার পদানত; ব্রিটেনীয়গণ নিরাশয় ভগ্নহৃদয়। রাজমন্ত্রী পিট্ সেই ভয়ঙ্কর সময়েস কলকে আশামন্ত্রে কবচ ধারণ করাইলেন, ব্রিটন সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বিপক্ষের উন্নতি ও অশ্রু যুগপৎ অবজ্ঞা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভারতে কিছুই নাই, অথচ আশার নেত্রে নিরীক্ষণ করিলে সকলই আছে। মনুষ্যের জীবনবাণিজ্যে পরিশ্রম মূলধন; আশা সমুদ্র। বহির্ব্বাণিজ্য উন্নতির মূল, সুতরাং উন্নতি করিতে হইলে আশা-সমুদ্রের দূরবর্ত্তি দ্বীপসমূহে শক্তিপোতসহযোগে বাণিজ্য করিতে হইবে, নতুবা ভারতে উন্নতি নাই।

উন্নতি একদিনের কার্য্য নয়। যদি এক সময়ের লোকের যত্নে সাধারণ্যে আশার উদ্রেক হয়, তাহার পরের শ্রেণীর লোকেরা উন্নতির মূল স্থাপন করিতে পারে। যদি স্বরোপিত বৃক্ষ অসময়ে উৎপাটিত না হয়, যদি পরিপক্কাবস্থারপ্রতি সকলের দৃষ্টি থাকে,তবে ক্রমে মুকুল হইতে পুষ্প হইবে, ফুল হইতে ফল ফলিবে,বিজ্ঞান আবার ভারতে

বৃক্ষের শাখায় শাখায় শোভা পাইবে।

প্রকৃতিতেও কিছুই অসম্ভব নাই ; পর্ব্বতে শিবজি জন্মে, জলজবৃক্ষে রণজিত ফল আশ্চর্য্য নহে। যেভূমিতে কালিদাস, মাঘ, ব্যাস ভবভূতির জন্ম, যে ভূমিতে আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, কপিল, গৌতমের আবির্ভাব যে স্থানে রাম যুধিষ্ঠির রাজ্য করিয়াছেন, খনা লীলাবতী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, এ সেই ভারতভূমি। তবে আমরা আশা না করিব কেন ? যদি অকূল সমুদ্রেও ভাসিতে হয়, আমরা এ ভারতে আশা ভেলকে বক্ষ রক্ষা করিয়া কুল প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে বিশেষ রূপে অনুমোদন করিব ! অশ্রুবিসর্জ্জন উন্নতির পথ বলিয়া, কাহাকেও নিরাশহৃদয়ে অশ্রু পাত করিতে উপদেশ দিব না।

শ্রীব্র——

কারারুদ্ধ ধর্ম্ম।

যাহাকে সাধারণতঃ লোকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলে, আমরা তাহাকে কারারুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। সকল দিকে দৃষ্টি করিলে, বোধ হয় কেহই এই বিশেষণটিকে অপপ্রযুক্ত কিংবা অসংগত বলিবেন না।

যে বায়ু অনন্ত আকাশপথে অনন্ত কাল হইতে নির্ম্মুক্তভাবে সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাকে নির্ম্মুক্ত বায়ু বলি। তাহার স্পর্শ শীতল, স্বাস্থ্যকর ও বল বর্দ্ধক। আর যে বায়ু কোন গৃহের প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যে বহুকাল যাবৎ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ বায়ু বলি। তাদৃশ দুষিতবায়ু সেবনে অত্যল্পকাল কষ্টেসৃষ্টে প্রাণধারণকরা অসম্ভব না হইলেও, কখনও দীর্ঘকাল কুশলে থাকা সম্ভবপর হয় না। যে জল গিরিপ্রস্থ হইতে শত ধারায় বহির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে অবিরতগতি প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে নির্ম্মুক্ত জল বলি। আর যে জল কোন কূপে কি সংকীর্ণ খাতে বদ্ধ দশায় রহিয়াছে, তাহাকে বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ জল বলিয়া উল্লেখ করি। যেমন উহা সদ্যঃপ্রাণকর, তেমন ইহা সদ্যঃ প্রাণহর।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। যে ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদয়কন্দর হইতে স্বাভাবিক শোভায় বিনিঃসৃত হইয়া দিগন্ত প্রমোদিত করে, তাহা প্রাকৃত ও নির্ম্মুক্ত, এবং যে ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায় রূপ অপ্র

শস্ত গৃহে, কি সংকীর্ণ কূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা অপ্রাকৃত ও কারারুদ্ধ। এই কারারুদ্ধ ধর্ম্ম, কারারুদ্ধ বায়ু কি কারারুদ্ধ জলের ন্যায়, কিয়ৎকালের জন্য মনুষ্যের উপযোগী হইলেও, বহুকাল সেবনে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট না করিয়া যায় না। নির্ম্মুক্ত ধর্ম্ম হৃদয়কে নিয়ত প্রসারিত করে; কারারুদ্ধ ধর্ম্ম অতিকোমল স্বভাবসুন্দর হৃদয়েও কেমন এক বিকৃত ভাব জন্মাইয়া, উহাকে দিন দিন সংকুচিত করিয়া ফেলে। উহার স্নেহ ও সহানুভূতির স্রোত আর পূর্ব্ববৎ সকলদিকে প্রবাহিত হয় না, সকলকে আর উহা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারে না, এবং সকলের সুখ দুঃখে উহা আপনি অনুমাত্রও সুখ দুঃখ অনুভব করে না। ছিন্নমূল লতার ন্যায় উহা নীরস ও নিরানন্দ; কোথায় দেখিয়া লোকে প্রাণ শীতল করিবে, না তাহার পরিবর্ত্তে দেখিয়াই লোকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

যখন প্রভাতসূর্য্যের কাঞ্চনকান্তি কিরণজালে নভোমণ্ডল আলোকিত হয়, তখন পৃথিবীর সকলেই আনন্দে গাত্রোত্থান করিয়া সেই অনুপম ও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করে। কারণ, সকলেই সূর্য্যকে আপনার বলিয়া জানে। সূর্য্য লইয়া কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ নাই। যখন চন্দ্রমার সুধাময়ী জ্যোৎস্না, মেঘাবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, জগতে সুধাবর্ষণ করে, অতি দুঃখী ব্যক্তিও তখন এক বার মাথা উঠাইয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করে। চন্দ্রকে কেহই পর ভাবে না। এইরূপ, যখন যথার্থ কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি সংসারে যথার্থ কোন ধর্ম্মবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, শত্রু মিত্র সকলেই তখন পুলকিতচিত্তে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হয়, এবং শত মুখে তাহার যশঃকীর্ত্তন করিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করে। নিন্দুকের জিহ্বা ভয়ে অবসন্ন হয়, বিদ্বেষী নিজ বিদ্বেষভাব বিসর্জ্জন করে, এবং ঘোরতর অবিশ্বাসীও অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য, এ কি দেখিতেছি বলিয়া, বিস্ময়ে স্তম্ভিত থাকে। তাদৃশ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মভাবকে কেহই প্রাণের বাহিরে রাখিতে চায় না। কিন্তু যে ধর্ম্ম, শীতকালীয় নিষ্পত্র পাদপের ন্যায় অতিরুক্ষবেশে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শকমাত্রকেই ব্যথিত করে, যে ধর্ম্ম আত্মপর ও ক্ষতি লাভ গণনায় সুচতুর বণিক্ হইতেও অধিকতর চতুরতা প্রদর্শন করে, যে ধর্ম্ম বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া শাসন করে এবং প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, সংসারের সকল লোক তাহাকে কখনই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইতে পারে না। তাদৃশ ধর্ম্মের

আশীর্ব্বাদের নাম অভিসম্পাত,সাধনার নাম বৈরশোধন এবং স্বর্গের নাম জন মানববর্জ্জিত আশাশূন্য শ্মশান।

অষ্টম হেনরীর লোকবিগর্হিত দুর্নীত কার্য্য সকল স্মরণ করিলে, কাহার হৃদয় না দুঃখে জর্জ্জরিত হয়? পৃথিবীর সমস্ত লোক তাহাকে দুরাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করিল। কিন্তু ইয়ুরোপীয় ধর্ম্ম জগতের তৎকালীন রাজধানী রোম নগরী হইতে,পোপ তাহাকে 'ধর্ম্মরক্ষক' এই উচ্চ উপাধি পাঠাইয়া দিলেন। স্পেন দেশে যাঁহারা ধর্ম্মের নামে মনুষ্য জাতির উৎপীড়নের একশেষ করিলেন, লোকের গার্হস্থ্য শান্তিকে চিরদিনের জন্য বিনাশ করিয়া ফেলিলেন, এবং দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অবলার কোমল প্রাণে আঘাত দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, যাজকসম্প্রদায়ের নিকট তাঁহা রাই ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য বলিয়া পূজা পাইলেন; আর যাঁহারা ধর্ম্মকে সহায় করিয়া লোকের প্রতি অত্যাচারে বিমুখ রহিলেন, তাঁহারা অধার্ম্মিক ও অবি শ্বাসী বলিয়া সকলের অস্পৃশ্য হইলেন

সাধুতা, সত্যবাদিতা, পরমার্থ-নিষ্ঠা ও পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণনিচয় দেশভেদে ও কালভেদে কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। যাহা এদেশে সাধুতা, তাহা সকল দেশেই সাধুতা; এবং যাহা এখানে পরোপকার,তাহা সর্ব্বত্রই পরোপকার। তবে, যিনি এক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের নিকট অতিভক্তিভাজন ও পরোপকার-পরায়ণ বলিয়া সকলের দৃষ্টান্তস্থল হন, অন্যসম্প্রদায়ীরা তাঁহাকে ধর্ম্মালোক-বঞ্চিত কৃপাপাত্র দীন ব্যক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করে কেন? ধর্ম্মের কারাবাসই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে। শাক্য সিংহের তপোরতি, রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক স্নেহশীলতা, জন্ হাওয়ার্ডের পরদুঃখকাতরতা, চৈতন্যের প্রেম, কো মতের সত্যানুরাগ অবিকৃতচিত্ত সা ধারণলোকদিগের সততশিরোধার্য্য রত্ন স্বরূপ। কিন্তু যাঁহারা, ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে গিয়া, কোন কারায় প্রবিষ্ট হই য়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; শুনিবে, ইহাঁদের একজন নাস্তিক, আর একজন আস্তিক, এবং সকলেই সর্ব্বথা তমসাচ্ছন্ন।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান পরিচয় এই, উহা দিবান্ধবৎ আলোকভয়ে নিতান্ত সংকুচিত থাকে; মনুষ্যের চক্ষু ও মনুষ্য বুদ্ধির জ্যোতিঃ কোন প্রকারেই উহার সহ্য হয় না। পুরাতন কবিরা নৈসর্গী নিশাকে ভয়ঙ্করতামসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মিশরদেশের পুরা-তন ধর্ম্মতন্ত্র তাহা অপেক্ষাও গভীর অন্ধকারে আবৃত ছিল। যেস্যুট সম্প্র দায়ীরা কিম্ভূত মনুষ্য, তাহা অদ্যাপি

লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পায় নাই। তাহারা কোথায় আছে, কোথায় নাই; কোথায় কি করিতেছে, কোথায় কি না করিতেছে এবং কি উদ্দেশ্যে কেন ছায়ার ন্যায় এই দৃশ্য হইতেছে, এই আবার লুকাইতেছে, তাহা যেস্যুট বিনা পৃথিবীর কাহারও বোধগম্য নহে। কাপালিকদিগকে প্রাণে বধ কর, তথাপি তাহারা কাপালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির কর্ণে মনের মর্ম্ম কথা খুলিয়া বলিবে না। জ্ঞানের প্রখর জ্যোতি নিকটবর্ত্তী হইলেই ইহারা জাহিরবে সেই স্থান পরিত্যাগ করে, এবং যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানালোক সহায় করিয়া পরীক্ষার জন্য ধর্ম্মতত্ত্বের সন্নিহিত হইতে যত্নশীল হয়, তাহাকে ধর্ম্মজগতের পরমশত্রু বলিয়া নানাচক্রে বাহির করিয়া দেয়।

এইক্ষণ জিজ্ঞাসা এই, ধর্ম্ম কি চির-কালই এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী দিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারায় আবদ্ধ থাকিবে? সমস্ত পৃথিবী বলিতেছে, না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন, ইহা-রাও নিজ নিজ সাধ্যানুরূপ উচ্চৈঃস্বরে মনুষ্যের হৃদয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে,—না। কারাবাসের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতি-শীঘ্রই মনুষ্য প্রভাতসমীর সেবন করিয়া কৃতার্থ হইবে। সপ্তদশ শতা-ব্দীর শেষভাগে, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ফরাশি বিপ্লবের উদয়কালে, পারিসের প্রমত্ত প্রজাবর্গ যখন বাষ্টিল নামক দুর্ভেদ্য কারাদুর্গের দ্বার ভঙ্গ করে, তখন নিরী হপ্রকৃতি ষোড়শ লুই নিতান্ত চমকিত হইয়া, কি হইল বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্শ্বস্থ একজন বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী উত্তর করিলেন,—মহারাজ! এত দিন মনুষ্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত, তাই তাহারা থাকিত। এইক্ষণ মনুষ্যের বুদ্ধিকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং উহা থাকিবে কেন?

আমাদিগের বোধ হয়, পৃথিবীর যাজকসম্প্রদায়েরও ঠিক্ সেই দশা আসন্নপ্রায়। তাঁহারাও নিশ্চয়ই ষোড়শ লুইর ন্যায় কি হইল বলিয়া চমকিত হইবেন, এবং কি হইতেছে, তাহা পার্শ্বস্থ কেহ বুঝাইয়া দিবে। প্রথমচৈতন্যলাভসময়ে, হয়ত তাঁহা-দিগের অনেকেই দুর্ব্বিষহ দুঃখানলে দগ্ধ হইবেন, সংসার অন্ধকারময় দে-খিবেন, সৃষ্টি বিনাশ পাইল বলিয়া আর্ত্ত-নাদ করিবেন, এবং মনে যত কিছু মমতার বন্ধন আছে, সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। কিন্তু পরিণামে তাঁহাদিগেরও সে দুঃখ থাকিবেনা। জগতের সাধারণ মঙ্গল কখনই ব্যক্তিবিশেষের অমঙ্গল নহে।

আহার ও বাঙ্গালি

উপস্থিতসময়ে বাঙ্গালি জাতি অপরাপরদেশীয় বর্ত্তমানলোকদিগের চক্ষে যে নিতান্তহীনবীর্য্য, ভীরুস্বভাবাপন্ন ও দুর্ব্বলশরীর বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে, এবং ইহাদিগের তেজস্বিতা ও মনস্বিতা নাই বলিয়া চতুর্দ্দিকে যে উপহাসের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, নানা কারণ আমাদের চক্ষুর সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকে। কেহ কেহ মৃত্তিকা, জলবায়ু ও সমাজসংস্থানের দোষের কথা উল্লেখ করেন; কেহ বাল্যবিবাহ এবং বহু পরিগ্রহকেই হীনবীর্য্যতার কারণ উল্লেখে, নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি মৃত্তিকার দোষে বাঙ্গালি জাতি হীনবীর্য্য ও ভীরুস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে দোষ দূর করা অসাধ্য অথবা সুদূরপরাহত। সমাজ চরিত্রমধ্যে যে সকল দোষ আছে, তাহা সংশোধন করাও বহুকালের কথা এবং বহুলোকের আয়াসের বিষয়।

উপরি উক্ত কারণ সকল বিনা এই দুর্গতির আর কোন সহজ প্রতিকার্য্য কারণ আছে কিনা, আমাদের তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালিজাতির হীনবির্য্যতা ও ভীরুস্বভাবের যদিও অপরাপর কএকটি কারণ আছে বটে, কিন্তু সে গুলি গৌণ, আর আহারই মুখ্য। আমরা এই হেতু, বাঙ্গালির আহার সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

ইহা একটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ কথা যে, প্রাণিমাত্রই আহার দ্বারা প্রাণরক্ষা ও জীবনধারণ করিয়া থাকে। এমন কি, একটি উদ্ভিদও অনাহারে জীবিত থাকিতে পারে না। এই আহার্য্যবস্তুরাশির গুণের তারতম্যে প্রাণিবৃন্দের জীবন কাল অল্পাধিক এবং সুখদুঃখাবহ হইয়া থাকে। উদ্ভিদদিগের মধ্যেও, যে যেমন মৃত্তিকাকর্ষণ ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবনরক্ষা করে, সেই মৃত্তিকার রসও বায়ুর গুণের তারতম্যে সেই সেই উদ্ভিদদিগের ও জীবনকাল ন্যূনাধিক হইয়া তদনুরূপ ফল ফুল সমুৎপন্ন হয়। যে স্থানের যে সকল উদ্ভিদ অসার মৃত্তিকার রসাকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, সেই সকল উদ্ভিদ যথোচিতরূপ শাখা প্রশাখায় পল্লবিতও ফল পুষ্পে সুশোভিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে সারবতী মৃত্তিকার রস যেসকল উদ্ভিদের জীবনী

শক্তি পোষণ করে, সেসকল উদ্ভিদ স্বপ্পকাল মধ্যেই সুশোভন ফল ফুলে অলংকৃত হইয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করে। যখন নিকৃষ্ট উদ্ভিদ জগতেই এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির কথাই নাই।

বাঙ্গালির আহার সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে, মানব শরীর যথোচিত রূপে রক্ষার জন্যে কি কি বস্তু আবশ্যক। শারীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে, মনুষ্যজীবন যথাযথরূপে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের প্রত্যহ সমপরিমিত চতুর্ব্বিধ বস্তু আহার করা কর্ত্তব্য। যথা এল্‌বোমিন, তৈলাক্ত, লবণাক্ত এবং শর্করাযুক্ত পদার্থ। এই চতুর্ব্বিধ বস্তুর মধ্যে নিয়ত কেবল এক মাত্র পদার্থ আহার করিলে মনুষ্য কিয়ৎ কাল জীবন রক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু অপ্পকালমধ্যেই শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া সে জীবন অকর্ম্মন্য করিয়া ফেলে। অতএব যথোচিতরূপে মানবজীবন রক্ষার্থে নিয়ত কিয়ৎ পরিমাণে জান্তব ও কিয়ৎ পরিমাণে পার্থিব বস্তু আহার করাও আবশ্যক।

এইক্ষণ দেখা যাউক বাঙ্গালিরা নিয়তকাল যেবস্তু আহার করে তন্মধ্যেউপরি উক্ত পদার্থসকল কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে। তণ্ডুলই বাঙ্গালির প্রধান আহার্য্য সামগ্রী। ইহার সঙ্গে অন্যান্য বস্তুও আহার করা হয় বটে কিন্তু তাহার পরিমান অতি অপ্প। তণ্ডুলের মধ্যে মাংসনির্ম্মাপক ও বল বর্দ্ধক পদার্থ অতি অপ্প পরিমাণে আছে। একশতাংশের মধ্যে মাংস নির্ম্মাপক অংশ ৭ ভাগ পাওয়া যায়। তণ্ডুল অপেক্ষা অন্যান্য বস্তুর মধ্যে উহা অধিক পরিমাণে আছে। গোধূম মধ্যে মাংসনির্ম্মাপক বস্তু শতকরা ১৪ অংশ আছে। বাঙ্গালিদের মধ্যে যাহারা তণ্ডুলাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গোধূম আহার করে তাহারা তণ্ডুলভোজীদিগের অপেক্ষা সবলকায়। ইহার প্রমাণ পশ্চিমাঞ্চলীয় চোবে ও দোবেদিগের বাঙ্গালি বংশধর। আবার গোধূম অপেক্ষা জন্তুর মাংসে মাংসনির্ম্মাপক ও বলবর্দ্ধক বস্তু অধিক পরিমাণে রহিয়াছে। মাংসে শতকরা ২২ অংশ মাংস নির্ম্মাপক। বর্ত্তমান সময়ের শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাংসাহারে মনুষ্যের মাংসতন্তু সবলও মস্তিষ্ক চিন্তাশীল হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় শারীরতত্ত্বজ্ঞদিগেরও এই মত ছিল।

প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা সুশ্রুত বলিয়াছেন "আহারের দ্বারাই শরীরের বল, মাংসতন্তু ও আরোগ্য বর্দ্ধিত হয়, এবং বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন ভাবে থাকে। আহার্য্যবস্তুর গুণবৈষম্য হই

লেই শারীরিক অস্বাস্থ্য ঘটে"। সুশ্রুত চতুর্ব্বিধবস্তু মনুষ্যের প্রত্যহ আহার করা আবশ্যক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন "চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারি প্রকার আহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট বহুবিধ দ্রব্য আহার করা যায়" তাঁহার মতেও মাংসাহারের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সুশ্রুত, জলচর গ্রাম্য, জাঙ্গল ও মাংসভোজী ইত্যাদি ছয় প্রকার জন্তুর মাংসাহারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া, তাহাদের গুণগত ন্যূনতা ও আধিক্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন জলচর প্রাণিদিগের মাংসাপেক্ষা গ্রাম্য পশু পক্ষীর মাংস অধিক উপকারী। মাংস ভোজীর মাংস তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। তিনি যে সকল পশুপক্ষীর মাংস আহার করিবার বিধি দিয়াছেন, তন্মধ্যে অদ্য সংক্ষেপে এস্থানে কয়েকটির উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। যথা,ছাগমাংস,—অতি শীতল নয়,গুরুপাক, স্নিগ্ধকর। মহিষমাংস,—স্নিগ্ধকর উষ্ণ, মধুর ও তৃপ্তিকর এবং পুংস্ত্ববলও মাংসের দৃঢ়তা সম্পাদক। কপিঞ্জমাংস (চাতক),—রক্তপিত্তনাশক, শীতল ও লঘুপাক। ময়ূরমাংস,—স্বর, মেধা, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তাকারক, বায়ুনাশক এবং বলবর্দ্ধক। বন্যকুক্কুটমাংস—বায়ু, ক্ষয়রোগ ও বিষমজ্বরনাশক এবং তৃপ্তিকর; ইত্যাদি। বাঙ্গালিরা এতৎপরিবর্ত্তে নিত্য কি আহারকরেন, ক্রমে তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

—০ঃ(ঃঃ০)ঃ০—

বিবি আর বউ।

বিলাতের বিবি আর বাঙ্গালার কুলবধূ, এই দুইয়ের মধ্যে কাহাকে অগ্রে পাদ্য অর্ঘ্য দি, বল। বিবি রাজলক্ষ্মী, বধূ গৃহলক্ষ্মী। ইহাঁদের কে ছোট, কে বড়, কিরূপে অবধারণ করিব?

যাঁহাদের কথা লইয়া বিবাদ যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দেখিতেছি তাহা হইলেও মীমাংসা বড় সহজ নহে। কালমাহাত্ম্যে আজ কাল দেবতারাও অনুকরণপ্রিয় হইয়াছেন। কারণ, বিবিদের মধ্যে অনেকেই ইদানীং কর্ণে মনোহর দুল দোলাইয়া দিয়া, কণ্ঠে কণ্ঠহার পরিয়া, সূক্ষ্মবসনে আধ ঘোমটার মত বদন আবৃত করিয়া, বঙ্গবধূর ছন্দানুবর্ত্তন করিতেছেন। এবং বধূরা,

ঘোমটা ফেলিয়া, গাউন পরিয়া, অঙ্গলতিকার দেশীয় আভরণসকল বিমোচন করিয়া, আধআধ বিবি সাজিয়া, বাহির হইতেছেন। যাঁহার অনুকরণ করি, তিনি গুরু, যিনি অনুকরণ করেন, তিনি শিষ্য। যখন উভয়ত্র গুরুশিষ্যভাব, তখন কে গুরু, কে শিষ্য, কিসে তাহার মীমাংসা হইবে?]

যদি না বুঝিয়া ও ভালরূপে বিচার না করিয়া, যাহা মুখে আসে তাহাই একটা বলিয়া বসি, তাহা হইলেও বড় বিপদ। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—'সহসা বিদধীত নক্রিয়াম্, অবিবেকঃ পরমাপদাম্পদম্'। সহসা কোন কর্ম্ম করিবেক না, যতকিছু আপদ সম্ভবে সমস্তই অবিবেকমূলক। অবলার দোষ গুণের তুলনা করিয়া, পুরাকালে ইয়ুরোপে ও ভারতবর্ষে অনেক রাজা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, অনেক রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছে। যদি একথায় কেহ বিশ্বাস না করেন, তাঁহাকে কাব্য পড়িতে অনুরোধ করি। এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, যে সকল লক্ষণের বিচার করিয়া অবলা হইতে অবলাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, তাহারই গুটিকত ধরিয়া সিদ্ধান্ত পক্ষে দুই এক কথা বলিব। তার পর, অদৃষ্টে যাহা থাকে।

আদৌ রূপ। যদিও অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি রূপকে কুসুমের সুকুমার লাবণ্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ জ্ঞান করেন, তথাপি এ তুলনায় রূপের তুলনা একবারে পরিহার করিতে পারি না। যাঁহাদিগের প্রসঙ্গ হইতেছে, তাঁহারা আপনারাই যখন রূপের জন্য অত পাগল, তখন রূপ উপলক্ষ করিয়া দুটা কথা বলা, কাজে কাজেই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এস্থানে বিষম বিভ্রাট দেখিতেছি। বিলাতের কোন কোন মহাত্মা বলেন, আমরা তাঁদের সব বুঝিলেও, তাঁহাদিগের সতের রস ও সুন্দরীদিগের সৌন্দর্য্য মহিমা কিছুতেই অনুভব করিতে সমর্থ হই না। একথা যে নিতান্ত মিথ্যা এমন বোধ হয় না।

বিলাতিরা দীর্ঘাঙ্গীকে সুন্দরী বলেন বাঙ্গালি শতবার ধ্যান করিয়াও অঙ্গযষ্টির দ্রাঘিমায় সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্ন দর্শন করিতে পায় না। 'বৈদূর্য্য মণিতে চন্দ্রকান্তি নিপতিত হইলে, এক অপূর্ব্ব বর্ণ সমুৎপন্ন হয়, বিলাতিরা তাহাই নয়নতারকের স্বাভাবিক বিবেচনা করেন; বাঙ্গালি তাদৃশ চক্ষুশালিনীকে বিড়ালাক্ষী বলিয়া উপহাস করে। নিবিড়কৃষ্ণ কেশজাল বিলাতির চক্ষে শোভাশালী নহে; বাঙ্গালিও, কেশে কালিমার স্থলে সুবর্ণের আভা দর্শন করিয়া, সুখী হয় না। বিলাতের অনেক গম্ভীরপ্রকৃতিব্যক্তি

এইরূপ বিলাপ করিয়াছেন যে, হর্ষ, অনুরাগ কি লজ্জাদি ভাবের উদ্রেক হইলে, তাঁহাদিগের কুলকামিনীগণের কপোলদেশে যে অনির্ব্বচনীয় বর্ণমাধুর্য্য ক্ষণকাল লীলা করিয়া চক্ষুর অদৃশ্য হয়, বাঙ্গালায় আসিয়া আর তাহা তাঁহারা দেখিতে পান না। বাঙ্গালি যুবারাও এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, বিলাতে গিয়া তাঁহারা কোথাও নয়নের সেই শতভাবব্যঞ্জক স্বভাবসুন্দর চটুলতা এবং মুখশ্রীর সেই সারল্য পূর্ণ মুগ্ধতা দর্শন করিয়া দেশের কথা মনে করিতে পান না।

রূপ বিষয়ে এই দুই দেশে যখন ঈদৃশ বিষম মতভেদ, তখন ইহাতে আমরা কি বলিতে কি বলিব, কিছুই বুঝিতেছি না। তবে মনের কথা খুলিয়া বলিতে হইলে স্থূলতঃ এই এক সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে,বঙ্গবধূরা বনলতা, আর বিলাতীয় বিবিরা উদ্যানলতা। উদ্যানলতার সহিত বনলতার যে প্রভেদ, আমাদিগের বিবেচনায় ইহাঁদিগের মধ্যেও ঠিক্ সেই প্রভেদ। বঙ্গবধূর যৎসামান্য যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য থাকুক, তাহা স্বাভাবিক। তাহাতে শিল্পকার্য্য, ও কারুনৈপুণ্যের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। বিলাতের বিবিরা সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, শিল্প দূরে থাকুক, ভক্তিভাজন বিজ্ঞানশাস্ত্রকেও নিয়ত ভৃত্যবৎ নিয়োগ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বথা শিল্পময়ী চারুপুত্তলী। দেখিয়া আহ্লাদ জন্মে, প্রশংসা করিতেও প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু বহুক্ষণ দেখিয়া সুখী হইব, এইরূপ বিশ্বাস জন্মে না।

গুণের গণনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অবলাজাতির গুণ নিচয়কে অগ্রে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া উচিত। এক গার্হস্থ্য গুণ, আর প্রদর্শনের গুণ। রন্ধনাদিকার্য্যে দক্ষতা, সংসারাসক্তি, মিতাচার, শ্রমশীলতা ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য গুণসমূহ গার্হস্থ্য গুণ। নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদিতে নিপুণতা, চিত্রবিদ্যা ও সীবনাদি সূক্ষ্ম শিল্পে করচাতুর্য্য প্রদর্শনের গুণ। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণির গুণ গুলি লোকের চক্ষু কর্ণ আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষুধার সময় অন্ন দেয়, তৃষ্ণার সময় জল দিয়া প্রাণ শীতল করে, অঙ্গে বস্ত্র না থাকিলে সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে বস্ত্র যোগায়, এবং পীড়ায় শয্যা গত হইলে ঔষধ ও পথ্য দিয়া জীবন রক্ষার কারণ হয়। প্রদর্শনের গুণচয় এসমস্ত উপকারে না আসিলেও,গৃহস্থের যশোরাশি বিস্তার করে, এবং যাহাকে আজ কাল লোকে মান বলে, সেই মানের বৃদ্ধিপক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়া থাকে।

বঙ্গবধূরা এতদিন গার্হস্থ্য গুণেই

অলঙ্কৃত ছিলেন। ইদানীং অনুকরণ-প্রিয়তানিবন্ধন প্রদর্শনের গুণরাশিসঞ্চয়নেও নূতন অনুরাগে অনুরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু বিলাতের বিবিদিগের গুণগ্রাম প্রদর্শনেরই একান্ত উপযোগী। তাঁহারা বহুকাল হইতে সভ্য,—এবং সভ্যতার নাম প্রদর্শন;—সুতরাং যে গুণ প্রদর্শন করা যায় না, তাঁহারা বাধ্য হইয়াই তাহাতে অবহেলা করেন। যে কুলকুমারী নাচিতে জানে না, গাইতে জানে না, সভাস্থলে দশজনের মধ্যে বসিয়া, ভাল দু চারি খানা কাব্য কি নাটকের প্রসঙ্গে দশটি কথা কহিতে পারে না, বিলাতীয়দিগের মধ্যে তাহার মনোমত বর ও ঘর পাওয়াও নিতান্ত সহজ কথা নহে।

সাহেবদিগের অনেকে এক্ষণ প্রদর্শনের গুণ অপেক্ষা প্রয়োজনের গুণকে অধিক প্রশংসা করেন। কারণ, দেখা যাইতেছে, তাঁহারা, প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া, স্ত্রীলোকের রন্ধনাদি কার্য্য শিক্ষার জন্য তারস্বরে বক্তৃতা করিতেও শঙ্কিত হন না। তাদৃশ সাহেবেরা অবশ্যই এবিষয়ে বঙ্গীয় গৃহলক্ষ্মীদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিবেন। পক্ষান্তরে, বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে কতকগুলি সুকুমারবিদ্যানুরাগী নবীন যুবা নিতান্ত প্রদর্শনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারাও প্রস্তাবিত কথায় অগত্যা বিলাতের বিবিদিগেরই স্তুতিবাদ করিবেন। যাঁহারা অংশতঃ প্রদর্শনপ্রিয়, অংশতঃ প্রয়োজনপ্রিয়, তাঁহারা কোন্ পক্ষের গুণপক্ষপাতী হইবেন, জানি না।

এই যে প্রদর্শন আর প্রয়োজনের কথা বলা হইল, ইহারা কেবল কতকগুলি গুণের সহিতই সম্বন্ধ আছে, এমন নহে। দয়া, দাক্ষিণ্য, ও স্নেহ মমতাদি হৃদয়গত ভাবের উপরও ইহাদের বিলক্ষণ কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। কেহ করুণরসের একখানি কাব্য কি উপন্যাস পড়িবার সময়, যেন চিরন্তন অভ্যাসবশতঃই, ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করেন;—কথায় কথায় আবিল নয়নে ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া অন্তরের আলোড়িত দশা নিকটস্থ বন্ধুকে দর্শন করিতে দেন;—এবং যে সকল অশ্রুবিন্দু, কুসুমদামস্খলিত শিশিরবিন্দুবৎ কপোলদেশ বহিয়া নিপতিত হইতে থাকে, কোমল করপল্লবে তাহা পরিমার্জ্জন করিতে করিতে, মনের দুঃখে, মুহ্যমান লতার ন্যায়, সুকোমল শয্যায় ঢুলিয়া পড়েন। সে গভীরনিদ্রা কিছুতেই শীঘ্র আর ভঙ্গ হয়না। কেহ আবার কাব্যপাঠসময়ে প্রাণান্ত করিয়াও এক ফোটা চক্ষের জল আনয়ন করিতে পারে না;—উপন্যাসের কথায় কেন বারংবার উষ্ণ নিঃশ্বাস নিক্ষেপ

করিতে হইবে,তাহা বুঝিয়া উঠে না;—পরের দুঃখে দুঃখী হইতে গিয়া, কোন প্রকারেই নিবৃত্ত হইতে জানে না;—কিন্তু তোমার প্রকৃত কোন বিপদ হইলে,মুখে কথাটি না বলিয়া, ক্ষণকালের জন্য কাতর না হইয়া, কোনরূপ অবসাদ অনুভব না করিয়া, তৎকালে যাহা কর্ত্তব্য, তিক্ত হউক আর মিষ্ট হউক, শরীরসাধ্যে তাহা সাধন করে।

প্রিয় পাঠক! তুমি এই দুইয়ের কোন্‌টিকে ভাল বাস? যদি চক্ষের জল, আর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পরিতৃপ্ত হও, তবে বিলাতে যাও। আর যদি রোগশোকাদি প্রকৃতদুঃখের সময় প্রকৃত শান্তি চাও, তবে বাঙ্গালায় এস। বাঙ্গালা অসভ্য দেশ, ও দরিদ্র দেশ। এখানে, অন্তঃপুরে আজপর্য্যন্তও ভাল মতে নাটকাভিনয় শিক্ষা হয় নাই। এখানে, জননীরা আজ পর্য্যন্তও আপনার শিশুকে আপনি বক্ষে তুলিয়া স্তন্য দান করেন:—পত্নীরা দাসীর ন্যায় প্রাণাধিকা প্রিয়সখীর ন্যায়, এবং সকল সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনীর ন্যায়, পতির পরিচর্য্যায় দিনযামিনী রত থাকেন;—ভ্রাতৃবধূরা সহোদরভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে পতির জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সেবা কি সংরক্ষণ করেন;—প্রতিবেশিনী,প্রতিবেশীর গৃহে, বিবাহাদিমঙ্গলোৎসবে, পাচিকা কি পরিচারিকার বেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হন;—এবং গৃহে অতিথি আসিলে, গৃহিণী, আপনার অন্নব্যঞ্জন-ভাগ ও শয্যাসামগ্রী প্রদান করিয়া,উপবাস ও অনিদ্রার ক্লেশস্বীকারও অকাতরচিত্তে গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লন। এখন ভাল মন্দ ও বড় ছোট বিচারের ভার,তোমার হস্তে। যদি তুমি দুষ্যন্তের ন্যায় সহৃদয় হও, তাহা হইলে, প্রকৃতির অকৃত্রিমবিলাস এবং কারুকার্য্যহীন মোহনমাধুরীতেই অধিকতর মুগ্ধ হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। একবার বনে যাও, আবার বাগানে যাও। ঐ যে ফুলটি বনে ফুটিয়া রহিয়াছে, আর গন্ধে দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, উহার প্রতিও দৃষ্টিপাত কর;—আর, ধনীর মর্ম্মরখচিত রমনীয়হর্ম্মে যেসকল কৃত্রিম কুসুম অতি আদরের সহিত রক্ষিত দেখিতেছ, সেগুলিকেও একবার ভাল করিয়া দেখ।

বঙ্গবধূগণ! তোমাদিগকেও একটি কথা বলি। তোমাদের অন্তরে পরানুকরণপ্রবৃত্তি নিতান্তপ্রবল হইয়া থাকিলে যত্নের সহিত অতিশীঘ্র সে প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ কর। বিধাতা চক্ষু দিয়াছেন, চক্ষু মেলিয়া দেখ। বিধাতা কর্ণ দিয়াছেন, কর্ণ পাতিয়া শুন। কি সুন্দর,কি কুৎসিত,কি সুখাবহ,আর কি অসুখাবহ, আপনারা তাহার মীমংসা কর। তো

মরা কখনও ক্রীড়াজীবের করস্থিত পুতুলের ন্যায় অনিচ্ছায় চলিও না এবং ফুলের ন্যায় স্রোতের জলেও ভাসিয়া যাইও না। এই পরিবর্ত্তসময়ে, তোমরা আপনার ভূমিতে আপনার বলে তিষ্ঠিয়া থাকিবে, না একদিকে অঙ্গ গড়াইয়া দিবে, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। হৃতসর্ব্বস্ব বঙ্গের তোমরাই যে গৌরব, ইহা ক্ষণকালের তরেও তোমরা ভুলিয়া যাইও না।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। স্বভাবদর্শন। শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় বিরচিত। বরিশাল, সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত কাব্য। কয় সর্গে ইহা সমাপ্ত হইবে জানিনা। এই খণ্ডে গ্রন্থকার কেবল প্রথমসর্গ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই তিনটি বিষয়ের বর্ণনা আছে।

টোলের ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে কবিতা রচনা করিয়া নিজনিজ বিদ্যা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের লেখনী হইতে প্রায়ই 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে, এবম্ভূত শ্রুতিমনোহর ললিতপদাবলী নিঃসৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, কবিতায় কি চাই, কি না চাই, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। ব্যাকরণ লইয়া ঘট মট করিয়া, বড় লুগ-গন্তের কতকগুলি দুরুচ্চার্য্য পদ প্রয়োগ করিতে পারিলেই, তাঁহারা কৃতার্থ হন। বর্ত্তমান লেখকের কবিতায় কেহই এইরূপ কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। ইহাঁর লেখা সরল, সুন্দর, ও মনোহর। ভাবও স্থানে স্থানে নিতান্ত মধুর। নিন্দা বল, কি প্রশংসা বল, ইহাঁর সম্বন্ধে এই এক বিশেষ কথা বক্তব্য যে, ইনি কালিদাসাদি মহাকবিদিগের রচনা বারংবার পড়িয়া একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। স্বভাবদর্শনের অনেক স্থলেই এই কথার প্রমাণ আছে। তবে, তাদৃশ লোকদিগের পদাঙ্কমালার অনুসরণ করা তেমন একটা গুরুতর পাপ নহে।

২। ভারতশ্রমজীবী। সচিত্র মাসিক পত্রিকা। কলেবর রয়েল ৮ পেজী ১ ফরমা। মূল্য নগদ এক পয়সা। বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া সাধারণলোকের শিক্ষার

এক প্রশস্ত পথ উন্মোচন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বুদ্ধিকে প্রশংসা করি, এবং এই অভিনব উদ্যমের জন্য তাঁহাকে শতবার ধন্যবাদ দি। ভরসা করি, এদেশের সকলেই শ্রমজীবীর ১০।২০ খণ্ড ক্রয় করিয়া প্রকৃত শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রচার করিতে যত্নপর হইবেন। বঙ্গদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের শিক্ষাগত উন্নতির জন্য অদ্য পর্য্যন্ত যত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমাদিগের বিবেচনায় শশীপদ বাবুর এই কার্য্যই তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানীয়। তাঁহার শ্রমজীবী দীর্ঘজীবী হউক!

৩। চিকিৎসাতত্ত্ব। চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধীয় বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র। কলিকাতা গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা ক্রমে ইহার তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর আশান্বিত হইয়াছি। এখানির বহুলপ্রচার নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আমোদের জন্য পড়া এক, এবং উপকারের জন্য পড়া আর। যাঁহারা চিকিৎসাতত্ত্ব পড়িবেন, তাঁহারা অনেকবিষয়ে উপকৃত হইবেন। চিকিৎসাশাস্ত্রীয়লেখাকে লোকে যেরূপ দুর্ব্বোধ মনে করে, ইহা সেরূপ নহে। সকলেই ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারে। লেখকদিগের নিকট একটি অনুরোধ আছে। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র হইতে যে সকল কথা সংকলন করেন, তাহার মূলপ্রমাণ অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া দিলে, পত্রিকার সমধিক গৌরব বাড়িবে।

৪। সহোদর। ইহাও একখানি মাসিক পত্রিকা এবং ইহার উপরে লেখা আছে, 'Every one must read it.'—অর্থাৎ সকলকেই ইহা পড়িতে হইবে। ইহাতে আরও লেখা আছে যে, 'যাহা যাহা সুপাঠ্য তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে'। অনেকে সহোদরের নিন্দা করিয়াছেন, আমরা সহোদরের প্রশংসা করিব। আমাদের বোধ হয়, সহোদর সম্পাদক বড় রসিক লোক। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারকে পরিহাস করিবার জন্যই এই পত্রিকাখানি প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গের কোন উপকার না হউক, লেখক বর্গের বিস্তর উপকার দর্শিবে।

৫। বলদ মহিমা নাটক। এই নাটকখানির নাম ও কাম উভয়ই সুসংগত। ইহাতে বলদের মহিমা অর্থাৎ বলদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বাক্‌পটুতা, প্রেমিকতা ও রসিকতা সমস্তই সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই। তিনি

সমালোচনার জন্য দয়া করিয়া একখানি পুস্তক আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা আর কি সমালোচনা করিব?

৬। মহানির্ব্বাণতন্ত্রম। পূর্ব্বকাণ্ডম্। কুলাবধূত শ্রীমদ্ধরিহরানন্দ নাথ ভারতী বিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্। শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুরস্য অভিমতানুসারতঃ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশেন তথা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যেণচ সম্পাদিতঃ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র এক আশ্চর্য্য গ্রন্থ। ইহাতে পরমার্থবিষয়ক যে সকল অতিগভীর গূঢ়তত্ত্ব বিনিবেশিত আছে, তাহা আলোচনা করিবার সময় বুদ্ধি ও হৃদয় যুগপৎ চমকিত হয়। ইহার প্রথম কতিপয় উল্লাসের প্রত্যেক শ্লোকই হিন্দুধর্ম্মপ্রবক্তাদিগের সূক্ষ্মদর্শিতা, উদারতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার যশঃস্তম্ভস্বরূপ। হয়ত তোমার সহিত সকল স্থলে মতের একতা হইবে না, হয়ত তুমি যেটি চাও, সকল স্থলে তাহা পাইবেনা; কিন্তু ইহার প্রথমাংশ পাঠ সময়ে তুমি তথাপি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিবে। তোমার একবার বোধ হইবে তুমি কোন বদ্ধকূপ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত জলধিবক্ষে সন্তরণ করিতেছ; আবার মনে হইবে, তুমি শিখরের পর শিখর অতিক্রম করিয়া, কোন দুর্নিরীক্ষ্য তুঙ্গ পর্ব্বতের শীর্ষ স্থলে আরোহণ করিতেছ। ইহার ভাব এমনই প্রশস্ত! এমনই উচ্চ! যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রকে নিরবচ্ছিন্ন মদিরাশাস্ত্র মনে করেন, এবং কল্পিত অকল্পিত সমস্ত কুক্রিয়াকে তন্ত্রশাস্ত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নূতন অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে আমরা একবার মহানির্ব্বাণতন্ত্র খানি আদ্যোপান্ত পাঠকরিবার জন্য অনুরোধ করি।

ইহার মুদ্রাঙ্কণাদিকার্য্য যে অতি পারিপাট্যসহকারে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। রায় কালীকিঙ্কর বাহাদুর এই দুর্ল্লভপুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ভরসাকরি, এদিগের অন্যান্য সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তদীয় সদনুষ্ঠানের অনুকরণ করিয়া, বঙ্গীয় গ্রন্থালয়ের গৌরব বর্দ্ধন করিবেন। ইহার অবশিষ্টাংশ প্রকাশে বিলম্ব কেন!

৭। পুরুবিক্রম নাটক।—বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু আমরা পুরুবিক্রমকে সেই অল্প সংখ্যকের মধ্যেও উৎকৃষ্ট বলিয়া গণনা করি। ইহার রচয়িতার কল্পনাশক্তি আছে, রসানুভাবকতা আছে, এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবারও বিলক্ষণ ক্ষ-

মত্তা আছে। কোন কোন অংশ বীর রসের এমন উদ্দীপক যে, পাঠ করিবার সময় অন্তঃপ্রবৃত্তিচয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কবি, তৃতীয়াঙ্কের আরম্ভে, পুরুরাজের মুখে, যে কবিতাটি আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন, তাহা ভারতবাসী প্রত্যেকের হৃদয়েই গ্রথিত থাকা উচিত। গ্রন্থের ভাষা, প্রথম হইতে শেষ, সর্ব্বত্রই পরিমার্জ্জিত। স্ত্রীলোকদিগের ভাষা আর একটুকু কোমল হইলে অধিক হৃদ্য হইত।

আমরা এই নাটকখানির এত গুলি গুণের কথা বলিলাম। উদাহরণ স্বরূপ সংক্ষেপতঃ ইহার এক আধটি দোষেরও উল্লেখ করিব। পুরুরাজ এই নাটকের নায়ক, এবং রাণী ঐলবিলা ইহার নায়িকা। কবি ইহাঁদিগকে যেরূপ দেবদুর্ল্লভ মনোহর প্রকৃতি দিয়া বিভূষিত করিয়াছেন, তাহা স্মরণেও হৃদয়ে আনন্দ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি সকলস্থলে ইহাঁদের সেই মনোহরপ্রকৃতির সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।)

পুরু মনে প্রাণে ঐলবিলার প্রেমাসক্ত, ঐলবিলাও সর্ব্বান্তঃকরণে পুরুরাজে অনুরক্ত। উভয়েই উভয়ের হৃদয় গভীররূপে পাঠ করিয়াছেন, এবং পাঠ করিয়া হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় দান করিয়াছেন। কিছুই আর পরস্পর অগোচর নাই, ও অদেয় নাই। পুরুর কপটমিত্র তক্ষশীলও ঐলবিলার প্রণয়প্রার্থী। কিন্তু তিনি নিতান্ত নীচপ্রকৃতি কাপুরুষ। ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া, ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় সহোদরাকেও সমাগতযবনসম্রাট্ সেকেন্দরসার নিকট বিক্রয় করিতে, তাঁহার অন্তঃকরণে লজ্জা কি ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই। পুরু ও ঐলবিলা উভয়েই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। যখন পুরুরাজ অস্ত্রাহত হইয়া, শিবিরে শয্যায় পড়িয়া আছেন, তখন তক্ষশীলের কোন ছলপরায়ণ দুষ্ট চর, ছলনা করিয়া, রাণী ঐলবিলার নাম যুক্ত একখানি প্রণয়পত্র তাঁহার নিকট কৌশলে পঁহুছাইয়া গেল। তিনি পত্রের শিরোনামে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, উহা তাঁহার জন্যে নহে, তক্ষশীলের জন্য। তাঁহার অন্তরে এই নিদারুণ আঘাত আর সহ্য হইল না। তিনি একেবারে প্রদীপ্তপাবকবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং যে প্রেমের প্রতিমাখানি এতকাল প্রাণের মধ্যে এত আদর করিয়া, লুকাইয়া রাখিয়া পূজা করিয়াছিলেন, নিমেষের আর অপেক্ষা না করিয়া সেই প্রতিমা পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিলেন। পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিরূপিনী দেবী ঐলবিলাকে নিমেষের মধ্যেই পিশাচী বলিয়া

ঘৃণা করিতে লাগিলেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সংসার নরকতুল্য জ্ঞান হইল।

পুরুরাজের এই প্রকৃতিপরিবর্ত্ত আমাদিগের নিকট নিতান্ত অস্বাভাবিক বোধ হয়, এবং ঐলবিলার প্রতি তিনি যে সকল দুরক্ষর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আরও অস্বাভাবিক। অন্তত: তাদৃশ মহানুভাব ব্যক্তিরএকান্ত অনুপযুক্ত।) ভক্তি আর বিশ্বাস প্রেমের প্রাণ। যে প্রেমে ভক্তি নাই,ও বিশ্বাস নাই, তাহা বস্তুতঃ প্রেম নহে। প্রেমের বিড়ম্বনা। পুরুর প্রেমে ভক্তি ও বিশ্বাস উভয়ই ছিল। তথাপি পলকেই তাহার প্রলয় হইল কেন? ইহাকেই প্রকৃতিগত বৈষম্য বলি। পাঠ করিবার সময় মনে হয়, যেন কোন্ দিগ হইতে সহসা কিসের আঘাত আসিয়া পড়িল, আর কবির কল্পনার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল।

একদণ্ডের মধ্যে অম্বালিকার সন্ন্যাসিনী সাজিয়া বাহির হওয়াও পূর্ব্বোক্ত রূপ অস্বাভাবিক বোধ হয়। অম্বালিকা সুখের দাসী এবং নিতান্ত পাপীয়সী। যখন তাহার সকল সুখ ফুরাইয়া গেল, তখন সংসারে বিরাগ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এই অচিন্তিতপূর্ব্ব বৈরাগ্য জন্মিবার পূর্ব্বে, তাহার হৃদয়ে যে সকল ভাব, তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায়, মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিয়াছে, কবির তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আমরা গ্রন্থকারকে তথাপি আহ্লাদ সহকারে বলিতে পারি যে, তিনি খ্যাতি লাভ করিবেন। তাঁহার নামটি জানিতে পাইলে, আমরা সুখী হইতাম।)

বঙ্গের সুখাবসান নাটক। শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। এদেশে যাঁহারা নাটক লিখিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, তন্মধ্যে হরলাল বাবু একজন অগ্রগণ্য লোক। আমরা তাঁহার এই নাটকখানি পাঠ করিয়া সত্য সত্যই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি।

ইহার কাহিনীটি ইতিহাসমূলক। কিন্তু গ্রন্থকার, ইতিহাস হইতে কএকখানি অস্থিপঞ্জরমাত্র লইয়া, তাহা এমন করিয়া সাজাইয়া তুলিয়াছেন যে দেখিয়া সুন্দর বলিতে ইচ্ছা হয়। পুরুবিক্রমে বাক্যবিন্যাস ও ভাবসংযোজনের যেরূপ প্রশংসনীয় আড়ম্বর আছে, বঙ্গের সুখাবসানে সেরূপ আড়ম্বর নাই। ইহার লেখা তথাপি অধিকতর হৃদয়গ্রাহিণী। পুরুবিক্রম পাঠ করিবার সময়, কবিকে পুনঃপুনঃ মনে পড়ে, এবং পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। হাতে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রহিয়াছে, ইহাও স্মরণ থাকে। এই বীররসের কথা চলিল, এই আদিরস আসিল, এইরূপ অনুভব

হয়, এবং পাঠের পরক্ষণেই হৃদয় সকল কথা ভুলিয়া যায়। বঙ্গের সুখাবসানে তাহা হয় না। ইহার মধ্যে কিয়দ্দূর প্রবিষ্ট হইলে, কবি, কাব্য, বীররস, আদিরস, প্রশংসা, অপ্রশংসা, সমস্তই হৃদয় হইতে একবারে অপসারিত হয়। কেবল, যে কাল ও যে সকল ঘটনার বিবৃতি হইতেছে, তাহার প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ মানসনেত্রের সন্নিধানে বিদ্যমান থাকে। পাঠসময়ে অন্তরে যে সকল ভাব দৃঢ় অঙ্কিত হয়, তাহাও শীঘ্র আর পুছিয়া ফেলান যায় না।

পুরুবিক্রমের সহিত ইহার আর একটি প্রভেদ দেখাইব। পুরুবিক্রমে যাঁহাদের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মনের সকল কথা তুমি বুঝিতে পার না। তাঁহারা কেমন করিয়া হাসিতেন, কেমন করিয়া কাঁদিতেন, কে কি ভাবে কোন কথা কহিতেন, তাহা অনুভব হয় না। বঙ্গের সুখাবসানের সকলকেই তোমার চেন চেন লাগে। ইহাদের সকলেরই মনের কথা, তুমি শ্রুতিমাত্র বুঝিতে পাও। ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করে না, তথাপি তাহাদের কথা হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। তাহারা যখন হাসে, তখন হাসি আসে। তাহারা যখন কাঁদে, তখন চক্ষের জল সংবরণ করা কঠিন হয়।

তবে, ইহাও বলা আবশ্যক যে, কবি সকল চরিত্রে সমান ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।) সৌদামিনীর আদি ও অন্ত একরূপ হয় নাই। পাঠকের সহিত প্রথমে যে সৌদমিনীর পরিচয় হয়, তিনি কোথায় যেন চলিয়া গেলেন; আর এক নূতন সৌদামিনী তাঁহার দেহ পরিগ্রহ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ইনিই যে তিনি, ইহা কোনক্রমেই প্রতীতি হয়না।

হরিপ্রসাদ প্রভৃতির কথাতেও কোন কোন স্থলে কিছু বিশেষ দোষ আছে। হরিপ্রসাদ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন; পার্শ্বস্থ কোনবন্ধু কি একটি ক্ষমার মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, আর অমনি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় হরিপ্রসাদ বসিয়া পড়িলেন। এইরূপ তর্জ্জন ও গর্জ্জন, ও পরক্ষণেই এইরূপ প্রশমন অনেকবার হইয়াছে। গতিকে, ক্রোধ ও ক্ষমা উভয়ই নাটকীয় ক্রোধ ও ক্ষমার ন্যায় একটুকু অভ্যস্তের মত বোধ হয়। কিন্তু বঙ্গের সুখাবসানে দোষের ভাগ অতি অল্প, গুণই অধিক। যাঁহারা বঙ্গদেশে জন্মিয়াছেন, ও লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই নাটকখানি একবার আদ্যন্ত পাঠকরা উচিত।

•০:(-:ঃ০):০•

জাতীয়জীবন

বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ।

গতি, বেদনাবোধ ও একপ্রাণতা এই তিনটিকে আমরা জাতীয়জীবনের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। বঙ্গভূমিতে এবং ভারতবর্ষে যাঁহারা জন্মিতেছেন আর মরিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই লক্ষণ কয়টি কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে, এই প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

ভারতবর্ষ বলিলেই বঙ্গভূমি তাহার অন্তর্গত হয়। তথাপি যে, এই দুইয়ের পৃথক্ নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার বিশিষ্ট হেতু আছে। আমরা চীন, তাতার, রুশ, ফঁরাশির কথা যেমন ইতিহাসে, সংবাদপত্রে, ও লোকমুখে অবগত হই, ভারতবর্ষের কথাও বঙ্গীয় অনেকেই সেইরূপে অবগত হইয়া থাকেন। ধিক্ আমাদিগের গর্ব্বিতশিক্ষায়, আমরা পরের মুখে ভারতবর্ষের দুচারি কথা যাহা শুনিলাম, আজ পর্য্যন্তও তাহা হইতে অধিক কিছুই জানিতে পারিলাম না। কিন্তু আমরা জ্ঞানচর্চ্চা ও চিন্তাশক্তির যথোচিত ব্যবহার বিষয়ে অলস বলিয়া নিতান্ত নিন্দনীয় হইলেও, বঙ্গদেশ বিষয়ে বাধ্য হইয়াই অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করি। আমরা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আশৈশব বঙ্গবক্ষে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি এবং অন্তকালেও বঙ্গীয় মৃত্তিকায় বিলীন হইতেছি। বাঙ্গালিকে আমরা রগে রগে চিনি। বাঙ্গালির মধ্যে যাঁহারা, শিক্ষিত হইয়া, অথবা শিক্ষার ঘ্রাণ মাত্র গ্রহণ করিয়া, অভিমানে স্ফীত হইয়াছেন এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে লীলানর্ত্তকের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা জানি; এবং যাঁহারা নিতান্ত নিরক্ষর,—ইংলণ্ড নামে বাস্তব একটা দেশ আছে, না এটা ফিরিঙ্গীদিগের একটা ফাকি, এবিষয়েও যাঁহারা সংশয়ারূঢ়, তাঁহাদিগের কথাও আমরা বলিতে পারি। বঙ্গের নগরবাসী নব্যবিলাসীরা বিলাসতরঙ্গে কি রূপ দোলায়িত হইতেছেন, গ্রামবাসী মহাপুরুষেরা জাত্যভিমানের ভাণ করিয়া জাতীয় বন্ধন কিরূপ ছেদন করিতেছেন;—বঙ্গের ছাত্রেরা রাত্রিতে কি ভাবে, শিক্ষকেরা দিবসে কি শিক্ষা দেন;—বঙ্গে বৃদ্ধ, বর্ষীয়সী ভার্য্যার

সহিত, কি কথার প্রসঙ্গে সময় যাপন করেন, সুশিক্ষিত দম্পতী পরস্পরের অন্তরে কি ভাবের উদ্দীপন করেন; লোকের সহিত লোকের দেখা হইলে হাটে, ঘাটে, মাঠে, কি বিষয়ে কথো-পকথন হয়, বাঙ্গালির হৃদয় কোন্ কথায় নাচিয়া উঠে, কোন্ চিন্তায় অব-সন্ন হইয়া পড়ে, এই সমস্তই আমরা সকলে বিশেষ রূপে অবগত আছি। সুতরাং বঙ্গদেশে জাতীয় জীবনের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় কি না, সে বিষয়ে বিচার করিতে অবশ্যই আমরা সর্ব্বথা অধিকারী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গতিই জীব-নের প্রথম লক্ষণ। বাঙ্গালির মৃতদেহে জীবনী গতির সঞ্চার আছে কি না, প্রথমে ইহারই পরীক্ষা কর। অনেকে বলেন, বাঙ্গালি এতদিন মরিয়া রহি-য়াছিল, ঐ দেখ আবার বাঁচিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিতেছে। ঐ দেখ, বাঙ্গালি দেশে বিদেশে সভাস্থলে দণ্ডা-য়মান হইয়া, বাহু তুলিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতেছে; আপনিও কাঁদিতেছে, আর যে নিকটস্থ হয়, তাঁহা-কেই কাঁদাইতেছে। ঐ দেখ, বাঙ্গালি রঙ্গভূমিতে কি রূপ অদ্ভুত বিক্রম প্রদর্শন করিতেছে; করে হংসপুচ্ছরূপ দুর্ব্বার অস্ত্র ধারণ করিয়া কত দেশকেই উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেছে, বাক্যে ও কথোপকথনে কি অনির্ব্বচনীয় দেশ হিতৈষিতার পরিচয় দিতেছে। যাঁহারা বঙ্গদেশে জাতীয়জীবনের এই বাহ্য স্ফুর্ত্তি দর্শন করিয়া, আনন্দাশ্রু বিস-র্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারা সরল ও স্বদেশবৎসল। আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের ঐকমত্য নাই। তাঁহারা যাহা উন্নতি বলেন আমরা তাহাকে অবনতি বলি; তাঁহারা যাহাতে গতির লক্ষণ দেখিতেপান, আ-মরা তাহাতেই স্তম্ভিতভাব দর্শন করি।

গতি দুই প্রকার। এক আপনার বলে, আর পরের বলে। বঙ্গদেশ-বাসীর বর্ত্তমান গতি আমাদিগের বিবেচনায় এই শেষোক্ত শ্রেণীর। বাঙ্গালি সব শিখিতেছে, কিন্তু স্বাব-লম্বন কাহাকে বলে, তাহা কিছুতেই অনুভব করিতে পারিতেছে না। বন্য বানর ও বনভল্লূক অপেক্ষা গৃহপালিত বানর ও ভল্লূক অনেক বিষয়ে বিচিত্র নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। তথাপি কে তাহাদিগকে কোথায় শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে? মৃত বস্তুতেও যদি তাড়িতশক্তির প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ক্ষণকাল তাহাতে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব স্ফুর্ত্তির সঞ্চার হয়। বাঙ্গা-লিরও এইক্ষণ ঠিক্ তথাবিধ স্ফুর্ত্তিলাভ হইয়াছে। বাঙ্গালি এইক্ষণ যে কোন

কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অতি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহার অন্তঃপ্রদেশে পরকীয় শক্তির প্রচ্ছন্ন অবস্থান অবলোকিত হয়। ইহা প্রশংসার কথা নহে, ইহা ভরসার কথাও নহে। উঠ ত, আপনার বলে উঠ। যদি পরে না ধরিলে উঠিতে না পার, তবে যে ভাবে পড়িয়া আছ, সেই ভাবেই পড়িয়া থাক। তাদৃশ পতিত দশাও এবংবিধ উত্থিতদশা হইতে শতগুণে শ্লাঘনীয়।

এই যে দ্বিবিধ গতির উল্লেখ হইল, বাঙ্গালির পুরাতন ও অধুনাতন অনুষ্ঠান সমূহ হইতে ইহার দুএকটি উদাহরণ দিব। বহুদিন পূর্ব্বে—বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। গ্রন্থের নাম চিন্তামনি—দীধিতি, গ্রন্থকারের নাম রঘুনাথ। গ্রন্থখানি আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। যদি নয়নাবর্ত্তনের নাম অধ্যয়ন হয়, তাহা হইলে বোধ হয় দশ দিনেই শেষ করা যাইতে পারে। আজ কাল তুমি, আমি, যদু, মাধু সকলেই গ্রন্থকার। কিন্তু বল দেখি, এক বার ঐ ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই ছবির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, কাহার অন্তর না বিদীর্ণ হয়? ইহার পরেও কি বলিবে যে, বাঙ্গালির চিন্তাশক্তি নূতন গতি লাভ করিয়াছে?

আজ প্রায় তিন শত বৎসর হইল, একজন বাঙ্গালি ধর্ম্মজগতে এক নূতন বিপ্লব সংঘটন করেন। সে সময়ে ইয়ুরোপে মহামতি লুথর জ্বলন্তবহ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত ছিলেন। যখন সেই বাঙ্গালি যুবা গৃহে গৃহে প্রেমের স্বর্গীয় অমৃত বিতরণ করিয়া বাঙ্গালির বিষদগ্ধ জাতীয়দেহে নব জীবন প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া করযোড়ে প্রণাম করিল। এখন সেরূপ করে না কেন? বাঙ্গালি এইক্ষণ স্বদেশে ধর্ম্মের ধ্বজা উত্তোলন করিতে হইলেও পরদেশ হইতে তাহার সামগ্রী সংকলন কর।

এদেশের ভূস্বামীদিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে নিজবিক্রমে নিজস্ব রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন। অনেকের প্রতাপ ও প্রভাবের পুরাতন কাহিনী অদ্যাপি লোকে উপন্যাসের কথার ন্যায় কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করে। তাঁহাদিগের স্থলে এইক্ষণ কি দেখি? না, কতকগুলি সূক্ষ্মাম্বর-পরিবৃত সুদৃশ্য পুতুল। বাতাসের ভরও সয় না। শয্যার একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে অঙ্গন্যাস করিতে হইলেও, পরের সাহায্য না হইলে চলে না। এক সামান্য লোকের ঘর হইতে রাজা রাজবল্লভের অভ্যুদয় হয়। রাজবল্লভের বংশধরেরা অন্নের জন্য লালায়িত।

লোকে অর্থের যত প্রকার নিন্দা করুক, অর্থ-বলের অভাব হইলে, জাতীয়যন্ত্র আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসে। যখন বিস্মার্ক ফরাশিদিগকে দুইশত কোটি মুদ্রার ঋণে আবদ্ধ করেন, তখন তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, ফ্রান্স এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে কখনই অব্যাহতি লাভ করিবে না। এই পর্ব্বতভারেই ফ্রান্স একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে। ফ্রান্সের অচিন্তনীয় অর্থ-বল থাকায় দুচারি বৎসর যাইতে না যাইতেই তাহার সমস্ত আপদ ঘুচিয়া গেল। ইংরেজদিগের এইক্ষণ আর পূর্ব্বের মত বীরবিক্রম নাই। ইংরেজের রণভেরীর নিনাদ শ্রবণে বিজাতীয়দিগের অন্তরে এইক্ষণ আর পূর্ব্বের মত ভয়ের সঞ্চার হয় না। সৈনিক বলের তুলনা করিলে, ইংলণ্ডকে জর্ম্মাণী কিংবা রুশিয়ার সহিত গণনা না করিলেও, অসংগত নহে। তথাপি দেখ, শুধু অর্থবলেই ইংরেজ সকলের সহিত সমান ভাবে স্পর্দ্ধা করিয়া রহিয়াছে। ঘোরতর শত্রুও ইংলণ্ডীয় বৈজয়ন্তীকে দূর হইতে নমস্কার করে, এবং ইংলণ্ডের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনবার গণনা করে। বাঙ্গালির অর্থবল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, না দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে? এদেশে যে ভয়ানক দারিদ্র্য-দুঃখ উপস্থিত, প্রত্যেক পুরাতন ঘরই কি তাহার সাক্ষী নহে? অর্থাগমের যতগুলি প্রশস্ত-দ্বার কল্পনা করা যাইতে পারে, বাঙ্গালি তাহার একটিতেও সাহস সহকারে প্রবিষ্ট হয় না; সঙ্গীর ভৃত্যের ন্যায় পরের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া কোন প্রকারে উচ্ছিষ্ট ভোজন দ্বারা দিনপাত করে। ক্ষুধার সময় অন্ন পাইলেই বাঙ্গালি পরিতৃপ্ত হইল। সে অন্ন কোথা হইতে কিরূপে আসিল, তাহা চিন্তা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। শীতের সময় একখণ্ড বস্ত্র পাইলেই সে কৃতার্থ হইল। সে বস্ত্র নারিকেল বৃক্ষে জন্মে, না অন্য প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহাও সে জানিতে চায় না। কোন জাতীয় মনুষ্য সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হইলে, সে জাতিকে গতিবিশিষ্ট বলা প্রলাপ মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ বেদনাবোধ। বাঙ্গালির জাতীয় অঙ্গে বেদনাবোধ আছে, একথা যিনি বলেন, তিনি মিথ্যাবাদী। বাঙ্গালি সহিষ্ণুতায় পাষাণকেও পরাজয় করিয়াছে। এমন প্রতাপভক্ত জাতি ত্রিভুবনে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালির শরীর মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত হয় নাই। উহার আপাদমস্তক সমস্তই কঠিন প্রস্তররচিত। কেহ আঘাত করিলে তাহার প্রত্যুত্তরে আঘাতকরা যে

পরমসেব্য পুরুষধর্ম্ম, কেহ অপমান করিলে সেই অপমানের প্রতিবিধান করা যে, মনুষ্যের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য একথা যে দিন বঙ্গদেশে প্রতিহৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে, সেদিন বাঙ্গালার মুখচ্ছবি পরিবর্ত্তিত হইবে।

কর্সিকা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ভূমধ্যসাগরের এক প্রান্তে মৃত্তিকার একটি স্তূপমাত্র। কর্সিকার লোকেরা ধনবৈভবে বিশেষ গৌরবান্বিত নহে। তাহাদিগের মধ্যে গৌরবের তেমন আর কোন লক্ষণও বর্ত্তমান নাই। কিন্তু কর্সিকদিগের প্রকৃতিতে দুইটি বড় ভয়ঙ্কর গুণ আছে। এক অভিমান, আর প্রতিবিধিৎসা। তাঁহাদিগের অঙ্গে অতি সামান্য আঘাতেই বিষম বেদনা অনুভূত হয়। কেহ তাহাদিগকে এ পুরুষে অনুচিত রূপে অপমান করিলে, সাত পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। ইয়ুরোপের অন্যান্য জাতীয় লোকেরা একথা বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন, সুতরাং, তাঁহারা ভুলিয়াও কর্সিকাবাসীকে অপমান করেন না।

বাঙ্গালির জাতীয় প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে ইহার বিপরীত। বাঙ্গালি দয়ার্দ্র চিত্ত, কোমল স্বভাব। নবনীত যেমন আতপ তাপে উনিয়া পড়ে, বাঙ্গালির ক্রোধও সেইরূপ অশ্রুজলেই পরিণত হয়। উহা কখনই ভয়ঙ্করী রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে না। কে ইয়ুরোপকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলে? ইয়ুরোপ ক্ষত্রিয়। পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন স্থান স্বভাবতঃ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, সেই স্থান বঙ্গদেশ; বৈরাগ্য ও ক্ষমার চিরনিকেতন, শান্তির অক্ষয় প্রস্রবন। ইয়ুরোপের পদনখে আঘাত কর, ইয়ুরোপ অমনি গর্জ্জিয়া তোমার মুণ্ডচ্ছেদন করিবে। আর, বাঙ্গালির একগণ্ডে চপেটাঘাত কর, বাঙ্গালি তৎক্ষণাৎ পরমভাগবত ভক্তের ন্যায়, তোমার দিকে আর এক গণ্ড ফিরাইয়া দিবে। বাঙ্গালি গৃহস্থ হইয়াও বানপ্রস্থ, কিছুতেই তাহার ভ্রূভঙ্গ নাই। যদি কেহ তাহার মস্তকে অপমানের পঙ্কিল কলঙ্ক অজস্র ঢালিয়া দেয়, তাহার উত্তর এই,—গঙ্গায় কে কি না নিক্ষেপ করে। নিরাপদ জীবনই বাঙ্গালির জীবনগত আশার শেষ স্থান। অঙ্গ আছে, তাহাতে আঘাত কর, আপত্তি নাই। হৃদয় আছে, তাহাকে অপমানের মুর্ম্মুর দাহনে দগ্ধ কর, ক্ষতি নাই। কিন্তু সাবধান! বাঙ্গালির শান্তিভঙ্গ করিও না। বাঙ্গালি যে গভীর যোগ নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে, যে নিদ্রার মহীয়সী শক্তিতে তাহার শরীর এই কয় শতাব্দী যাবৎ সর্ব্ব প্রকার বেদনাশূন্য হইয়াছে, দেখিও, কিছুতেই যেন তাহার ব্যাঘাত না হয়।

কেহ কেহ এইরূপ বলিতে পারেন যে, অন্যান্য জাতীয় লোকেরা যুগান্তের সাধনা দ্বারাও যে দুর্ল্লভ ধন লাভ করিতে পারে না, বাঙ্গালি যদি স্বভাবতঃই সেই শান্তরসাশ্রিত বৈরাগ্যসম্ভূত অমূল্যধনে অধিকারী হয়, ইহাতে ক্ষোভ করিবার আবশ্যক কি ? এই কথার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিব যে, ইহাতে দুঃখ করিবার তেমন কিছুই কারণ নাই। তবে এই এক দুঃখ, সংসার নিতান্ত খলস্বভাব; যদি কাহারও অঙ্গে বেদনা বোধ না থাকে, কেহ তাহাকে তজ্জন্য দয়া না করিয়া, আরও অধিক করিয়া আঘাত করে ; যখন বেদনা বোধ জন্মে, তখন আঘাত করিতে বিরত হয়। যে জাতি জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া অধঃপাতকেই উন্নতি জ্ঞান করে, অপমানের লৌহ শৃঙ্খলকেই সম্মানের স্বর্ণহার বলিয়া কণ্ঠে তুলিয়া লয়, কেহ অভিসম্পাত করিলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, কেহ আঘাত করিলে, জানুপাত করিয়া তাহার গুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, দ্রৌপদী যেমন যুধিষ্ঠিকে বলিয়াছিলেন, আমরাও তাহাদিগকে সেইরূপ বলি।—

> অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রম—
> শ্চিরায় পর্য্যেষি সুখস্য সাধনম্।
> বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ কার্ম্মুকং
> জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্॥

এখন বলবিক্রম সমস্ত হারাইয়া সহিষ্ণুতাকেই যদি সুখের একমাত্র সাধন বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে আর বৃথা বীরজনোচিত বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি ? মাথায় জটা বান্ধ, বাকল পর, এবং বনে গিয়া বনচারী তপস্বীর ন্যায় বহ্নিতে আহুতি ঢালিয়াই জীবন উদ্‌যাপন কর।

বাঙ্গালির একপ্রাণতা আছে কি না, এবিষয়ে আলোচনা করা অপেক্ষা দুদণ্ড নিষ্কর্ম্ম বসিয়া থাকিলেও অধিক পুণ্য আছে। আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, যাহারা স্বজাতির দুঃখেও দুঃখিত হয় না, তাহারা কাক, কুক্কুর, শৃগাল হইতেও হীন। এই হৃদয়বিদারক নির্ঘাতকথা বলিবার সময়, বাঙ্গালি ! তোমাকেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। যদি কোথাও একটি কাকের একটিমাত্র পক্ষ উৎপাটিত হয়, সহস্র কাক সেখানে জড় হইয়া এক ভয়ঙ্কর কোলাহল উপস্থিত করে। যখন একটি শৃগাল হর্ষে কি দুঃখে আপনার কণ্ঠধ্বনি উত্তোলন করে, তখন কোথা হইতে, কাহার শাসনে, শত শত শৃগালকণ্ঠ তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া দশদিক্ নিনাদিত করিয়া তুলে। পতঙ্গচয়ও পালে বদ্ধ হইয়া উড়িতে জানে। অঙ্গুলির স্পর্শভর সয় না, এইরূপ পিপীলিকাগুলিও শ্রেণীবন্ধন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করে।

কিন্তু বাঙ্গালি, মনুষ্যজাতির মধ্যে অপরাপর অশেষ গুণে প্রশংসনীয় হইয়াও দশজনে একহাড়, একপ্রাণ হইতে সমর্থ হয় না!!!

বাঙ্গালির মধ্যে একজন যখন হাসে, আর একজন তখন কাঁদিতে থাকে; এবং একজন যখন কাঁদে, আর একজন তখন খল খল করিয়া হাসিয়া উঠে। সকলে একসঙ্গে হাসিলে সেই হাসি, হাস্যরসকে অতিক্রম করিয়া, কিরূপ গভীরার্থদ্যোতক হয়; সকলে একসঙ্গে কাঁদিলে, সে কান্না কোথায় গিয়া পঁহুচে, তাহা বাঙ্গালি অনেকদিন হইতে ভুলিয়া গিয়াছে। একটির নাম এক, এক কোটির নাম এক কোটি, গণিতের এই সামান্য কথাও, অনেক বাঙ্গালির খড়ি পাতিয়া শিখিতে হয়। বাঙ্গালার মাঝিরা বহর বান্ধিয়া বাণিজ্য পথে যাত্রা করে। যখন সেই বহরের প্রান্তবর্ত্তিনী কোন তরণীর উপর দস্যুর আক্রমণ হয়, তখন সমীপস্থ নাবিকেরা দুর্গা দুর্গা স্মরণ করিয়া, দ্রুতগতি সেই স্থান পরিত্যাগ করে। দশজন বাঙ্গালি, নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, সাহসে বুক ভর করিয়া, কোন কার্য্যে প্রবিষ্ট হয়। যদি দৈবের দুর্ব্বিপাকবশতঃ তন্মধ্যে একজন বিপদে পড়ে, আর নয়জন অমনি তাহাকে উদ্ধত, অসমসাহসী ও অপরিণামদর্শী বলিয়া তিরস্কার করিতে করিতে দূরে ফেলিয়া চলিয়া যায়। তাহার সহিত যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, কএক দিন তাহাও অতি যত্নে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। যে জাতির জাতীয় বন্ধন এরূপ ছিন্ন ভিন্ন, তাহার ভরসা কোথায়! যে জাতির মর্ম্মাস্থি পর্য্যন্ত এইরূপ ঘুণে খাওয়া হইয়া রহিয়াছে, তাহার আবার একটা জীবন কি?

আমরা এতক্ষণ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালির কথা বলিলাম। কিন্তু যখন জাতীয় জীবনের কথা প্রসঙ্গে আমরা সসাগরা ভারতভূমি ও ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যজাতির নাম গ্রহণ করি, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হয়, বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া পড়ে, অন্তরের লুক্কায়িত শোকসিন্ধু অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠে। মেঘমণ্ডিত হিমাচল পুংক্তিতে ধবলগিরি বড় উচ্চ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবিরা, কল্পনাকে ঊর্দ্ধে তুলিতে হইলে, স্তিমিতনেত্র হইয়া উহার উচ্চতার ধ্যানে নিমগ্ন হন। ভারতবর্ষের মস্তক এক সময়ে সেই ধবলশৃঙ্গকেও অতিক্রম করিয়াছিল। যে ভয়সংকুলা সমুদ্রমালা, মেখলার ন্যায়, ভারতভূমির কটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, নাবিক সম্প্রদায় তাহার দুস্তর তরঙ্গরাজি দর্শন করিয়া আত্ম বিস্মৃত হন। ভারতের প্রতাপতরঙ্গ এক সময়ে উহা অপেক্ষাও উত্তাল

ছিল। সেই ভারত এইক্ষণ উদীচীন পর্ব্বতসীমা হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত, এবং সিন্ধুনদরেখা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত এক সুবিস্তীর্ণ ভয়ঙ্কর শ্মশান। বায়ু প্রকৃতির দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ন্যায়, হুঁ। হুঁ। করিয়া বহিতেছে; নদীর জল, যেন জিজ্ঞাসু হইয়া, জোয়ারে উঠিতেছে, ভাটায় নামিতেছে, বৃক্ষরাজি নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পুরাতন বৈভবের সাক্ষীরূপী অচল সমূহ নীরবে অবলোকন করিতেছে, কেহ কোনকথার উত্তর দেয় না। ভারত—শ্মশান!

ভারতবর্ষে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ রামচন্দ্রাদি পুরুষপুঙ্গব সকল কোন দিন লীলা খেলা করিয়াছেন; ব্যাস যে এদেশের কবি ছিলেন। শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যোগীরা যে এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, শাস্ত্র না খুলিলে কে সে কথায় প্রত্যয় করে? সেই ব্রহ্মণ্য তেজ, সেই দুর্দ্দম ক্ষত্রিয় জাতি এইক্ষণ কোথায়? বরদায়, না বুন্দেলখণ্ডে? যদি এমন কথা মুখে আন, তবে মহাপাপ হইবে। ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় এক লক্ষ বার মরিয়াছে। ভারতবর্ষের চতুঃসীমাতেও তাঁহাদিগের চিহ্ন নাই। যেমন দেবতারা দুর্গন্ধময় অপবিত্র স্থান হইতে দূরে পলায়ন করেন, তাঁহাদিগের পবিত্র আত্মা ও সেই রূপ এই নিরয় নিবাস পরিত্যাগ করিয়া এইক্ষণ ইয়ুরোপ প্রভৃতি পার্থিব স্বর্গে নরদেহ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

পৃথিবীতে অনেক দেশই উঠিয়াছে ও পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত কোন দেশই কোথাও এইরূপ একেবারে নিপাত যায় নাই। ভারতবর্ষকে নাড়িবার জন্য শত চেষ্টা কর, ভারতবর্ষ এক্ষণ আর নড়ে না। উহার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সূচিভেদ কর, তথাপি উহার অনুমাত্র দুঃখ বোধ হয় না। যদি পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হয়, তবে ভিখারীর বেশে, ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে পরিভ্রমণ কর। দেখিবে, কোথাও কেহ স্ত্রীর বদনারবিন্দ দর্শন করিয়া আহ্লাদে মত্ত রহিয়াছেন, কেহ অঙ্গ হইতে পরকীয় পাদুকার রজস্পর্শ প্রক্ষালন করিয়া, সেই অঙ্গে সুগন্ধিবিলেপন প্রদানকরিতেছেন, কেহ বিদেশীয় প্রভুর প্রীতি সাধনের জন্য একটি কবিতা রচনা করিতেছেন, কেহ বা স্বদেশীয়দিগের উৎপাড়ন করিয়া জাতিমানের গৌরব বাড়াইতেছেন। কিন্তু অত গৌরবের ভারতভূমি পৃথিবীর জাতীয় সমাজে আজ যে সামান্য একখানি আসনও প্রাপ্ত হয় না, এই ভাবিয়া কাহারও চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রুবারি বিনিঃসৃত হইতেছে না। ভারতবর্ষ যে একটা কিছু ছিল, কি

আছে, ইহাও কাহারও মনে স্থান পায় না। সকলেই শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায়, অথবা কূর্ম্মশাবক কি শম্বুকের ন্যায়, আপনাতে আপনি লুক্কায়িত!

পুরাণে আছে, সতীশোকবিহ্বল মহাদেব, যখন সতীর মৃতদেহ মস্তকে বহন করিয়া, প্রমত্তের ন্যায় দেশে দেশে বিচরণ করিতে ছিলেন, তখন চক্রপাণি সুদর্শনচক্র দ্বারা তাহা বহুধা বিভক্ত করিয়া নানা স্থানে ফেলিয়া দেন। ভারত-দেহের ও এইক্ষণ ঠিক্ সেই দশা উপস্থিত। উহার কোথায় হাত, কোথায় পা, কোথায় কি রহিয়াছে, কিছুরই আর নির্ণয় নাই।

যখন কেহ নদীর কলকলায়মান ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া প্রাণের জন্য হাবু ডুবু খায়, তখন শত্রু হউক, আর মিত্র হউক, যে কেহ তাহাকে নিতান্তগাঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে, সে ই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তল পড়ে। জীবিত ব্যক্তির আঘাতও প্রাণপ্রদ, কিন্তু মরণোন্মুখ ব্যক্তির আলিঙ্গন ও ভয়ঙ্কর। ভারতবর্ষ যখন ডোবে ডোবে, তখন পশ্চিম হইতে যবনজাতি আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। সজীব ভারতবর্ষের সহিত বৈরব্যবহার করিলে, যবনের অমঙ্গল হইত না। কিন্তু মরণোন্মুখ ভারতবর্ষের কণ্ঠে বাহুবন্ধন করিয়া, এদেশের যবনজাতিও দেখিতে দেখিতেই রসাতলে গেল। পূর্ব্বে যাহারা রঘু প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ বীরের ভৈরব প্রহারেও টলে নাই, এইক্ষণ তাহারা মৃতের সহিত অমিত্রতা করিয়া শবশয্যায় শয়ান হইল। যেমন এখনকার হিন্দুও আর সে হিন্দু নহে, তেমন এদেশের এখনকার মুসলমানদিগকেও কখনই আর কুতব, বাবর ও আকবর প্রভৃতির বংশধর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উভয়ই সমান, নিরাকাঙ্ক্ষ, নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল। একত্র জড়াজড়ি হইয়া উভয়েই এক সমাধিতে পড়িয়া রহিয়াছে।

কালের আবর্ত্তনে ভারতবর্ষ এইক্ষণ এক আশান্বিত, উদ্যমপূর্ণ, সজীবজাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে। মুসলমান যেরূপ স্বমূলপরিভ্রষ্ট হইয়া ভারতবৈভবরূপ কাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল; পরিণামদর্শী বুদ্ধিমান ইংরেজ তাহা করে নাই। ইংরেজের মূলটা ঠিক আছে, সুতরাং প্রাণপুষ্টির ভরসা আছে। ইংরেজ জাতির প্রাণ-বল প্রয়োগে মৃত ভারতবর্ষ আবার বাঁচিয়া উঠিবে কি না, ইহাই এইক্ষণ চিন্তার বিষয়। অতীত-সাক্ষী ইতিহাস একথার কি মীমাংসা করেন?

জীবন সরোবর।

জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

-※※-

দেখি বাল ভানু তলে,
রাঙা সরসীর জলে,
ভাবিনু বেলায় আরো হবে শোভাময়।
শান্তি সমীরণ ভরে,
খেলিবে এ সরোবরে,
ফুল্ল হয়ে মনোরথ কলিকা নিচয়॥
ভাবিলাম আরো কত,
সৌভাগ্য কুসুম শত
ফুটিবে, বহিবে সদা সুখের মলয়।
কি ভাবিতে কি হইল,
মেঘে সব আবরিল,
ঝড়ে ঝড়ে সারা দিন হইলেক ক্ষয়॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

২

দেখি সরঃ সন্নিধানে,
সরস যৌবন বনে,
সুন্দর সতেজ বৃক্ষ-তরু সমুদয়।
ভাবিনু অচির কালে,
ইহাদের ডালে ডালে,
ফলিবে মুকুলে ফল শত অভ্যুদয়॥
আশ্রিত আশার লতা,
ভাবিতে মেলিল পাতা,
ছাইল তখনি সব করি ছায়াময়।
রোগ শোক কীট তারে,
দিল সব ছারে খারে,
ঘটনা তুফানে পড়ি বাকি হলো নয়॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

৩

ইহার লাবণ্য জলে,
সৌন্দর্য্য শৈবাল দলে,
ভাবিলাম মরালিনী হইয়ে উদয়।
প্রণয় শম্বুক আশে,
যে কালে হৃদয়াকাশে
ভাসিবে, জুড়াবে তনু পরশে নিশ্চয়॥
হাব ভাব লীলারঙ্গে,
নাচিবে সুখ তরঙ্গে,
জানিব না স্বপনেও দুঃখ কারে কয়।
নিদয় ব্যাধের প্রায়,
দেখা মাত্র হতে তায়,
বাঁধিল কিরাতকাল জালে অসময়॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

৪

বহি যত্নে চঞ্চুপুটে,
শুষ্ক তৃণ পত্র কুটে,
বাঁধিলাম নীড় তীরে তরুর আশ্রয়।
আবাস আকাশ করে,
শাবক কাকলি রবে,
ভরিবে সদাই এই আশা অতিশয়॥

উড়িবে আপন ভরে,
সুখের জীবন সরে,
দেখিব কোটরে বসি আনন্দে উভয়।
আশা ই হইল সার,
পাখা না ফুটিতে তার,
বাতাসে উলটি ডাল সব কৈল লয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

৫

নির্ম্মল আকাশ তলে,
সুখে সহচর দলে,
খেলিতেছিলাম ভরা উৎসাহে হৃদয়।
কখন ভাবনা ছলে,
ভাবি নাই প্রতিকূলে,
হাসির প্রকাশে মুখ ছিল জ্যোৎস্নাময় ॥
ক্রমে যত হলো বেলা,
সঙ্গীরা ছাড়িল খেলা,
চলি গেল রাখি সবে শূন্য জলাশয়।
লুকালো সুন্দর শোভা,
নির্ম্মল আকাশ প্রভা,
ভাবনাতপনে সব আজি মরুময় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

৬

দেখিনু মক্ষিকাগণে,
বাসাইতে প্রাণ পণে,
সারাদিন পরিশ্রমে মধুক্রম চয়।
ভাবিনু এ কালে কালে,
গড়িয়া মধুপ্থ ডালে,
ভরিবে মধুতে গৃহগর্ত্ত সমুদয় ॥
আসিবে শিশির যবে,
ইহার আশ্রয়ে তবে,
কাটাইবে সকলে সে দুঃখের সময়।
হায় কি দেখিনু পরে,
বাসা ভাজি মেয় পরে,
পরের কারণে হয় যা কিছু সঞ্চয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

৭

মনে বহু সাধ করে,
করিলাম সরোবরে,
কুমুদ কহ্লার ভৃঙ্গ পঙ্কজ আলয়।
পোষিনু মরালগণে,
চক্রবাক বধূসনে,
করিতে সরসীতট চির শোভাময় ॥
যতন করিতে সব,
মিলিল আসি বিভব,
কিন্তু কি কহিব দুঃখ কহিবার নয়।
নিশির সঙ্গিনী যারা,
দিবস না দেখে তারা,
দিবসরঞ্জক নিশা-মুখে নাহি রয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয়!

৮

আশার আকাশে চড়ে,
ভাবি কভু এই সরে,
যদিও জীবন নীর ক্ষীণ অতিশয়।
হতে পারে কোন দিন,
ইহার এ শোভাহীন-
শূন্য শুষ্ক বৃন্তচয় গুণ গুণ ময় ॥
এ শীর্ণ মৃণাল ডালে,
হতে পারে কোন কালে,

পুন নব মনোবৃত্তি-পলাশ উদয় ।
মন সদা এই ভাবে,
দিবা নিশি ভেবে ভেবে,
হলো শুধু আশা-নভঃ কৌতুকনিলয় ॥
জীবন সরসে দেখ কি ভাবি কি হয় ।
(প্রবাসী)

গারোদিগের বিবরণ ।

ময়মনসিংহের উত্তর এবং গোয়ালপাড়ার দক্ষিণে যে পর্ব্বতশ্রেণী বর্ত্তমান আছে, তাহাকে গারোপর্ব্বত বলে; এবং ঐ পর্ব্বতবাসী লোকেরা গারো নামে অভিহিত হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে,গারোগণ ভীমের ঔরষে হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম লাভ করে। ইহারা অত্যন্ত বলবান্ ও পরিশ্রমশীল। গারো পর্ব্বতহইতে যে সকল রমণীয় পয়ঃপ্রণালী নির্গত হইয়াছে, গারোগণ সাধারণতঃ তাহাদের পারে মাচা নির্ম্মাণ করিয়া বাস্তব্য করে।

গারোরা 'ন হিন্দু ন তুরুষ্ক।' ইহারা কখনও কোন বিপদে পড়িলে, কি ইহাদের কোন আত্মীয় ব্যক্তির ব্যামোহ হইলে, 'দেও' পূজা করে। পূজার প্রণালী অত্যন্ত আশ্চর্য্য। একটি বাঁশের কঞ্চী এক স্থলে রোপণ করিয়া, তাহাতে কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষীর পাখা বন্ধন করে, এবং একটি জীবিত কুক্কুট আনিয়া, তাহার গলদেশ ছিন্ন করিয়া, তদুদ্গত রক্ত ঐ কঞ্চীতে উৎসর্গ দেয়। ইহাতেই আরাধ্য 'দেও' পরিতৃপ্ত হন।

গারোদিগের আহারের কোন নিয়ম নাই। ইহাদিগকে একপ্রকার সর্ব্বভক্ষ হুতাশন বলিলেও বলা যাইতে পারে। সাপ, গোসাপ, কুকুর, বেঙ, বানর, মহীষ,গরু, হাতি ইত্যাদি সকল জন্তুই ইহারা আহার করে। কেবল ব্যাঘ্রমাংস আহার করে না। ব্যাঘ্রকে ইহারা দেবতুল্য মান্য করে। কখনও কোন বিষয়ে শপথ করিতে হইলে, ব্যাঘ্র কিংবা তাহার অস্থি স্পর্শ করিয়া শপথ করা প্রচলিতরীতি। ইহাদের মধ্যে লিখা পড়ার চর্চ্চা একেবারেই নাই। কেহই কোন প্রকার লিখা পড়া জানে না।

গারোগণ অত্যন্ত মদ্যপায়ী। ইহারা ভাত দিয়া নিজেরাই সুরা প্রস্তুত করে; তাহাতে কোন প্রকার ভাটি দেয় না। এই মদিরা পচাই-সরাপ নামে

বিখ্যাত। স্ত্রী পুরুষ সকলেই মদিরা পানে সমান অনুরক্ত। মদিরাপান ব্যতীত ইহাদের শুভ কি অশুভ কোন কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

ইহাদের মধ্যে ব্যবসায়েরও কোন নিয়মনাই। সকল ব্যবসায়ই ব্যবসায়। কৃষিকার্য্য গারোভূমিতে উত্তম রূপে প্রচলিত আছে। ধান্য ও সর্ষপের কৃষিই অধিক। কখনও কখনও মরিচ, তুলা, কোষ্টা ইত্যাদির ও চাষ হইয়া থাকে। ইহারা মৎস্য এবং কাষ্ঠও বিক্রয় করে। ইহারা যে বস্ত্র পরিধান করে, তাহা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। সাধারণতঃ তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অত্যন্ত অল্প হয়। প্রস্থ প্রায় একহস্ত ও দৈর্ঘ্য তিন কি চারি হস্তের অধিক হয় না। পুরুষেরা কপ্‌নি পরে, স্ত্রীলোকেরা কাপড়ের দ্বারা কেবল একটু বেড় দেয়। বক্ষঃস্থল ও মস্তক অনাবৃত থাকে।

ইহারা স্ত্রীপুরুষে এক মাচাতেই বাস করে। বালকবালিকাগণও শৈশবাবস্থায় পিতা মাতার নিকটই স্থান পায়; কিন্তু অধিক বয়স হইলে, গ্রামস্থ সমুদয় অবিবাহিতা কুমারীরা এক মাচায় ও অবিবাহিতপুরুষগণ অন্য মাচায় রাত্রিতে শয়ন করে। দিবাতে পিতা মাতার মাচায় থাকিয়াই আহারাদি ও অন্যান্য কর্ম্ম করা যায়। অবিবাহিত যুবা পুরুষগণ রাত্রিতে যে মাচায় শয়ন করে, তাহাকে কাছারি ঘর বলে। সামাজিক কি অন্য কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সকলে,ঐ ঘরে বসিয়া তাহার মীমাংসা করে। ঐ মাচা সাধারণ সম্পত্তি।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। অধিক বয়ঃক্রম না হইলে স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও বিবাহ হয় না। বিধবাবিবাহ ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। কন্যাই গারোদের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী। পুত্র পিতার সম্পত্তি পায় না; বিবাহ হইলেই আপনার স্ত্রীর সহিত শ্বশুরালয়ে বাস করে, এবং শ্বশুরের মৃত্যু হইলে, তাহার ত্যজ্যসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

গারোদিগের বিবাহের নিয়ম একান্ত অদ্ভুত ও নিতান্ত হাস্যজনক। আদৌ মাতুলানী, তদভাবে মাতুলকন্যা বিবাহ করাই ইহাদের মধ্যে যার পর নাই প্রশস্ত। বিধবা মাতুলানী বর্ত্তমান থাকিলে, ইহারা অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না। কোন প্রকার সম্পর্কিত বিধবা মাতুলানী থাকিলেও তাহাকেই বিবাহ করিবে। যদি কোন প্রকারের মাতুলানী না থাকে, তাহা হইলে অন্যসম্বন্ধের চেষ্টা হয়।

বিবাহের সম্বন্ধ পাত্র ও পাত্রীর পিতা মাতা, কি অন্য অভিভাবক দ্বা·

রাই স্থির হইয়া থাকে। বিবাহের নিমিত্ত উত্তম কোন দিন কি লগ্ন স্থির করার আবশ্যকতা নাই। উভয় পক্ষের কার্য্যের অবকাশ ও সুবিধা মতে উভয়সম্মতিতে এক দিন ধার্য্য হয়। বিবাহে যে পরিমাণ সুরা ব্যয় হইবে, উভয়পক্ষে তাহার সমুদয় প্রস্তুত না হইলে, কখনও বিবাহের দিন ধার্য্য হইতে পারে না।

বিবাহের যে দিন স্থির হয়, সেই দিন পাত্রীপক্ষ হইতে পাত্রীর আত্মীয় কএক ব্যক্তি, পাত্রকে আনয়ন করার জন্য, তাহার মাচায় গমন করে। পাত্র তাহাদিগকে দেখিলে, অথবা তাহারা আসিতেছে এমন সংবাদ পাইলেই দ্রুতপদে পলায়ন করিয়া কোন নির্জ্জন গৃহে কি অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করে। কন্যা পক্ষীয় ব্যক্তিগণ,নানা স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিয়া,কোনরূপে একবার তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই পাঁচ সাত জনে তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিতে চেষ্টা করে; এবং সে ও তাহাদের হাত ছাড়াইয়া যাওয়ার কারণ বিস্তর প্রয়াশ পায়। এ দিগে পাত্রী পক্ষীয়েরা তাহাকে নানা প্রকারে ক্লান্ত করিতে যত্নশীল হয় এবং বিবাহের জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখায়। যদি হতভাগ্য বর তাহাতেও সম্মত না হয়, তাহা হইলে কএক ব্যক্তি এক সঙ্গে তাহাকে ধরিয়া নিয়া জলে ফেলে;এবং জলে দুই তিনটি চুবন খাইয়া যখন সে বিবাহ করিতে সম্মত হয়, তখন তাহাকে তুলিয়া,ধরিয়া নিয়া যায়। পাত্রীও কোন নির্জ্জন গৃহে পলায়ন করিয়া থাকে। তবে, পাত্রী কখনও অরণ্যে প্রবেশ করে না। পাত্রী পলায়ন করিলে পর, কএকটি স্ত্রীলোক তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া, বাহির করিয়া লয়।

এইরূপে,পাত্র ও পাত্রী উভয়কে পাওয়া গেলে পর, গ্রামস্থ সমুদায় স্ত্রীলোক পাত্রীকে লইয়া এক শ্রেণীতে এবং পুরুষগণ পাত্রকে লইয়া অপর শ্রেণীতে উপবেশন করে। পরে, গ্রামের প্রধান কোন ব্যক্তি কার্য্যসম্পাদনার্থ মনোনীত হন। তাঁহাকে সকলে ধর্ম্মপিতা বলে এবং অত্যন্ত সম্মান করে।

বিবাহসভায় অনতিবিলম্বেই দুইটি কুক্কুট আনয়ন করা হয়। তাহার একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীজাতীয়। উল্লিখিত ধর্ম্মপিতা, গাত্রোত্থান করিয়া একখানা কুলায় কিছু চাউল লইয়া ঐ কুক্কুট দুইটিকে খাইতে দেন। যদি দুইটিই এক সময়ে আহার করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে বড়ই মঙ্গল। ইহার কিঞ্চিন্মাত্র বিপর্য্যয় ঘটিলে স্ত্রী পুরুষে প্রণয় হইল না। অতঃপর, কুক্কুটদ্বয় যখন আহার করিতে থাকে, তখন ধর্ম্মপিতা একখানা ছোট রকম বাঁশ লইয়া এমত

দৃঢ়রূপে তাহাদের মাথায় আঘাত করেন যে, একাঘাতেই তাহাদের উভয়ের প্রাণ বিয়োগ হয়। যদি মরিবার সময় উভয়ে একত্র জড়াজড়ি হইয়া মরে, তবে দম্পতীর অটল প্রণয় হইবে এরূপ বিশ্বাস করিয়া, সকলে আনন্দসূচক চিহ্ন প্রকাশ করে। আর, যদি মৃত্যুকালে দুইটা দুইদিগে যাইয়া পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মরে, তাহা হইলে দম্পতীর মধ্যে কখনও প্রণয় হইবেনা এইরূপ স্থির করিয়া,সকলে বিষণ্ণ হয়। আবার, কুক্কুটদ্বয়ের মৃত্যু হইলে,তাহাদের পেট চিড়িয়া অভ্যন্তরের নাড়ী সকল পরীক্ষা করে। অন্তস্থ দুইটি নাড়ী একত্র হইয়াছে দৃষ্ট হইলে, তাহা ভাবি প্রণয়ের লক্ষণরূপে গৃহীত হয়; যদি পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তবে তাহা অপ্রণয়ের চিহ্ন।

যে বাঁশ দিয়া কুক্কুটদ্বয়কে আঘাত করা হইয়াছিল,সেটি বড় আদরের বস্তু। তন্মধ্যে ঐ নাড়ী দুইটি পুরিয়া, তাহা পাত্রের মাচাতে রাখিয়া দেয়। পরে, ঐ কুক্কুট দ্বয় রন্ধন করিয়া, পাত্রীসহ স্ত্রীলোকগণ এক শ্রেণীতে, ও পাত্রসহ পুরুষগণ অপর শ্রেণীতে বসিয়া, মদিরা পান করে, এবং ভাত আর ঐ মাংশ খায়। মদিরা পানেরও বিশেষ নিয়ম আছে। প্রথমতঃ ধর্ম্মপিতা এক পাত্রে মদিরা লইয়া বরকে তাহা পান করিতে দেন,এবং তাহাতে যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা পাত্রীকে অর্পণ করেন। এইরূপ ভাতও প্রথমে পাত্রকে দিয়া, তাহা হইতে কতকটি পাত্রীকে দেওয়া হয়; তৎপর সকলে অত্যন্ত আমোদ করিয়া মদিরা পান ও আহারাদি করে। বর কি কন্যা কেহ আহার করিতে অস্বীকার করিলে, তাহাও অমঙ্গলসূচক

গারোদিগের বাসর ঘরের বিবরণ আরও কৌতুকাবহ। ফলতঃ তাদৃশ বিবাহের তথাবিধ বাসরই যোগ্য উপসংহার। পুর্ব্বে যে সকল আমোদ প্রমোদের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতেই দিবা অবসান হয়। রাত্রিতে, গ্রামস্থ ব্যক্তিরা বর ও কন্যাকে বলপূর্ব্বক তাহাদের নির্দ্দিষ্ট মাচায় নিয়া, বৃহৎ এক শয্যার দুই পার্শ্বে দুইজনকে শয়ন করায়, এবং বরের পার্শ্বে কতকটি পুরুষ, আর কন্যার পার্শ্বে কতকগুলি স্ত্রীলোক শয়ান হইয়া, পুরুষেরা বরকে এবং স্ত্রীলোকেরা কন্যাকে ঠেলিতে থাকে। এইরূপে ঠেলিতে ঠেলিতে যখন বর ও কন্যা পরস্পর সন্নিহিত হয়, তখন সকলে বড়ই আহ্লাদে হাতে তালি দিয়া বাহির হইয়া যায়, এবং গৃহের সমুদয় দ্বার দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রত্যেক দ্বারে সাত সাত জন ব্যক্তি দ্বাররক্ষক রূপে দণ্ডায়মান হয়।

যদি দম্পতীর কেহই দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা না করে; এবং নবপরিণয়োচিত সলজ্জ শান্তভাবে নিশাযাপন করিয়া, পরদিন গৃহস্থ ও গৃহিণীর ন্যায় একবাক্যে সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিবাহ সিদ্ধ হইল। তদন্যথা, যদি উভয়ের একজনও বিবাহ রাত্রিতে ঘরের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করে, অথবা পূর্ব্ব বর্ণিত অন্য কোন রূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে বিবাহের জন্য যত কিছু আড়ম্বর করা হইয়াছিল, সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায়, নষ্ট হইয়া যায়, বিবাহ অসিদ্ধ হয় এবং বর ও কন্যা নিজ নিজ পিত্রালয়ে প্রস্থান করে।

ঐ পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে একবারে বিবাহ সিদ্ধ না হইলে, সামাজিকেরা দুই তিন বার উদ্যোগ করিয়া দেখে। যদি তাহাতেও কোন ফল না ফলে এবং উভয়ের মনোমিলন না হয়, তবে তাহাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। তাহারা আবার অন্যত্র বিবাহের উদ্যোগ করে। বিবাহ সিদ্ধ হইলে, বর ও কন্যার আত্মীয় স্বজনেরা, বৃহৎ একটি শূকর হত্যা করিয়া, বৃহৎ ঘটার সহিত সুরা, শূকর মাংস এবং আরও নানাবিধ সামগ্রী দ্বারা ভোজের হলহলা তুলিয়া দেয়।

গারোদিগের মৃত্যু হইলে, শবদাহন করাই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রচলিত প্রথা, মৃত্তিকা দেওয়ার নিয়ম নাই। এ অংশে ইহারা হিন্দুর অনুকারী। কেহ মরিলে, তাহার সুহৃৎ স্বগণ যে যেখানে থাকে, ইহারা তাহাকে সংবাদ দেয়; এবং মৃতের সমুদায় আত্মীয় ব্যক্তি যাবৎ উপস্থিত না হয়, তাবৎ সৎকার কার্য্য স্থগিত থাকে। এই ব্যবহারটিতে ইয়ুরোপের গন্ধ একটু একটু আসে। যদি কোন আত্মীয়ের বাসস্থল তিন চারি দিবসের পথ ব্যবধানে থাকে, তাহা হইলেও তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। যখন দেখিল যে চারি দিগ হইতে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আসিবার যোগ্য কেহই আর বাকি নাই, তখন মৃতের বাস্তু ভূমির অনতিদূরবর্ত্তী কোন স্থানে সকলে যুটিয়া তাহাকে দাহন করে।

আত্মীয় ব্যক্তিরা সকলেই কিছু কিছু কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনে, এবং দাহ ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে, দু চারি খানি অস্থি যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়া, একটা বাঁশের মধ্যে পুরিয়া, মৃতব্যক্তির বাসগৃহের চালায় লটকাইয়া রাখে। যেস্থলে মৃতকে দাহন করা হয়, সেখানেও একটা গর্ত্ত করে, এবং চিতাভস্ম সমস্ত সেই গর্ত্তে পুতিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে বেড়া দিয়া ঘেরিয়া দেয়।

মৃত্যুর পর, ইহাদিগের মধ্যে তিনবার শ্রাদ্ধ হয়। পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ মৃত্যুর ছয়দিবস পরে, এবং স্ত্রীলোকের পাঁচ দিবস পরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎপর, কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ এবং ফাল্গুণ কি চৈত্রমাসে তৃতীয় শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রাদ্ধে তেমন কোন ঘটা নাই। যত কিছু আড়ম্বর, তাহা তৃতীয় শ্রাদ্ধে।

প্রথম শ্রাদ্ধের দিবস একটি কুক্কুট মারিয়া, তাহার মাংস এবং কিঞ্চিৎ অন্ন শ্মশানের বেড়ার মধ্যে রাখিয়া দেয়, এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা কিছু কিছু মদিরা পান করিয়া চলিয়া যায়। এদিন এক কি দুই কলসীর অধিক মদ লাগে না। দ্বিতীয় শ্রাদ্ধের দিবস দুইটি কুক্কুট এবং একটা শূকর বধ করে, এবং মদিরাও তিন চারি মটকি আনীত হয়। সকলে ঐ মদ ও ঐ মাংসের দ্বারা কিছুকাল উৎসব করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করে। আর কোন কর্ম্ম হয় না।

তৃতীয় শ্রাদ্ধে, কুক্কুট, শূকর, ষাঁড়, গরু প্রভৃতি অনেক পশু হত্যা হয় এবং অন্যূন ২৫ কি ৩০ মটকি মদিরা না হইলেই চলে না। তখন গ্রামের সকল লোক এবং বন্ধুবান্ধব যেখানে যে থাকে সকলে একত্র হইয়া তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত অবিরাম কোলাহল সহকারে দিবারাত্র সমভাবে মদিরাপান ও মাংস ভক্ষণ করে; এবং যত প্রকারের আমোদ ইহারা কল্পনা করিতে পারে, তাহাতে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়। আমোদ বই ঐ কয় দিন কাহারও আর কোন কার্য্য থাকে না। স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই তখন শ্রাদ্ধের আমোদে যোগ দেয়; কেহ নৃত্য করে, কেহ গীত গায়, কেহ কেহ মদমত্ততায় নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি করিয়া নিকটস্থ আর পাঁচজনকে আমোদিত করে। গারোখোরা নামে এক প্রকার কাঁসার বড় বাটি ময়মনসিংহের দিকে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কেহ কাঠি দিয়া তাহা বাজায়, কোথাও বা মৃদঙ্গবৎ একপ্রকার কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঢোলক বাজিতে থাকে। কেহ কেহ শিঙ্গা ও বাঁশের চুঙ্গি বাজাইয়াও আনন্দ করে। এইরূপ নৃত্যগীতবাদ্যোল্লাসে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, উৎসবের অবসান সময়ে, পূর্ব্বে যে বাঁশের মধ্যে মৃতব্যাক্তির ভস্মাবশেষ অস্থি পুরিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা লইয়া সকলে বাড়ি যায় এবং সেখানে যাইয়াও আবার নৃত্যগীত করে। পরে ঐ অস্থিগুলি পুড়িয়া ফেলিয়া, যার যার স্থানে চলিয়া যায়। এই শ্রাদ্ধের শেষ।

ইহাদিগের মধ্যে বামবাহুতে পিত্তলের খাড়ু পরা বড় সৌভাগ্যের চিহ্ন। কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটেনা।

বহু অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলে, সে সুখসামগ্রী লাভ করা যায় না। এই খাড়ু পরাকে 'বাউবল পরা' বলে। বোধ হয় এই 'বাউবল' সংস্কৃত বাহুবলয় পদের অপভ্রংশ। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া মদিরা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, এবং কিছু প্রস্তুত হইলে, স্বগণ কুটম্ব সকলকে আহ্বান করিয়া মদমাংস উপহার দেয়। ঐ দিন হইতে সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত আহূত কি অনাহূত যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রয়োজনে গৃহে অতিথি হইবে, মদিরা ও মাংস দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করা বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে ত্রুটি হইলেই ব্রতভঙ্গ হইল। এই একবৎসর কোনরূপে নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়া গেলে, গৃহস্বামী 'বাউবল' পরিবেন। যদি বিপাকতঃ কোন বিঘ্ন ঘটে; অথবা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ইহার কাহার ও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর 'বাউবল' পরা হইল না।

কানে ছিদ্র করিয়া তাহাতে মাকড়ি পরা গারোদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত। স্ত্রীলোক ও পুরুষ, সকলেই বড় বড় পিতলের মাকড়ি কানে দেয়; এবং যে যত অধিক পরিমাণে মাকড়ি পরিতে পারে, তাহার সেই পরিমাণ সম্মান বাড়ে। যাহার কানের ছিদ্র মাকড়ির ভারে ছিড়িয়া যায়, সে ইহাদিগের মধ্যে বড়ই একজন গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

ইহারা কুকুর পাইলে, বান্ধিয়া রাখিয়া কতকটি চাউল খাইতে দেয়। যখন সমুদয় চাউল খাওয়া হইয়া যায়, তখন একজন আসিয়া লগুড়াঘাতে কুকুরটার প্রাণ বধ করে, এবং উহাকে একটি গর্ত্তে ফেলিয়া অগ্নি জালিয়া দেয়। কিছু কাল পরে, সকলে অতীব আহ্লাদ সহকারে অভ্যন্তরস্থদগ্ধতণ্ডুল সমেত ঐ দগ্ধকুকুরমাংস ছুড়ি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হয়। ইহারই নাম গারোদিগের কুকুর পিঠা।

মনুষ্য সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চতম মঞ্চেই আরোহণ করুক, অথবা অজ্ঞতারূপ অন্ধকারময় গিরিগহ্বরের অধস্তন প্রদেশেই পড়িয়া থাকুক, মানুষী-প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান। সেই প্রবৃত্তি, সেই প্রসক্তি; সেই হৃদয়, সেই মন। প্রভেদ যাহা কিছু, তাহা বাহিরে। কিন্তু বাহিরের এই প্রভেদই কি বিস্ময়জনক ও রোমহর্ষক। বাহিরের এই প্রভেদ হইতেই একটি অঙ্গার, আর একটি হীরক; একজন ভাস্করাচার্য্য কি হাম্বোলড্; আর একজন,—বনচারী গারো।

—○:(::○):○—

আহার ও বাঙ্গালি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাঙ্গালিদিগের নিত্য আহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে তণ্ডুলই সর্ব্বপ্রধান। বঙ্গদেশের প্রায় অধিকাংশ লোকের জীবনই এই তণ্ডুলের উপর নির্ভর করিতেছে। ধনী, দরিদ্র কি শ্রমজীবী সকল শ্রেণীস্থ লোকেই তণ্ডুল দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষের অপরাপরস্থানবাসীদিগের অপেক্ষা যে বঙ্গবাসীদের শরীর ক্রমে দুর্ব্বল ও খর্ব্বকায় হইয়া আসিতেছে, অন্নদ্বারা জীবনধারণই তাহার এক প্রধান কারণ। আমাদিগেরও এ কথা প্রকৃত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তণ্ডুলের মধ্যে মাংসনির্ম্মাপক ও বলবর্দ্ধক পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে আছে; সুতরাং প্রতিনিয়ত ইহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইলে, শরীর দুর্ব্বল ও খর্ব্বকায় হইবারই খুব সম্ভাবনা। দালও একটি নিত্য আহারীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তণ্ডুলাপেক্ষা ইহাতে পুষ্টিকর শক্তি বহুগুণে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু দাল অন্নাহারের একটি উপকরণসামগ্রী মাত্র। প্রত্যুত আহারের মূলীভূত অন্নের সহিত ইহা অতি অল্প পরিমাণে আহার করা হয়। এমন কি, তণ্ডুলের এক চতুর্থাংশ দাল সকল শ্রেণীর বাঙ্গালিরা আহার করেন কি না সন্দেহ। যাহারা কিছু অধিক পরিমাণে দাল আহার করে, তাহারা নিরবচ্ছিন্ন—অন্নাহারীব্যক্তি হইতে অপেক্ষাকৃত বলবান্। কোন কোন দালের পুষ্টিকারিতাশক্তি মাংসাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু দাল মাংসের ন্যায় লঘুপাক নহে এবং পৃথকরূপ আহারে উদরাময় জন্মে।

দুগ্ধ।—তণ্ডুল ও দাল অপেক্ষা দুগ্ধের পুষ্টিকারিতা শক্তি অনেক গুণে অধিক। অধিক পরিমাণে একমাত্র দুগ্ধ পান করিয়াও মনুষ্য বহুদিন জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে শরীরের মেদ বর্দ্ধক পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকাতে, নিয়ত অধিক পান করিলে স্থূলকায় হইয়া মনুষ্য অলসস্বভাব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যে সকল নিরামিষাশী অত্যধিক পরিমাণে দুগ্ধ

পান করে, তাহারা ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

উদ্ভিদ্‌।—শরীররক্ষার্থে কিছু কিছু বনজ বস্তু আহার করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু অনবরত অন্নের সঙ্গে ইহা ব্যঞ্জন রূপে আহার করিলে যথোচিত মতে স্বাস্থ্য-রক্ষা না হইয়া শরীর নিস্তেজ হয়, এবং মস্তিষ্কের সম্যক্‌ পোষণক্রিয়ার ব্যাঘাত হওয়াতে মনোবৃত্তি সকলের অপকর্ষতা জন্মে। বনজ দ্রব্যের তরুণপত্র ও শাখা ইত্যাদি হইতে মূল অধিকতর পুষ্টিকর; এজন্যই গোলআলু, ওল, সালগম ও মানকচু প্রভৃতি পুষ্টিকর বলিয়া বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। কিন্তু মাংস ও গোধূমাদির সারাংশের সহিত তুলনাকরিলে ইহাতে শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না।

গোধূম।—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তণ্ডুলাপেক্ষা গোধূমে মাংস-নির্ম্মাপক বস্তু অধিক পরিমাণে থাকায় ইহার পুষ্টিকারিতা শক্তি তণ্ডুলাপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহাও মাংসের সহিত তুলনায় যৎসামান্য বোধ করিতে হইবে; বিশেষতঃ ইহা মাংসের ন্যায় লঘুপাক নহে। গোধূমের পুষ্টিকারিতা শক্তি মাংসাপেক্ষা অল্প বলিয়া, রুটি খাইয়া জীবনরক্ষা করিতে হইলে ইহার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দাল ও দুগ্ধাদি আহার না করিলে কোন মতেই দেহ সবল থাকিতে পারে না। অন্নের সঙ্গে যেমন নিয়ত মৎস্য, মাংস ও দাল আহার করা নিতান্ত আবশ্যক, রুটির সহিতও তদ্রূপ আহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

মৎস্য।—মাংস অপ্রাপ্য হইলে মৎস্যও একপ্রকার মন্দ আহার নয়। কিন্তু মাংসের সহিত ইহারও তুলনা হইতে পারে না। যদিও ইহাতে মাংসের সারাংশের যৎসামান্য পরিমাণ থাকাতে সহজে জীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকুক, তথাপি অন্যান্য কোন কোন বস্তু থাকাতে মৎস্যকে এক প্রকার দুষ্পচ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, মৎস্যাহারে বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা জন্মে, কিন্তু ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মাংস।—শারীরিকও মানসিক শক্তি সবল রাখিবার এবং ব্যাপককাল পরিশ্রমসহিষ্ণু হওয়ার জন্য, উষ্ণপ্রধান প্রদেশেও কিয়ৎ পরিমাণে মাংসাহার একান্ত আবশ্যক। নিয়মিত রূপে কতক পরিমাণে মাংসাহার করিলে যে মাংসপেশী সবল, মস্তিষ্ক চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দর্শাইতে অধিক আয়াস পাইতে হয় না। বর্ত্তমান সময়ের ইয়োরোপীয়েরা ইহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ স্থল। আপাততঃ যদিও বাঙ্গালিজাতির মধ্যে কেবল মেষ ছাগাদির মাং-

সাহার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহাও প্রায় কোন পর্ব্বাদি উপলক্ষ ভিন্ন নহে। পূর্ব্বে বাঙ্গালিজাতির মধ্যেও যে প্রচুর পরিমাণে মাংসাহার প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার প্রমাণ গতবারে উল্লেখ করা গিয়াছে। আমরা কিছু না বলিয়া ব ... গুণ তারতম্যের এক নির্ঘণ্ট প্র ... করিতেছি। পাঠকগণ তদ্দৃষ্টেই ঐসকল বস্তুর গুণাগুণ বিচার করিতে পারিবেন।

আহার্য্য বস্তুর নাম।	উত্তাপক।	মেদ বর্দ্ধক।	মাংস বর্দ্ধক।	পার্থিব।
চাউল	৭৮	১৪	৭	১
গোধূম	৭২	১৩	১৩	২
যব	৭২	১৫	১১	২
অড়হর দাল	৬০	১৬	২২	২
মাসকলাই	৬১	১৮	১৯	২
ছোলা	৬১	১৬	২১	২
মুগ	৬০	১৮	২০	২
মুশুরী	৫৯	১৫	২৪	২
গোল আলু	২৩	৭৪	২	১
মান কচু	২৩	৭৩	৩	১
ওল	২৪	৭২	৩	১
দুগ্ধ	৮	৮৬	৫	১
ঘৃত ও মাখন	১০০	০	০	০
চিনি	১০০	০	০	০
মৎস্য	৭	৭৮	১৪	১
পাক করা মাংস	১৪	৬৩	২১	২

পান করে, তাহারা ইহা বোধ হইতেছে

উদ্ভিদ্।—শরীররক্ষা, উত্তাপক কি মেদ বর্দ্ধক কি মাংসবর্দ্ধক এই সকল বস্তুই কিছু না কিছু প্রত্যহ আহারকরা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইহার একের ন্যূনাধিক্য হইলে শরীর যথোচিতরূপে পরিপোষিত হইতে না পারিয়া নানা-মত অনিষ্ট ঘটে ; অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যাদিতে কেবল উত্তাপক, মেদবর্দ্ধক কিংবা মাংসবর্দ্ধক পদার্থ অত্যধিক পরিমাণে আছে, তাহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র নিয়ত আহার করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে যে মাত্র দৈহিক অনিষ্ট হয় তাহা নহে, উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি নিচয়েরও হীনতা জন্মে। বাঙ্গালিরা মানসিক কোন বৃত্তিতে অধম না হইয়া-ও যে হীনবীর্য্য এবং হীনসাহস বলিয়া সর্ব্বত্র পাদদলিত, বাল্যকাল হইতেই অপুষ্টিকর আহার দ্বারা শরীর দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করা, তাহার এক প্রধান কারণ বলিতে হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালিরা সবলকায় ও বীর্য্যবান্ হইতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের মঙ্গলের প্রত্যাশা অতি অল্প।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তণ্ডুলে পুষ্টিকর পদার্থ অল্প পরিমাণে আছে। যদিও বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোক অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে এবং ইহাই তাহাদের শরীর রক্ষার একমাত্র প্রধান অবলম্বন ; কিন্তু একটু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, বাঙ্গালিরা কেবল অন্ন দ্বারা প্রাণধারণ করিতেছে বলিয়া পৃথিবীর অপরাপরজাতির কথা দূরে থাকুক, ভারতের অন্যান্য স্থান বাসীদের অপেক্ষাও ইহাদের শরীর দুর্ব্বল ও খর্ব্ব হইতেছে। অতএব অন্নের সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে দাল ও নিয়মিতরূপে গোধূম ও মাংসাহার প্রচলিত না করিলে বাঙ্গালি সবল শরীর ও দীর্ঘজীবী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাসীরা অধিক পরিমাণে গোধূম ও পুষ্টিকর দাল আহার করিতেছে বলিয়া যে অধিকতর দীর্ঘকায়, বলবান্ ও সাহসী তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু শরীরের এই বল ও সাহসের সহিত মস্তিকের চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধির প্রখরতা সংযোজিত হইলেই মনুষ্যজাতি মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অতএব নিয়ত যে সকল বস্তু আহারে শরীরের বল, সাহস ও মস্তিকের চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, বাঙ্গালিজাতির শীঘ্র সে সকল বস্তু আহারের অভ্যাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। (শ্রীরাঃ—)

আগমনী।

১

আইস, প্রভু, আইস চট্টলে! *
বহুদিন অভাগিনী,
দেখে নাই, নৃপমণি!
রাজার পবিত্রমূর্ত্তি,—দেবতা ভূতলে।
হেন রাজ দরশন,
রাজ পদ পরশন,
পাব আজি নাহি জানি কোন্ পুণ্যবলে;
আইস, বঙ্গের প্রভু, আইস চট্টলে।

২

না জানি কিপাপে, হায়!
নিদারুণ বিধাতায়,
লিখিয়াছে এত দুঃখ কপালে আমার;—
পর্ব্বত চাপিয়া বুকে,
অনন্ত সিন্ধুর মুখে,
রাখিয়াছ, অবিশ্রাম অনন্ত প্রহারে,
প্রহারে তরঙ্গমালা গর্জ্জিয়া আমারে।

৩

ততোধিক নৃপবর!
জ্বলিতেছে নিরন্তর,
হায় রে বুকের মাঝে জ্বলন্ত অনল;—
'বাড়বেতে' হুহুঙ্কার,
'লবণাখ্যে' মহামার,
'সীতাকুণ্ডে' গিরি, বারি, অনল সকল;
কত সবে বল, প্রভু, রমণী দুর্ব্বল?

* সংস্কৃত গ্রন্থে চট্টগ্রামের নাম চট্টল।

৪

বঙ্গজা ভগিনীগণ,
কাঁদে প্রভু অনুক্ষণ,
ধরিয়া চরণে তব;—মম দুঃখ কয়।
আমি এই মরি বাঁচি,
নীরবে পড়িয়া আছি,
নীরবে কাঁদিয়া অঙ্গ, দেখ দয়াময়!
করিয়াছি নির্ঝরিণী, স্রোতস্বতী ময়।

৫

যদি না সহিতে পারি,
ভুমিকম্পে অঙ্গঝারি,
আপন মনের দুঃখ কহিতে তোমারে।
ঝটিকা নিশ্বাস ছাড়ি,
বরষি নয়ন বারি,
বৃষ্টিধারে, গলা ছাড়ি চাহি কাঁদিবারে;
পাপিষ্ঠ জলধি মজ্জ ডুবায় তাহারে।

৬

শুনি দুঃখিনীর দুখ,
তেয়াগিয়া রাজ সুখ,
আসিলে কি দূরারণ্যে, ওহে দয়াময়?
বাষ্পীয় বাহনে চড়ি,
অকূল সমুদ্র তরি,
আসিলে এ বনমাঝে, ওহে ভগবান!
তারিতে হায় রে এই অহল্যা পাষাণ।

৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ত্রয়,
তুমি প্রভু, মায়াময়,
করেছ উদ্ধার অর্দ্ধ বাঙ্গালা বেহার।
ব্রহ্মার মূরতি ধরি,
তণ্ডুল সঞ্চয় করি,
করিয়াছ বিষ্ণুরূপে নিরন্নে উদ্ধার।
রুদ্র রূপে করিয়াছ দুর্ভিক্ষ সংহার!

৮

মিলি সুরাসুর দল,
করি মহা কোলাহল,
মন্থিলে অনন্ত সিন্ধু—ভারত ভাণ্ডার!
যে অমৃত উদ্ধারিলে,
সুরগণে বিতরিলে,
আপনি রেখেছ, প্রভু দুর্ভিক্ষ-সংহার।
'ছয় কোটি' মহাবিষ কণ্ঠেতে তোমার।

৯

স্বয়ং বিধাতা তুমি,
বঙ্গ তব লীলাভূমি,
বাঙ্গালি অদৃষ্ট, প্রভু, করেতে তোমার।
যার ভাগ্যে যা লিখিবে,
কার সাধ্য খণ্ডাইবে?
ভবিতব্যালয় তব "বেল ভিডিয়ার"!
অদৃশ্যে অদৃষ্ট লিখ, 'গেজটে' তোমার।

১০

বিষ্ণু অবতার তুমি,
ভার্য্যা তব শ্বেতাঙ্গিনী,
সঙ্গিনী কমলা সহ গৃহে বিরাজিত।
সুদর্শন চক্র ধর,
বাঙ্গালা শাসন কর,
সপ্তাহে বাজাও শঙ্খ সদা শক্রজিত!
কর, পদ্ম পানি! পানি-পীড়নে মোহিত।

১১

তুমি শম্ভু; তুমি ভব,
উদাসীন ভাব তব,
বসতি কৈলাসে, বঙ্গে তিষ্ঠ একতিল।
প্রকাণ্ড ত্রিশূল করে,
ত্রিভুবন কাঁপে ডরে,
একশূল 'মিলিটরি', দ্বিতীয় 'সিবিল'
তৃতীয়তঃ 'হোমচার্জ্জ,' ওহে দয়াশীল।

১২

তুমি প্রভু আখণ্ডল,
বাষ্পীয় বাহনে চল,
তুচ্ছ জ্ঞ;—যেই পুচ্ছ আছে তব করে,
তার সঞ্চালনে হায়,
পার তুমি বাঙ্গালায়,
তুলি স্বর্গে, নিক্ষেপিতে পাতাল ভিতরে,
জ্বালাইতে; ভাসাইতে অকূল সাগরে।

১৩

তুমি কালান্তক যম,
অনিবার্য্য পরাক্রম,
বর্ত্তমান কারাগার 'নরক' তোমার।
যমদূত ভয়ঙ্কর,
কাঁপে অঙ্গ থর থর,
সপুলিস মাজিষ্ট্রেট! কি কহিব আর?
হায়! প্রভু মহামারি 'সমারি' বিচার।

১৪

তুমি রণেশ্বর! আমি,—
দীনাহীনা অভাগিনী!

কেমনে তোমার প্রভু করি আবাহন ?
আলোক মালায় সাজি,
আকাশে তুলিয়া বাজি,
বিজ্ঞাপি নক্ষত্র লোকে শুভ আগমন,
নাহি সাধ্য;—দীনা আমি,দীন বাছাগণ।

১৫

রাজেন্দ্র, রাজর্ষি মত,
তুঙ্গ শৃঙ্গ গিরি যত,
প্রাচীর কিরীট শীরে, গম্ভীর-দর্শন,
নাসিকায় নাহি শ্বাস,
বদনে নাহিক ভাষ,
নীরবে করিছে তব পথ দরশন,
আইস চট্টলে, প্রভু দরিদ্রপালন !

১৬

সুতরল মরকত ঢালিয়া, নীলাম্বু পথ
করিয়াছি শোভাময়। আসিবে যখন,
শ্বেত ফেণ পুষ্প রাশি,
বরষিবে সিন্ধু হাসি,
তরি পুরোভাগে ; তীরে নামিবে যখন
দীর্ঘ শ্বেত পুষ্পহারে পুজিবে চরণ।

১৭

বাজিবে জলধিনাদে
মহা 'বেণু' মহাহ্লাদে ;
করিবেক বীচিগণ অস্ত্র প্রদর্শন।
'কর্ণফুলী' * আগে গিয়া,
আনিবেক বাড়াইয়া,
অসংখ্য অর্ণব পোতে দিবে আবাহন,
"আইস চট্টলে, প্রভু, দুর্ভিক্ষদলন।"

১৮

আনন্দে কম্বুর সনে,
কম্বুকণ্ঠী বামাগণে,
মধুর পঞ্চমে প্রভু দিয়া হুলু ধ্বনি,
বরষিবে পুষ্পরাশি ;
বরষিবে বারি † হাসি
উচ্চ শৃঙ্গ হতে,"মগ," "লুসাই" রমণী;
আইস চট্টলে সুখে ওহে নৃপমণি !

১৯

ইহাতেও প্রীতি তব,
না হয়, মহানুভব !
চাহ জ্যোতিঃ্রা ? তবে ফিরাও নয়ন।
সীতাকুণ্ডে জলে স্থলে,
ওই দেখ অগ্নি জলে ,
জলে 'জোম'‡ গিরি শৃঙ্গে ; সমুদ্র তেমন
ছড়ায় তরঙ্গ ভঙ্গে, তারা অগণন !

২০

এই দীন আবাহনে,
যদি প্রীত হও মনে,
যদি দয়া হয় প্রভু হৃদয়ে তোমার।
কি ভিক্ষা চাহিব আর,
উচ্চ বিদ্যালয় দ্বার
দেও পুনঃ অভাগীরে ; হায় ! যেন আর
'আইন বহির্ভূত' গতি হয় না আমার।

* কর্ণফুলী--চট্টগ্রামের জলবাহিনী নদী

† বারিবর্ষণ মগদিগের আনন্দ লক্ষণ।

‡ কৃষিকার্য্যার্থ তাহারা যে বন দাহন করে, তাহাকে জোমের আগুণ বলে।

চোর চরিত।

তুমি চুরি করিয়াছ—এইরূপ প্রশ্ন করিলে অকলঙ্কচরিত্র সাধু ব্যক্তি অমনি ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠে, এবং আন্তরিক বিরক্তি ও অবজ্ঞার এক শেষ প্রদর্শন করে। আর, যে প্রকৃত চোর, সেও লজ্জায় জড়সড় হইয়া অধোবদনে থাকে;—চুরি করিয়াছি এমন কথা প্রাণান্তেও মুখে আনিতে সাহস পায় না। ডাকাতেরা ডাকাতির কথা স্বীকার করিতে কখনও ঐরূপ অসহ্য লজ্জা অনুভব করে না। চৈতন্য জন্মিলে, দুঃখিত হয়, অনুতপ্ত হয় এবং মনের মর্ম্মবেদনায় যার পর নাই জর্জ্জরিত হয়; কিন্তু লজ্জামিশ্রিত হৃদয়জ্বালার সেই যে এক অকথ্য ছটফটি, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকে।

স্পেন, ইটালী ও কর্সিকা প্রভৃতি দেশে, লোকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে তেমন লজ্জিত হয় না। যদি কাহারও সহিত কাহারও বিষম মনোবাদ ঘটে, তবে আইনের চক্ষে এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, পরস্পর পরস্পরের রুধির বর্ষণ করা তাহদের মধ্যে একেবারেই দোষের কার্য্য নহে। কিন্তু যদি কেহ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কাহাকেও চোর বলে, তবে যে বলে তারই এক দিন, অথবা যাহাকে বলা হইল তাহারই এক দিন।

চোর পরস্বাপহারী, ডাকাতও পরস্বাপহারী। তবে, এই উভয়ের সম্বন্ধে লোকের মনে এবংবিধ ভাববৈচিত্র্য কেন? কেন লোকে চোরকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে; আর কেন ডাকাতকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ না করিয়া বিদ্বেষ ও ভয় করে? আমরা ইহার উত্তরে এই বলি যে, মানবমনের স্বাভাবিকমাহাত্ম্যই এই ভাবগতবিভেদের একমাত্র কারণ। মনুষ্যবিশেষের চরিত্রে বিধিই যত প্রকার দোষ প্রদর্শন করুন, সাধারণ-মানব-জাতি-রূপ বিরাট পুরুষের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রকৃতির যে স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুগঙ্গার ন্যায় চিরনিয়ত অনুস্যূতবাহিনী রহিয়াছে, তাহা কখনই পঙ্কিল হয় নাই, কখনও পঙ্কিল হইবে না। মনুষ্য স্বভাবতঃই মহত্ত্বের ভক্ত, ও গৌরবানুরক্ত। ডাকাতের চরিত্রে একটু পুরুষকার, একটু মহত্ত্ব আছে; চোরের তাহা নাই। সুতরাং সমস্ত মনুষ্যজাতি, যেন এক মনে, চোর অপেক্ষা ডাকাতকে অধিক সম্মান করে।

ডাকাত ভীরু নয়। সে যখন আক্রমণ করে, তখন শব্দ করিয়া লোককে

জালিতে দেয় এবং আলোক জ্বালিয়া লোককে দেখিতে দেয়। না জানাইয়া এবং দেখিতে না দিয়া, আক্রমণ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। চোরের গতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে প্রবেশ করে, নিঃশব্দ অপ-হরণ করে, এবং আলোক দেখিলেই ভয়ে তাহা নিভাইয়া ফেলে। ডাকাতকে সিংহ বলি না; কারণ ততদূর ক্ষমাশী-লতা নাই। তবে ব্যাঘ্রজাতীয় বলিয়া অকুণ্ঠিতমনে নির্দ্দেশ করিতে পারি। চোরের কথা মনে হইলেই, ধূর্ত্ত, বঞ্চক ও কপটপর শৃগালজাতি স্মরণপথে উদিত হয়। এই দেখা দিল, এই লুকি মারিল, এই কার কি করিল, এই কোথায় পলাইল, কিছুই কাহারও জ্ঞান গম্য নহে। ডাকাত দুরাত্মা, চোর পিশাচ। ডাকাতের অনায়াসে সংশো-ধন হইতে পারে; কারণ তাহার প্রকৃ-তিতে তেজস্বিতা আছে। সেই তেজ-স্বিতার স্রোত অসৎপথ হইতে সৎপথে প্রবাহিত হইলেই, ডাকাত তেজঃপুঞ্জ সুপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠে। চোরের স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না। চোরকে বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত কর, মাথায় মুকুট পরাও, যত ইচ্ছা তত সাজাও, তথাপি সে চোর। তাহার চক্ষুর চাউনি অবধি চরণবিন্যাসের ভঙ্গি পর্য্যন্ত সমস্তই চৌরলক্ষণাক্রান্ত। অঙ্গারও অগ্নি সংস্পর্শে ক্ষণকাল অগ্নির ন্যায় ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতে পারে। কিন্তু নীচতা যে এক পদার্থ, উহাকে শত বল করিয়া টানিলেও উপরে উঠান যায় না।

কবিসম্প্রদায়ও চোর অপেক্ষা ডাকা-তের অশেষগুণে অধিক সম্মান করিয়া-ছেন। বিলাতে রবিনহুড ও ভূমধ্য-সাগরবিহারী দস্যুপতিদিগের চরিতকী-র্ত্তনপ্রসঙ্গে অনেকখানি সুন্দর কাব্য লিখিত হইয়াছে, এবং লোকে অদ্যাপি সেই সকল কাব্য আন্তরিক অনুরাগের সহিত পাঠ করে। অধুনাতন উপন্যাস-লেখকদিগের অগ্রগণ্য বুলওয়ার লিটন, পল ক্লিফোর্ডের আখ্যায়িকা লিখিয়া, কত লোকেরই না চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। পল দস্যুদলের নেতা ছিল, সমাজ ও সামাজিক নিয়মের ঘোরতর বিদ্রোহী ছিল এবং ধনীদিগের পরম শত্রু ছিল। তথাপি তাহার সাহস, শৌর্য্য, দুর্ব্বলে দয়া, প্রবলে পরাক্রম, ই-ত্যাদি পৌরুষ গুণনিচয় স্মরণ করিয়া, কে না পুলকে কণ্টকিত হয়? কিন্তু পলের সহচরবর্গের মধ্যে, যাঁহারা এদিগে শাস্ত্রের কথা কহিয়া, গোপনে গোপনে চৌর্য্য কর্ম্মে হস্তপ্রসারণ করি-য়াছেন, তাঁহাদিগের ছবি মনে পড়ি-লেই, মন ঘৃণায় সংকুচিত হইয়া ফিরিয়া আসে।

বুলওয়ারের রচিত রায়েনজি নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইহা অপেক্ষাও একটি উৎকৃষ্ট আলেখ্য আছে। রায়েন্‌জি কাব্যের নায়ক, ওয়ালটার ডি মন্ট্রিল প্রতিনায়ক। রায়েন্‌জির বল,—বিদ্যা, বুদ্ধি, চতুরতা আর লোকের অনুরাগ; ওয়ালটার ডি মন্টিলের বল,—দৃঢ় দুই বাহু, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, আর অজেয় সাহস। একজন রাজার বলে বলীয়ান্, আর একজন আপনার বলে বলীয়ান্। একজন দস্যুনিবারক রাজপুরুষ, আর একজন সংসারদ্রোহী দস্যুরাজ। এই শেষোক্ত ব্যক্তি যে, লোকপীড়ক ও নিন্দনীয়, তাহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু মন তথাপি মহত্ত্বলুব্ধ হইয়া, কাব্যের কোন কোন স্থলে, রায়েন্‌জি অপেক্ষাও ইহাতে অধিক অনুরক্ত হয়।

ফরাসি কবি ডুমার কল্পনাপ্রসূত লুগি বাম্পার কাহিনীও এই নিমিত্তই লোকের হৃদয়গ্রাহিণী। বাম্পা উৎপথগামী ও লোকের অনিষ্টকারী ইহা সকলই আমরা স্বীকার করি। তথাপি বাম্পার প্রকৃতিতে মহত্ত্বের যে সকল লক্ষণ আছে, তাহার আদর না করিয়া পারি না। কবি, বাম্পাকে সেকন্দর সা ও কৈসরের জীবনচরিত পাঠে ব্যাপৃত ও অনুরক্ত দেখাইয়া, মানবপ্রকৃতি বিষয়ে আরও জ্ঞানগাম্ভীর্য্য ও সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ডাকাতের আরও অনেক উপাখ্যানের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এদেশের বিশ্বনাথের কথা অনেকেরই কণ্ঠস্থ রহিয়াছে। বিশ্বনাথ আজপর্য্যন্ত কাব্যে চিত্রিত হইয়া না থাকিলেও; তাহার নাম লোকের স্মৃতিসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন দেশের কোন কবি চোর চরিত্র চিত্র করিয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন আমরা জানি না। আমাদিগের এইরূপ বোধ হয় যে, কাব্যকুঞ্জবিহারিণী বীণাপাণি স্বয়ং আসিয়া লেখনী ধারণ করিলেও, এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন না। নীচতা স্বর্গে গেলেও নীচতা; আর মহত্ত্ব নরকে ডুবিলেও মহত্ত্ব। মনুষ্য, গোময় স্তূপের মধ্যেও যদি কোন মহামূল্য মণি দর্শন করিতে পায়, তাহা আদর করিয়া, যত্নে ধুইয়া, বুকে তুলিয়া লয়; এবং রত্নমণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসনের উপরেও যদি কোন অস্পৃশ্য বস্তু দর্শন করে তাহা হইতে নাক্কারের সহিত দূরে পলায়ন করে।

রাজপুরুষগণ ও নীতি বিষয়ে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণি ডাকাত, আর এক শ্রেণি চোর। যাঁহারা ডাকাত, তাঁহাদিগের রাজনীতির নাম দস্যুনীতি। চীলের মত তাঁহারা ছোঁ মারেন। আর যাঁহারা চোর, তাঁহাদিগের

রাজনীতির নাম চৌরনীতি। বক কি বিড়ালের মত, তাঁহারা নরম মুনিরা, ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন এবং উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করেন। কৈসর, তাইমুর ও আটিলা প্রভৃতি বলদৃপ্ত বীরেরা ডাকাত, এবং টাইবিরিয়াস, ও মেজেরিন প্রভৃতি মিষ্টভাষী মহাশয়েরা চোর। যাঁহারা দস্যুনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা লোক নিবাসের উৎপীড়ক হইয়াও, মাথায় কীর্ত্তিময় মণি মুকুট পরিয়া লোকের জয়ধ্বনির মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। যাঁহারা সকল বিষয়েই চৌরনীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা আর দশগুণে বিভূষিত থাকিয়াও আজ পর্য্যন্ত জগতের অবজ্ঞাভাজন রহিয়াছেন।

আমরা চোরের চরিত কীর্ত্তন করিতে গিয়া চোর ও ডাকাতের প্রকৃতিগত প্রভেদ দেখাইয়াছি। কিন্তু বোধ হয় ইহাতেই আমাদিগের অভীষ্ট উৎকৃষ্টতররূপে সংসিদ্ধ হইয়াছে। কারণ তুলনায় যাহা বুঝান যায়, সংজ্ঞাদ্বারা তাহা বুঝাইয়া উঠা কঠিন। বর্ত্তমান তুলনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, পরস্বাপহারীদিগের মধ্যে চোর অতি নীচাশয়, ক্ষুদ্র প্রকৃতি এবং অধমজাতি; আর ডাকাত শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও নির্ভীকচিত্ত, পাপরত হইয়াও মহত্ত্বশালী এবং পতিত হইয়াও পুনরুত্থানক্ষম।

বিজ্ঞান উৎসব।

দেখ দেখ আজ, প্রতীচী ভুবনে,
কোবিদ কদম্ব উঠিল মাতি।
দেখিতে সকলে, সাজিল সদলে,
রবির মণ্ডলে ভৃগুর গতি॥
নগরে নগরে পাহাড়ে সাগরে,
বাজিল আকাশ তুমুল রবে।
জ্ঞানের তৃষায়, ব্যাকুল সবায়,
জীবিত যতেক জাতি এভবে॥
প্রগাঢ় যতনে, প্রকৃতি মথনে,
নামিছে সকলে একতা হারে।
যাহার যেমন, আছে সম্ভাবন,
আয়োজন তার সে অনুসারে॥
জর্ম্মণি পুশিয়া, ফরাসি রুশিয়া
ইংলণ্ড ইটালী আমেরিকা আদি॥
যুটি দলে দলে, ছুটিছে সকলে
বিজ্ঞান উৎসব উঠিল নাদি॥
সহ দূরবীণ নবীন প্রবীণ,
কাতারে কাতারে জ্যোতিষী কত।
কত কি সাধনে সাজায়ে তরণী
চলেছে সাগর ছাইয়া শত॥
কেহবা পাহাড়ে, কেহবা সাগরে,
কেহ দ্বীপ কেহ নগর পাশে।

কেহ বায়ু ভরে, উড়িয়ে উপরে,
খুঁজিছে গৃহের পথ আকাশে ॥
অতল সাগর, অবনী জঠর,
অলক্ষ্য গগণ, অপরিমেয়।
বলো না কোথায়, পৃথিবীর গায়,
প্রকৃতিকানন আজি অচেয় ॥
তারায় তারায়, আলোক রেখায়,
পড়িয়ে জটিল স্বভাব কথা।
কহিছে হাসিয়া, ভূতলে বসিয়া,
যে ভূতে তাঁদের শরীর গাঁথা ॥
দেখিছে কেমনে, পরমাণুগণে,
নাচিছে বিবিধ আলোক পরি।
মুকুর বিবরে, ভানুর শরীরে,
অনল তুফান হেরে শিহরি ॥
চাঁদের ভিতরে, পাহাড়ে গহ্বরে,
মাপিতেছে উচু নীচু বা কত।
শ 'কোটি যোজন' ধূমকেতুগণ,
গণিছে এজনে বটিকা মত ॥
রবি ভূগু যোগ, করিয়া সুযোগ,
চড়ি এক যোগে বিজ্ঞান রথে।
বিদ্বৎ নিকর, করিছে প্রসর,
প্রকৃতি-নিয়ম-চয়ন-পথে ॥
যতন সকাল, শেখিতে সকলে,
গাঁথিয়ে জ্ঞানের আলোক মালা।
দিয়ে সেই হার, পুজা উপচার,
তুষিছে আপন দেশের গলা ॥
অধীর গমনে, প্রকৃতি ভবনে,
সবে উপনীত হইছে সাজি।
বিধির বিপাকে, কহিব কাহাকে,
ভারত খেলিছে পুতুলে আজি ॥
বয়স টলিল, দশন খসিল,
মাথা হলো পাকি বরফ ভেলা।
নয়ন কাঁপিল, চরণ কাঁপিল,
তবু না ছাড়িল শিশুর খেলা ॥
এ জড় জগত, আজি পদানত,
হলো কার ঘরে সেবার তরে।
ভারত কপাল, বলো চিরকাল,
বহিতে ইহারে মাথায় ক'রে ॥
কীটের উদরে, আজি স'পে ঘরে,
প্রখর ভাস্কর ময়ূর ভাটে।
শির বিমুণ্ডিত, ভারত পণ্ডিত,
মরিছে কপালে ঠিকুজি ঘেঁটে ॥

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

✓১। জয়দেব চরিত।—শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।) কলিকাতা, জি পি রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৵ আনা।

গ্রন্থের কলেবর দেখিয়া গুণ গৌরবের পরীক্ষা করিতে হইলে, এখানি অতি সামান্য গ্রন্থ, অতি অল্প সময়ে, অল্প আয়াসে ইহার আদ্যোপান্ত

পড়িয়া ফি. করা কঠিন নহে। কিন্তু এই কতিপয় পৃষ্ঠা লিখিয়া উঠিবার জন্য, গ্রন্থকারের কিরূপ অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিতে হই য়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে, বাঙ্গালার ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তকের মধ্য হইতেও এখানিকে অক্লেশে বাছিয়া তুলা যায়। বস্তুতঃই জয়দেবচরিত একখানি বহুমূল্য পুস্তক, এবং গ্রন্থকারের আত্মীয় ব্যক্তিরা এখানি উপলক্ষ করিয়া অভিমান করিতে পারেন।

সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন চরিতাখ্যান হইতে যে আনন্দ ও উপকারের প্রত্যাশা করা যায়, জয়দেবচরিতে তাহা সম্যক্ প্রাপ্ত হইবে না। জয়দেবচরিতে সজীব জয়দেবের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, একথা বলা সর্ব্বথা অসংগত। কিন্তু ইহা গ্রন্থকারের দোষ নহে; আমাদের অদৃষ্টের দোষ। যে দেশের ইতিহাস নাই, সে দেশের ঐতিহাসিকতত্ত্বের উদ্ধার করা, কালগত কূটপ্রশ্নের মীমাংসা করা, এবং পাঁচ জনের পাঁচপ্রকার কথা মিলাইয়া, সত্য ও জনপ্রবাদের বিরোধ ভঞ্জন করা, কিরূপ কঠিন কর্ম্ম, তাহা যাঁহারা হাত দিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। রজনী বাবু এ কার্য্যে অতি সুন্দর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার এত প্রশংসা করি। তবে ক্ষোভের বিষয় এই, এসকল উদ্যম কাহার জন্য? বাঙ্গালি টপ্পাভক্ত। টপ্পা গাইতে না পারিলে বাঙ্গালি আদর করে না। রামদাস বাবুর ঐতিহাসিক রহস্য, রজনী বাবুর জয়দেব চরিত এবং ঈদৃক্ আর দু এক খানি পুস্তক যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় না হইয়া ইংরাজিতে হইলেই গ্রন্থকারদিগের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের সমুচিত পুরস্কার হইত।

রজনী বাবুর ভাষাও ওজস্বল, পরিমার্জ্জিত, ও বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। তাঁহার এই পুস্তকখানিকে নর্ম্মালস্কুল সমূহে পাঠ্য করা একান্ত উচিত। ইহা পাঠ করিলে, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ ছাত্রেরা অনুসন্ধান করিবার পদ্ধতি শিখিবে এবং বাঙ্গালার ইতিহাসরূপ অন্ধকারময় গৃহ হইতে কিছু খুজিয়া বাহির করিতে হইলে, কোন্ স্থলে কিরূপে কিসের জন্য হাত দিতে হয়, তাহা জানিতে পাইবে।

২। জানকীপ্রসঙ্গ।—শ্রীভারত চন্দ্র সরকার প্রণীত। লেখক গ্রন্থের মুখপত্রে 'যশো বা দুর্যশো বা' এই কবিতার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে আশ্বাস দিতে পারি, তিনি বিশেষ যশোভাজন না হউন,

নিতান্ত অপযশের ভাগী হইবেন না। তাঁহার লেখার মাঝে মাঝে শব্দবিন্যাসসৌন্দর্য্যের নমুনা আছে।

৩। স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ— শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ইহার প্রণেতা। এখানি শিক্ষানুরাগিণী নবীনাদিগের বড়ই উপকারে আসিবে। গ্রন্থকার নিতান্ত সরল ও সুন্দর পদ্ধতিতে স্ত্রিজাতির প্রতি উপদেশ দিয়াছেন, এবং স্ত্রীনীতিঘটিত অতিকঠোর তত্ত্বনিচয়কেও সরবতেরন্যায় সুপেয়ও সুস্বাদু করিতে পারিয়াছেন। যেসকল বঙ্গবধূরা নাটক বিনা আর কিছু পড়েন না, প্রণয় পত্র বই আর কিছু লিখেন না এবং সূক্ষ্ম শিল্প ব্যতীত আর কোন কাজ স্পর্শ করেন না, তাঁহারা এই উপদেশগ্রন্থ পাঠ করিলে, অনেক বিষয়ে সুশিক্ষা পাইবেন; তাঁহারা যাঁহাদের গৃহ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও মুখ উজ্জ্বল হইবে এবং সুখসম্পদ ও গার্হস্থ্য শান্তি দিন দিন বাড়িতে থাকিবে।

৪। প্রথম শিক্ষা—বাঙ্গলার ইতিহাস। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বিরচিত।

বাঙ্গালি বিলাত চলিল এই সংবাদে আমরা যত না সুখী হই, বাঙ্গালি ইতিহাসের চর্চ্চা করিলে এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিলে, আমরা তাহা অপেক্ষাও অধিক সুখী হইয়া থাকি। ঐতিহাসিক জ্ঞান দেশের ভাবিমঙ্গলের ভিত্তি স্বরূপ। রাজকৃষ্ণ বাবু বহু অনুসন্ধান করিয়া বাঙ্গলার এই উৎকৃষ্ট ইতিহাস খানি প্রণয়ন করিয়াছেন, দেখিয়া আমরা নিতান্তই আহ্লাদিত হইলাম। এই মাত্র দুঃখ যে, তাঁহার এই পুস্তকে যে পরিমাণ ক্ষুধা জম্মে; সে পরিমাণে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ছাত্রেরা দৃঢ় সংস্কার লাভ করিবে কি না, সন্দেহ। তথাপি বলি, বাঙ্গালার ইতিহাস পড়াইতে হইলে, মার্শমান সাহেবের পুস্তক অপেক্ষা বঙ্গীয় বালকের পক্ষে বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থই অধিকতর হিতকর হইবে। ইহার ভাষাও ছাত্রদিগের ভাষা শিক্ষার উপযোগিনী।

——•:(::০):০——

নীরব কবি

যাঁহারা শ্রুতিসুখাবহ ছন্দোবন্ধে শব্দের সহিত শব্দকে গ্রথিত করিয়া কথার ছটায় সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করেন, অশিক্ষিত ইতর লোকেরা তাঁহাদিগকেই কবি বলিয়া আদর করে। ঈদৃশ কবি এবং কাব্যের পরীক্ষা স্থান কর্ণ। কবিতাও তালে তালে পঠিত বা উচ্চারিত হয়; তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও তালে তালে বিবিধ ভঙ্গিতে নাচিতে থাকে। পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় এইরূপ কাব্যের অভাব নাই। ভাট, ভট্টাচার্য্য এবং কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ গাথকদিগের অধিকাংশই এই শ্রেণির কবি। কোন একটা নাম দিতে হইলে, ইহাঁদিগকে শাব্দিককবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসংগত নহে। কারণ শব্দবিন্যাসের চাতুর্য্য বিনা ইহাঁদিগের কবিতায় আর কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে, তাহাও প্রায়ই স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির ভোগোপযোগী বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

সহৃদয় রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আর একটু ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন। তাঁহারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য শুনিয়াই গলিয়া পড়েন না, অথবা কতকগুলি সুললিত শব্দ পাইয়াই মোহিত হন না। যে কথাটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদন করিল, তাহা হৃদয়স্থান পর্য্যন্তও গমন করে কি না, ইহাই তাঁহারা অগ্রে বিচার করেন। যে কথায় অন্তরের অন্তর-নিহিত কোন লুক্কায়িত রস উছলিয়া না উঠে, সৌন্দর্য্যের কোন নূতন মূর্ত্তি মানসনেত্রের সন্নিধানে উপস্থিত না হয়, হৃদয় তন্ত্রী নূতন এক তানে বাজিতে না থাকে, কিংবা ভাবভরে আত্মা ডুবিয়া না পড়ে, তাঁহাদিগের নিকট তাহা কাব্য বলিয়াই গৃহীত হয় না। ইংলণ্ডের অধিকাংশ কবিই ছন্দোবিন্যাস নৈপুণ্যে শেক্ষপীরের শিক্ষাগুরু; অনেক বালিকার কবিতাও কবিকুলভূষণের কবিতা অপেক্ষা শুনিবার সময় অধিক মিষ্ট;—জয়দেবের গীতগোবিন্দে যেরূপ পদলালিত্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল কি উত্তরচরিতের আদি, অন্ত, মধ্য কোথাও তদনুরূপ কিছু লক্ষিত হয় না;—নৈষধের পদমাধুরীর নিকট রত্নাবলী কিছুই নয় বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। সুরুচিসম্পন্ন বিচক্ষণ

লোকেরা তথাপি শেক্ষপীর, কালিদাস এবং ভবভূতিরই পূজা করেন, এবং নৈষধের নাচনি ছন্দের কবিতাপুঞ্জকে একদিকে সরাইয়া রাখিয়া রত্নাবলীর সহিতই আশা করিয়া নিরাশ হন এবং নিরাশ হইয়া আশা করেন। কারণ, ভাষা চরণদাসী, ভাবই কাব্যের প্রাণ যেমন আভরণের তুলনায় রূপ, তেমন শব্দের তুলনায় ভাব, অথবা শাব্দিকের তুলনায় ভাবময় কবি।

কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেচনায় কবিতার আর এক গ্রাম আছে। তাহা অতীব উচ্চ এবং দুর্নিরীক্ষ্য। যাহা লিখিত হইল তাহাই কাব্য এবং যিনি লিখিলেন তিনিই কবি, এমন কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে লিখিত চিত্রে কাব্যের আভা মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত। মনুষ্যের অপূর্ণ এবং অপবিত্র ভাষা উহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। যথার্থ কবি, হিমাচলের গাম্ভীর্য্যের ন্যায়, আকাশের অনন্ত বিস্তারের ন্যায়, এবং যোগরত তাপসের ধ্যানের ন্যায় নিস্তব্ধ ও নীরব। তিনি হৃদয়েই সেই স্বর্গীয় সুধাসিন্ধুর কণিকা মাত্র পান করিয়া কৃতার্থ হন; লৌকিক বাক্য এবং লোকব্যবহৃত বর্ণমালায় কিছুই ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। লোকে স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দৌড়িতে চায়, কিন্তু কোন মতেই দৌড়িতে পারে না; কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু কোন কথাই অধরে ফোটে না; তিনিও তথাবিধ দশা প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত ভাবেই অবস্থিত থাকেন। প্রকাশের জন্য যত কিছু চেষ্টা সমস্তই বিফল হয়, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া যায়।)

কোন তত্ত্বের অন্তস্তলে প্রবেশ করা যাহাদিগের বুদ্ধির অসাধ্য, প্রাগুক্ত সত্যটিকে নিতান্ত লঘু কথা বলিয়া উপহাস করা তাহাদিগের অসম্ভব নহে। তাহারা এইরূপ মনে করিতে পারে যে, কিছু না বলিয়া এবং কিছু না লিখিয়াই যদি কবির অলৌকিক সম্পদ সম্ভোগ করা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি? ইচ্ছা হইবে, আর অমনি ধ্যানস্থ হইয়া কবির দেবাসনে উপবেশন করিব; বীণাপাণি মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবেন; প্রকৃতি তদীয় প্রিয়নিকেতনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন; এবং সংসার কাব্যকুঞ্জের রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে। কিন্তু কবিত্বের এইরূপ আবেশ প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যের ইচ্ছাধীন কি না এবং সকলের অদৃষ্টে ঘটে কি না, ইহা গভীর ভাবে

চিন্তা করা উচিত। ইচ্ছা করিয়া কিছু একটা লিখিয়া তুলা আপনার সাধ্য; ইচ্ছা করিয়া, কিছু একটা বলিয়া, লোকের চিত্ত বিনোদন করাও আপনার সাধ্য। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় প্রেমিক হইতে পারিয়াছে? যার ইচ্ছা করিয়া কবে কে আপনার হৃদয়কে আপনি বিগলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে? ইচ্ছা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, মনকেও অনেকদূর উত্তেজিত করিতে পারে; কিন্তু শক্তি ও প্রকৃতির মূল প্রবস্রণ ইচ্ছার অগম্য স্থান।)

চন্দ্রমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে, তরঙ্গিনী মৃদু তরঙ্গনাদে নিজ দুঃখের গীত গাইতেছে, বৃক্ষ পত্র মৃদু সঞ্চালনে অটবীর প্রণয়াহ্বান প্রকাশ করিতেছে, এ সকল অভ্যস্ত কথা অনেকেই অভ্যাস বলে লিখিতে পারে। কিন্তু চন্দ্রমা যখন হাসিতে থাকে, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এসংসার কয়টি হৃদয় হাস্যে উৎফুল্ল হয়? কে কলনাদিনী তরঙ্গিনীর তটে উপবিষ্ট হইয়া তাহার দুঃখের গীতের সহিত নিজ দুঃখের গীতকে মিশ্রিত করিতে ক্ষমতা রাখে? তরু লতার আহ্বানে ইতরজনভোগ্য ভৌতিক ভোগ সুখের আহ্বানকে কয় জনে অবহেলা করিতে পারে?

✓হর্ষ, দুঃখ, ক্রোধ ও প্রীতি প্রভৃতি ভাবনিচয়ের ভাষা চিরকালই গাঢ়তার মাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। যে হর্ষ, যে দুঃখ, যে ক্রোধ, অথবা যে প্রীতি নিতান্ত তরল, সহজেই তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যেমন তরল ভাব, তেমন তরল ভাষা। মনুষ্যের মন অল্প হর্ষে শফরীর ন্যায় চঞ্চল হয়, অল্প আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, হাস্যোল্লাস কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। অল্প দুঃখ অশ্রুজলেই বিগলিত হইয়া যায়। অল্প মাত্রার ক্রোধ ভ্রুকুঞ্চনে ও তর্জ্জন গর্জ্জনেই ব্যয়িত হয়। অতি অল্প প্রেম অল্পজলা স্রোতস্বতীর ন্যায় সর্ব্বদা খল খল করে। কিন্তু যে হর্ষ শরীরের রোমে রোমে অমৃত রসের ন্যায় সঞ্চার করে, যে দুঃখ গরলখণ্ডের ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে লগ্ন হইয়া থাকে, যে ক্রোধ চিত্তকে তুষানলবৎ অহর্নিশ দাহন করে, যে প্রেম একবার নিশার স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধহয়, আবার আত্মাকে আনন্দ ও নিরানন্দের অধিকার হইতে বহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে, তাহা প্রায় কখনও দৃশ্য কি শ্রাব্য ভাষায় পরিস্ফুট হয় না।

কবিতার ভাষাও এই নিয়মের অধীন। লঘু কবির যত কিছু সম্পদ, তাহা শব্দেই পর্য্যবসিত হয়। তদপেক্ষা গাঢ়তর কবির শব্দ অল্প, রসগাম্ভীর্য্যই অধিক। কিন্তু যখন

কাহারও হৃদয়ে কাব্যের সেই অমৃত-স্রোত অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়; যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির জ্বলদক্ষরলেখা পাঠ করে, এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগর গর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র এক সঙ্গে বিচরণ করে; যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিয়া যায়, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে বিরত হইয়া, তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়ে বিলীন হয়; তখন ভয়বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়। কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব। ভাবলহরী নীরবে উত্থিত হয়, নীরবে লীলা করে, এবং নীরবেই বিলয় পায়। মুগ্ধা বালা যেমন দর্পণে আপনার সুন্দরচ্ছবি আপনি দেখিয়া চকিত নয়নে চাহিয়া থাকে, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যেমন আপনার সুখে আপনি হাসে, বনাস্ত বায়ু যেমন আপনার দুঃখে আপনি ক্রন্দন করে, কবি ও তখন সেইরূপ আপনার ভাবে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হন। কাহার নিকট কি কহিবেন, কে কি শুনিয়া কি কহিবে, কে প্রশংসা করিবে, কে নিন্দা করিবে, কে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইবে, কে অস্পৃষ্ট থাকিবে, ইত্যাদি কোন চিন্তাই তাঁহার তদানীন্তন মনোময় জগতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, জীবন ও মৃত্যু সমস্তই তখন তাঁহার নিকট এক হইয়া যায়। সংসার আছে কি নাই ইহাও তখন তাহার বোধগম্য থাকে না। তাঁহার নিজের অস্তিত্ব ও ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হয়।

যাঁহারা বিধাতার প্রসাদে এইরূপ কবি-প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন, এবং লোকাতীত কবিত্বের পূর্ণ আবির্ভাবে সময়েই এইরূপ অভিভূত হন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনি আর না চিনি, তাঁহারাই সাধক, তাঁহারাই সিদ্ধ এবং তাঁহারাই মানব জাতির প্রাণ। তাঁহাদিগের উদাসীনতাই আসক্তি, কাঠিন্যই কোমলতা, বৈরাগ্যই ভোগ, এবং তৃষ্ণাই তৃপ্তির শেষ। সমীরণ তাঁহাদিগের স্বর্গোপম পবিত্র স্পর্শে শীতল ও সুরভি হয় বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি, নচেৎ এই স্বার্থচিন্তাময় সংসার মরুতে সকলেই প্রাণে মরিতাম। পৃথিবী তাঁহাদিগের পদরেণু প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনুষ্যের নিবাস যোগ্য হইয়াছে, নচেৎ ইহা নিরয়নিবাস হইতেও ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিত। তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই মনুষ্যের ভাষা অদ্যাপি শোক দুঃখের

সময় মনুষ্যের দগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিতেছে; নিরাশায় আশ্বাস দিতেছে। দয়া, উৎসাহ, শান্তি ও প্রেম, প্রভৃতি অতিমানুষিক ভাবের ভারবহন করিতেছে; নচেৎ ইহা পিশাচকণ্ঠ হইতেও অধিক তর শ্রুতিকঠোর হইত।)

রাজা সীতারাম রায়।

কে বলে ঈর্ষা তুমি ঘৃণেয়? কে বলে তুমি পরিবর্জনীয়? যে যাহা বলুক, অন্ততঃ একদিনের তরে আমি তোমাকে সদয় চক্ষে দেখিব, তোমার গুণ গান করিব। অদ্য তোমারই প্রসাদে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি লিখিতে সক্ষম হইয়াছি। সুতরাং কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর।

ঈর্ষার অনিষ্টকারিতা বর্ণনপূর্ব্বক নীতিজ্ঞ যদি তর্কজাল বিস্তার করিতে চান, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতিহাসবেত্তা ইতিহাস-সিন্ধু মন্থন করিয়া যদি বলেন, 'যে ঈর্ষার প্রভাবে কত নৃপতি সবংশে শমনাগারে গিয়াছেন; যাহার প্রভাবে কত শত প্রবল সুবিস্তীর্ণ রাজ্য নষ্ট হইয়াছে; যাহার প্রভাবে মহতী প্রতিভার বিকাশ হইতে না পারিয়া, কতশত প্রতিভাশালী ব্যক্তি অশ্রুজলে ধরা অভিষিক্ত করিয়া, দীন হীন ভাবে ক্ষুণ্ন মনে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া, কে সমাদর করিবে?' লেখক এই সকল ঐতিহাসিক সত্য অগ্রাহ্য করিতে চান না; কিন্তু সাহস সহকারে নির্দ্দেশ করিতে চান যে, ঈর্ষা কখনও যথার্থ প্রতিভার লোপ করণে সমর্থা নহে। বরং অনেক স্থলে প্রকৃত প্রতিভার প্রকাশিকা। প্রতিবিম্ব দর্শনে যেমন বস্তুর সত্ত্বা উপলব্ধি হয়; ধূম দর্শনে যদ্রূপ তাপের অস্তিত্ব অনুমিত হয়; ঈর্ষা দর্শনে তদ্রূপ তদাকর্ষিকা প্রতিভার বিদ্যমানতা প্রতীয়মান হয়। ডাক্তার ফ্রিমেন কিংবা বিসপ কালেঞ্জো কি কেবল স্ব স্ব রচিত গ্রন্থের দ্বারা এত বিখ্যাত হইতে পারিতেন? খৃষ্ট যাজকেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন বলিয়াই না তাঁহাদিগের নাম দিগন্ত ব্যাপি হইয়াছে? ঈর্ষার মহিমায় অনেক সময়ে অনেক গূঢ় সত্য বাহির হইয়া পড়ে। আমাদিগের দেশে কোন কালেও ইতিহাসলেখার রীতি ছিলনা। ভাগ্যে গ্রীকলেখকেরা সেকেন্দর ও সেলুকসের বীর-গৌরব বর্ণনাচ্ছলে, তক্ষ

শীল, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির কুৎসা রটনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাই অদ্য আমরা ভারতীয় পুরাবৃত্তের অনেক লুপ্ত সত্য জানিতে সক্ষম হইয়াছি। শিরোনামাঙ্কিত যে বীরপুরুষের জীবনচরিত পাঠকগণকে অদ্য উপহার দিতেছি, মুসলমান লেখক বিশেষের ঈর্ষাই তাহার ভিত্তিমূল।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব মুসলমান লেখকদিগের গ্রন্থানুসরণ পূর্ব্বক স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে. যশোহর প্রদেশে সীতারাম রায় নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত বিখ্যাত দস্যু ছিল। তাহার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া নবাব উক্ত প্রদেশের ফৌজদার আবুতোরাবকে তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ফৌজদার তাহাকে ধৃত করিয়া নবাবের নিকট লইয়া যান। নবাব শূলে প্রদান করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করেন।

এই বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে মনে হইল, সীতারাম দস্যু হউন, আর নাহউন, কখনও সামান্য লোক ছিলেন না। তাহা হইলে মুসলমান লেখকেরা তাঁহার নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করিতেন না। এবং ইহাও মনে করিলাম সীতারাম অবশ্যই একজন বীর ও যবনবিদ্বেষী ছিলেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, মুসলমানেরা চিরকাল হিন্দুর পরম দ্বেষী। যেস্থলে হিন্দুর 'দেব' মুসলমানের সয়তান বা অসুর (অছুর); এবং হিন্দুর অসুর (দেও) মুসলমানের দেবতা, সে স্থলে সচরাচর মুসলমানদিগের বাক্য বিপরীত অর্থে গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। ফলতঃ মুসলমানোক্ত "সীতু ডাকাতকে" যথার্থ বীর পুরুষ বলিয়া আমার ধ্রুব বিশ্বাস হইল। তদবধি ইহাঁর জীবন বৃত্ত সংগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। প্রথমে অধিক কিছু জানিতে পারি নাই। কিন্তু অনুসন্ধানে রহিলাম, এবং কোন সাময়িক পত্রে ক্রমে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম। তৎপর শ্রীমান্ ওয়েষ্টলেণ্ড্ সাহেবকৃত যশোহরের রিপোর্টে অনেক গুলি বিবরণ প্রকাশিত হয় ; এবং স্থানীয় লোকের নিকট ও অনেকগুলি বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎসমুদায় অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

এলেঙ্গখালির (বর্ত্তমান মধুমতী নদীর) পূর্ব্বতীরে হরিহর নগর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী এখনও বর্ত্তমান আছে এই গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সীতারাম রায়ের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম সুরনারায়ণ রায়, জাতিতে উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ। ইহাঁর পিতা বড় সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না। হরিহরনগর ও এলেঙ্গখালির পশ্চিমতীরস্থ শ্যাম নগর গ্রামে তাঁহার দুটি মাত্র

স্মুপ্রজন্মা ছিল। সীতারামের জন্মকালে তদীয় ভাবি সৌভাগ্য-সূচক কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটে নাই। ঘটিয়া থাকিলেই বা কে তাহার উল্লেখ করিবে? রাম রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং কবি লিখিলেন, যেই রাম ভূমিষ্ট হইলেন, অমনি লঙ্কেশ্বর দশাননের শির হইতে রাজমুকুট স্খলিত হইল। সেকেন্দর মাসিডনিয়া অধিপতির তনয়, সুতরাং তদীয় জীবনীলেখক লিখিলেন, সেকেন্দরের জন্ম মাত্র ডায়েনা দেবীর মন্দির ভূমিসাৎ হইল। কিন্তু নিস্ব সুরনারায়ণ-সুতের পক্ষে কে তদ্রূপ ঘটনার উল্লেখ করিবে? তখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না, বা বিদ্যাভ্যাসের এত চর্চ্চাও ছিলনা। বিশেষতঃ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুরনারায়ণ তেমন একটা সম্পন্ন লোক ছিলেন না। সুতরাং সীতারামের অধ্যয়নের তত সুবিধা হয় নাই; এবং ভারতবর্ষস্থ প্রধান বীর শিবজী ও হায়দর আলির ন্যায়, লেখা পড়াতে সীতারামের অধিক মনোযোগও ছিল না।

সংপ্রতি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভে এত লোলুপ যে, বালকের পঞ্চমবর্ষ অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাহাকে ইংরেজী বর্ণমালা অভ্যাস করিতে দেই। কিন্তু আমাদিগের এই অচির-পক্ক সভ্যতার ফল এই হইয়াছে যে বিংশতি বর্ষ গত না হইতেই সুস্থ ও বলিষ্ঠ শিশু স্থবিরত্বে পরিণত হয়। অধুনাতন সভ্যতার এইরূপ বিষময় ফল দর্শন করিয়া কিছু দিন হইল দুই চারি জন বড় লোকের চৈতন্য হইয়াছে। সে যাহা হউক, সেকালের লোকের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তখন ১৫।১৬ বৎসরের না হইলে কেহ পাঠশালায় যাইত না; কিন্তু বাল্য কাল হইতেই ধাবন, কুর্দ্দন, এবং "ডুডু" "কপাটি২" প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইত। কুস্তি, তীরচালন, লাঠীখেলা, তলোয়ার ভাঁজা প্রভৃতি শারীরিক বলবিধায়ক ব্যায়াম শিক্ষা করিতে ভদ্র লোকেরা ও অপমান বোধ করিতেন না। যতই দেশে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, যতই মানসিক উন্নতি হইয়াছে, ততই আমরা শারীরিক উন্নতির প্রতি উদাসীন হইয়াছি। ঘোর তান্ত্রিক সময়েও মদ্য মাংস বাঙ্গালির জাতীয় আহার ছিল না; বাঙ্গালিরা চিরকালই মৎস্যান্ন ভোজী। কিন্তু "ভেত বাঙ্গালি" অর্থাৎ জড়বৎ,দুর্ব্বল,মেষ পালের ন্যায় নিরীহ কোন জন্তু, বলিয়া যে একটি গৌরবাত্মক সংজ্ঞা আমরা সংপ্রতি পাইয়াছি, সে কেবল উপরোক্ত উদাসীনতার ফল। মুসলমান শাসনের প্রভাবে ভারতাঙ্গনারা "অবলা" নামে

অভিহিত হইয়াছিলেন; আর ইংরেজ শাসনের কৃপায় আমরা 'দুর্ব্বল বাঙ্গালি' উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ধন্য! সার রিচার্ড টেম্পল, যিনি বাঙ্গালি যুবকদিগের ব্যায়ামাভিনয়ের ত্য! ধন্য! সার জ যিনি এই মহদনুষ্ঠানের সূত্রপাতকারী। জগদীশ্বর করুন, যেন তোমাদিগের অনুগ্রহে বাঙ্গালি আবার মানুষ হয়।

বালক সীতারাম গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই কুস্তি, লাঠী ও তলোয়ার খেলা, তীরচালন, বন্দুক চালন, অশ্বারোহণ প্রভৃতি ক্রীড়ায় মত্ত হইলেন। তাঁহার কেমন এক মোহিনী শক্তি ছিল যে, অচির কাল মধ্যে নানা স্থান হইতে প্রধান২ বীর পুরুষেরা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিল। ক্রমে একটি বৃহৎ দল প্রস্তুত হইল। তখন সীতারাম বড়২ ধনাঢ্য জমিদারদিগের বিশেষতঃ মুসলমান জমিদারদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। আনুমানিক ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুরলীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হইল। এতদিন পিতৃভয়ে সীতারাম গোপনে২ এই সকল অত্যাচার করিতেন, পিতার লোকান্তর গমনের পর প্রকাশ্য রূপে সৈন্য ও অস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক নবাবের অধিকারে ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। বক্তিয়ারখাঁ, মোচড়াসিং, গাবুরডলন প্রভৃতি বীরেরা এক এক সৈন্য দলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। মেনাহাতী নামে বারণতুল্য অমিতপরাক্রম বীরশ্রেষ্ঠ প্রধান সেনাপতি হইল। তখন আইন কানুনের ছড়াছড়ি, বা বিচার কার্য্যের আঁটা আঁটি ছিল না। "জোর যার, মুলুক তার"। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই সীতারাম প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার অত্যাচারে নবাব ফিরকসিয়ার কম্পিত হইলেন। ক্রমে দিল্লী পর্য্যন্ত সীতারামের বীরত্বের সংবাদ পৌঁছিল। এই সময়ে যশোহর তিনটি প্রধান জমিদারীভুক্ত ছিল। দক্ষিণাংশ যশোহরাধিপের জমিদারীভুক্ত; মামুদসাহী পরগণা নলডাঙ্গার রাজত্বের অন্তর্গত, এবং নলদী পরগণা ও ফরিদপুরের অধিকাংশ ভূষণার জমিদারদিগের অধীনে ছিল। ক্রমে ভূষণার জমিদারী সীতারামের করায়ত্ত হইল।

যশোহর জিলাতে তখন দ্বাদশটি চাকলা ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, এই দ্বাদশটি চাকলা একজন রাজার অধীনে ছিল; কিন্তু কোন্ রাজার অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেন না। যাহা হউক, এই দ্বাদশ চাকলার মালিক বা মালিকগণ, দীল্লিশ্বর

কিংবা তদীয় প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকার নবাবকে রাজস্ব প্রদান করা বন্ধ করিলেন। দিল্লীশ্বর সীতারাম রায়ের বীরত্বের কথা বারংবার শুনিয়াছিলেন; সংপ্রতি তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, তৎপ্রতি বিদ্রোহী জমিদার দিগের শাসন ভার অর্পণ করিলেন। "একে মা মনসা, তাতে ধূনার গন্ধ।" তিনি বাদসাহের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া, অল্প দিনের মধ্যে উক্ত জমিদার দিগকে সত্ত্বচ্যুত করিয়া স্বয়ং দ্বাদশ চাকলার অধিকারী হইলেন; এবং পুরস্কার স্বরূপ বাদসাহের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঢাকার নবাব সীতারামের নিকট পুনঃ পুনঃ রাজস্ব চাহিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তেজীয়ান্ সীতারাম তদীয় অধিকার অস্বীকার করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন "আমি নবাবের অধীনস্থ প্রজা নই; সুতরাং আমার নিকট রাজস্ব প্রার্থনা তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমি স্বাধীন, আর যদি রাজস্ব দিতে হয় তবে দিল্লীশ্বরকেই দিব"।

এই উত্তরে নবাব রুষ্ট হইয়া সীতারামের শাসন জন্য বারংবার সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতিবারই স্বকীয় শৌর্য্যবীর্য্যে এবং মেনাহাতীর সাহায্যে সীতারাম জয় লাভ করিলেন। পরিশেষে নবাব স্বীয় জামাতা আবুতরাবকে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য সৈন্য সামন্ত আসিয়া রজনীযোগে মামুদপুরের দুর্গ পরিবেষ্টন করিল। সীতারাম সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন, এমন সময় এই কুসংবাদ তাঁহার কর্ণ গোচর হইল। একটু ব্যস্ততা নিবন্ধন সে বাজি হারিলেন। তখন যারপর নাই বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আজ যে কষ্ট পাইলাম, হারাম জাদা যবনের মাথা কাটিলেও একষ্ট ভুলিবার নহে"। প্রভুভক্ত মেনাহাতী নিকটে দণ্ডায়মান ছিল; এই বাক্য শ্রবণমাত্র নিঃশব্দে তথা হইতে প্রস্থান করিল। রজনী প্রভাতে সীতারাম মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় তদীয় পদতলে একটি মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক মেনাহাতী সেলাম করিল। সীতারাম জিজ্ঞাসিলেন 'এ কি?' সৈন্যাধ্যক্ষ কহিল 'হুজুর! নবাব সৈন্যেরা পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে; এটি যবন সেনানী আবুতরাবের মস্তক।' সেনাপতি বাস্তবিকই এইরূপ অসম সাহসের কার্য্য করিবে, সীতারাম একবারও মনে ভাবেন নাই, সুতরাং তৎপ্রমুখাৎ এই আকস্মিক সংবাদ শ্রবণে একটুকু চিন্তিত, একটুকু ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া মেনাহাতীকে ধন্যবাদ ও পুরস্কার প্রদান করিলেন; এবং কহিলেন

"আর মহেশের সহিত সদ্ভাবের প্রত্যাশা নাই, কিন্তু কোন ভয় নাই। তুমি ক্রমে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি কর, ও প্রকাশ্য যুদ্ধের আয়োজন কর।"

আবুতরাবের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে নবাব জ্বলন্ত অগ্নিবৎ কুপিত হইলেন; এবং সিংহরাম সাহাকে অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে মামুদপুর প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সিংহরাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেনানীদিগের নিয়তি স্মরণ করিয়া সম্মুখ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণমন্থুকতা অবলম্বন করিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিয়া ছিলেন, মেনাহাতী জীবিত থাকিতে সীতারাম রায়ের করিতে পারিবেন না। অতএব অগ্রে মেনাহাতীকে হস্তগত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কাল পূর্ণ হইয়া আসিলে তৎসময়োপযোগী সুযোগেরও অপ্রতুল থাকেনা। সিংহরাম যখন গুপ্তভাবে কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে মামুদপুর উপস্থিত হন, তখন একদা লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীতে যাত্রাগান হইতে ছিল। মেনাহাতী অন্যান্য শ্রোতৃবর্গের সহিত যাত্রা শুনিতেছে, ইহা অবগত হইয়া, বিপক্ষেরা ঐ সুযোগে সামিয়ানার রজ্জু চতুষ্টয় যুগপৎ ছেদন করিয়া দিল; এবং সামিয়ানা সমেত মেনাহাতীকে চাপিয়া ধরিয়া লৌহপিঞ্জরে পুরিল। কেহ কেহ কহেন, সিংহদ্বারে শয়ান অবস্থায় সে ধৃত হয়। আবার কেহ কহেন একদা প্রাতে মেনাহাতী মলত্যাগ করিতে দোলমন্দিরের নিকট দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় নবাবের চরেরা তাহাকে ধৃত করে। যাহোক, ধৃত হওয়ার পর মেনাহাতী সপ্তাহ জীবিত ছিল। এই সপ্তাহ কাল তাহার উপর অনবরত লগুড় ও অসির আঘাত হইয়াছিল, তথাপি তদীয় শরীর কেহই ভেদ করিতে পারিয়া ছিলনা। লোকে বলে তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে চর্ম্মের নীচে একটী আশ্চর্য্য কবচ প্রোথিত ছিল। সেই কবচের গুণে যদিও তদীয় শরীরে প্রহারের বেদনা লাগিত, তথাপি কেহ তাহা ভেদ করিতে পারিত না। ক্রমে সপ্তাহ প্রহার খাইয়া যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিয়া মেনাহাতী উক্ত ঔষধের সন্ধান কহিয়া দিল। এবং রামসাগরের জলে উক্ত ঔষধ স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া মানবলীলা সংবরণ করিল। যবন সেনাপতি উপহার স্বরূপ তদীয় মস্তক নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই প্রকাণ্ড শির সন্দর্শন পূর্ব্বক নবাব আক্ষেপ করিয়া কহিলেন "এরূপ অদ্ভুত বীরের মস্তকচ্ছেদন না করিয়া জীবিতাবস্থায় আমার নিকট প্রেরণ করা কর্ত্তব্য ছিল।" এবং লোক দ্বারা উক্ত

মস্তক মামুদপুরে প্রতিপ্রেরণ করিলেন। তদীয় সমাধিস্থানে একটি মস্জিদ স্থাপিত হইল। সেই মস্জিদের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। হস্তীর মরণে যেমন ভগবত্ত শক্তিহীন হইয়াছিলেন; মেনাহাতীর মরণে সীতারাম রায় ও তদ্রূপ আপনাকে সহায়হীন মনে করিলেন। তখন আয়ুঃকাল নিতান্ত পূর্ণ জানিয়া সিংহরামের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। যবন সেনানী লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া সীতারামকে নবাবের নিকট লইয়া চলিলেন; কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌঁছনের পূর্ব্বেই হীরকাঙ্গুরী লেহন পূর্ব্বক সীতারাম দেহপাত করিলেন। এইরূপে অনুমানিক ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ যৌবনে রাজা সীতারাম রায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদীয় মরণে হতভাগনী বঙ্গমাতা একটি কৃতীপুত্ররত্নে অকালে বঞ্চিতা হইলেন। সীতারাম গিয়াছেন বটে, কিন্তু তদীয় নাম অনেকের মনে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।

সীতারাম বিদ্বান্ ছিলেন না বটে, কিন্তু দেবদ্বিজের প্রতি অচলাভক্তি এবং যবনের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ, তদীয় চরিত্রের দুইটি প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি ধনাঢ্য লোকদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ অনেক করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক দীন দুঃখীর প্রতিপালন করিয়াছেন; অনেক ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়াছেন; অনেককে পিতৃমাতৃদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; এবং অনেক দুর্ব্বল তালুকদারের বিত্ত রক্ষা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা সাত শত কোদালী চলিত। কথিত আছে তিনি প্রত্যহ নূতনপুষ্করিণী খনন করাইয়া স্নান করিতেন। যশোর জিলায় যত দীঘি, পুষ্করিণী এত আর কোথাও দেখা যায় না। বোধহয়, ইহাই উক্ত প্রবাদের মূল। ফলতঃ দেবালয় ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও জলাশয় খনন তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কার্য্য ছিল। প্রধান প্রধান কয়েকটির বিষয় আমরা নিম্নে উল্লেখ করিব। ইহাঁর কোন কোন বিষয়ে দৈবশক্তি ছিল, তন্মধ্যে একটির বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে। লোকে বলে, ইহাঁর "দিব্য দৃষ্টি" ছিল; তৎপ্রভাবে অনেক সময় অনেক গুপ্তধনের আবিষ্কার করিতেন। একদা যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন একবৃদ্ধার চালের উপর একটি অশ্বত্থবৃক্ষ উঠিয়াছে, তাহার নীচে প্রভূত ধন প্রোথিত আছে। বৃদ্ধার নিকট বিংশতি মুদ্রা দিয়া বৃক্ষটি ক্রয় করিলেন, এবং তাহার পাদদেশ হইতে এক কলসী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আর একটি সঙ্কল্প ছিল যে, কোন ব্যক্তিই যেন তদীয় কীর্ত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর

কীর্ত্তি চিহ্ন স্থাপন করিতে না পারে। তাঁহার দেওয়ান একটি দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। লোক মুখে শুনিতে পাইলেন উক্ত বাপী স্বীয় কৃষ্ণসায়র প্রভৃতি অপেক্ষাও বৃহৎ হইয়াছে। অতএব রাত্রিযোগে তাহার মধ্যভাগ মৃত্তিকা দ্বারা এরূপ পূর্ণ করাইলেন যে, উভয় পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী মাত্র রহিল।

তিনি সতরঞ্চ ক্রীড়াতে অত্যন্ত নিপুণ, ইহা জানিতে পারিয়া নবাব-জামাতা লিখিয়া পাঠাইলেন ; খেলাতে যে পরাজিত হইবে তাহার শিরশ্ছেদন হইবে, এই নিয়মে আপনি আমার সহিত খেলিতে প্রস্তুত আছেন কি না? সীতারাম কিছুতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার লোক ছিলেন না। একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উভয় পক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ দুইজন "দবাবাজ" খেলিতে বসিল ; নবাবজামাতা ও সীতারাম পত্রদ্বারা "চাল" বলিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে সীতারাম জয় লাভ করিলেন। নবাব, জামাতার দ্বারা, ক্রীড়াব্যপদেশে সীতারামের প্রাণ সংহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন ; বিধাতা বিপরীত ফল প্রদান করিলেন। কিন্তু মহানুভব সীতারাম প্রতিদ্বন্দ্বীর শিরশ্ছেদন না করিয়া কেবল তদীয় স্কন্ধে অসি স্পর্শ করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। সীতারামের কতদূর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল তদ্বিষয়েও একটি গল্প দেওয়া যাইতেছে। তদানীন্তন চাঁচড়ার রাজা স্বীয় দুহিতার পরিণয়ে সীতারামকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণের প্রায় দুই মাস পরে সীতারাম নীলগঞ্জের পূর্ব্বপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নীলগঞ্জের সেতু ছিল না। সুতরাং লোক জন হাতী ঘোড়া পার করিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি কহিল "মহারাজ! চাঁচড়ার রাজকুমারীর পরিণয় অনেক দিন শেষ হইয়াছে"। সহসা তাহার বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া রাজ ভবনে বার্ত্তা জানিতে লোক প্রেরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া চাঁচড়া অধিপতির অনেক কর্ম্মচারী যাইয়া নিবেদন করিল 'প্রায় দুই মাস হইল রাজনন্দিনীর বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছে।' সীতারাম কহিলেন "বিবাহান্তে আমার আমন্ত্রণ হইল কেন?' কর্ম্মচারী কহিল "বিবাহের বহুদিন পূর্ব্বেই মহারাজের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।" সীতারাম কহিলেন "আমার আসিতে যদি বিলম্বই হইয়া থাকে, তবে আমার আগমন প্রতীক্ষায় পরিণয় স্থগিত থাকিল না কেন?" কর্ম্মচারী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল "সেকি মহারাজ! শুভ দিন না হইলে ত বিবাহ দেওয়া যায় না।" সীতারাম অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া কহিলেন

'শুভদিন! কিসের দিন আর ক্ষণ? যেদিন সীতারাম রায় পদার্পণ করিবেন, সেই দিন চাঁচড়ার শুভ দিন বলিয়া গণ্য করা উচিত ছিল। ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান! তোমার রাজাকে যাইয়া বল, হয় আমাকে কর প্রদান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, নচেৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।'' চাঁচড়াধিপ কর্ম্মচারীর প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনিয়া কর প্রদান করিয়া, সীতারামের ক্রোধাগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সীতারাম অত্যন্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া উঠেন। এসম্বন্ধে অনেক গুলি কদর্য্য গল্প আছে, তৎসমুদায় বিবৃত করিয়া বান্ধবের কলেবর কলঙ্কিত করিব না। এই ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতেই যশোর প্রদেশে "সীতারামি সুখ" নামে একটি কথা প্রচলিত হইয়াছে: এবং অনেকের মুখে নিম্ন লিখিত শ্লোকটিও শুনাযায়—

'দাতার মধ্যে খেলারাম,
বদমায়েসে সীতারাম।''

সীতারাম সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়া আমরা তদীয় কয়েকটি প্রধান কীর্ত্তির উল্লেখ করিতেছি।

চতুষ্কোণ দুর্গ। চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাকার; দৈর্ঘ প্রস্থ প্রত্যেক দিকে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ গড়খাই ছিল। পূর্ব্ব উত্তর দিগের চৌবাচ্চা দুইটি প্রায় মৃত্তিকায় পূর্ণ হইয়াছে; পশ্চিম দিগের টি এখনও জলপূর্ণ। দক্ষিণস্থ গড়খাইটির দৈর্ঘ্য প্রাচীরের অপেক্ষাও বৃহৎ এখনও জলপূর্ণ আছে, দেখিতে একটি নদীর মত দেখা যায়। অনেকে বাগআলি, নারায়ণপুর, কানাইনগর প্রভৃতির সাধারণ নাম মামুদপুর কহেন। কিন্তু দুর্গ বেষ্টিত রাজধানী বাগআলি মৌজায় স্থাপিত; সে নাম পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। আর দুটি নগরেরও স্বতন্ত্র নাম আছে; সুতরাং দুর্গ বেষ্টিত স্থানের নামই প্রকৃত মামুদপুর বলিয়া বোধ হয়। আবার এমনও হইতে পারে যে সমগ্র গ্রামের নাম মামুদপুর, তাহার অংশ গুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। এইস্থানে পূর্ব্বে মামুদ খাঁ নামে একজন ফকির বাস করিত। সীতারাম তাহাকে স্থানান্তর যাইতে বারংবার অনুরোধ করেন। তাহাতে সে যাইবার সময় সীতারাম রায়কে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয় যে, তাহার নামে সীতারামের রাজধানীর নামকরণ করিবেন। এই দুর্গের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে প্রধান দ্বার। এইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে একটি উচ্চ ও অতিবিস্তীর্ণ স্থান লক্ষিত হয়; এইস্থানে

পুরাতন বিপণি ছিল। দক্ষিণাভিমুখে চাহিলে, রাম সাগর নামে সুবৃহৎ সরোবর নয়ন গোচর হয়।

রামসাগর। প্রায় ১৭০ বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি ইহার তুল্য চমৎকার জলাশয় যশোর জিলার কোন স্থানেই দেখা যায় না। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর হইতে দক্ষিণে অনুমান সহস্র হস্ত, এবং প্রস্থ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় ৫০০ শত হস্ত। চৈত্র বৈশাখ মাসে ও ইহাতে ১৩। ১৪ হাত জল থাকে। পূর্ব্বে যে অলাবুবৃক্ষের নীচে অর্থ প্রাপ্তির বিবরণ লিখিত হইয়াছে, সেই অর্থে ইহা খনিত হয়।

সুখসাগর। রামসাগরেরপ্রায় ৯০০ হস্ত পশ্চিমে এটি অবস্থিত। উহা অপেক্ষা ইহার আয়তন অনেক ন্যূন কিন্তু ইহার মধ্যস্থানে একটি দ্বীপাকার স্থান আছে। উহাতে সীতারামের এক বিচিত্র হর্ম্ম্য ছিল। নিদাঘকালে সীতারাম রায় ঐ গৃহে নিশাযাপন করিতেন।

কানুনগু কাছাড়ি। পূর্ব্বোক্ত বাজার হইতে দুর্গের মধ্য ভাগে প্রশস্ত পথ যাইয়া শেষ হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে কানুনগুকাছাড়ির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উক্ত রাস্তার উত্তরপার্শ্বে সীতারামের দোল মন্দির ও নহবতখানা ছিল।

এতদ্ব্যতীত সীতারাম রায়ের "মালকাছাড়ি" কারাগৃহ, পুণ্যাঘর, সিংহদ্বার, মালখানা, অন্দরমহল প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্টি গোচর হয়। দুর্গের মধ্যে পাঁচটি চক ছিল, এবং অধিকাংশ গৃহই ত্রিতল ছিল বলিয়া শুনা যায়। মালকাছাড়ি ও কারাগৃহের নিকটেই একটি শানবাঁধা চবুতারা ছিল। এই স্থলেই সীতারামের সঞ্চিত অর্থ থাকিত। এখনও অনেকে ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে অর্থ লাভ করিয়া থাকে। ইহাদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণনে বিরত থাকিয়া, আমরা তিনটি দেবালয়ের উল্লেখ করিব।

দশভুজালয়। কোষাগারের নিকটে ইহা অবস্থিত। ইহার আয়তন বড় বৃহৎ নহে; আকারে ঠিক দ্বিচাল বিশিষ্ট কাঁচা ঘরের ন্যায়, সম্মুখে একটি বারেণ্ডা। ইহার পুরোভাগের পুরাতন খিলানগুলি গিয়াছে; তাহার স্থানে নূতন খিলান দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অতি কদর্য্য ও অকর্ম্মণ্য। ইহার সম্মুখে একটি সংস্কৃত শ্লোক লেখা ছিল, অধুনা তাহা দেখা যায় না। সে শ্লোকটি এই:—

"মহীভুজ রসক্ষৌণীশকে দশভুজালয়ম্,
অকারি শ্রীসীতারামরায়েণ দেবমন্দিরম্"

অর্থাৎ মহী (১) ভুজ (২) রস (৬) ক্ষৌণী (১) শকে সীতারাম রায় কর্ত্তৃক এই দশভুজালয় নির্ম্মিত

হইল। প্রচলিত রীত্যনুসারে ১৬২১ শক অর্থাৎ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দ হইল।

লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির। কোষাগারের দক্ষিণ পার্শ্বে এই মন্দিরটি স্থাপিত। ইহা দ্বিতল ও অষ্টকোণ। ইহাতে বিশেষ কারুনৈপুণ্য নাই। দিবাভাগে নিম্নতলে বিগ্রহের পূজাদি হয়; রাত্রিকালে উপর তলে শয়ন করা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে গোবিন্দ জীউ ও লক্ষ্মীর দুইটি মূর্ত্তি আছে। এই লক্ষ্মীনারায়ণ সম্বন্ধে তিনটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমটি এই, একদা হরিহর নগর হইতে সীতারাম রায় অশ্বারোহণে শ্যাম নগর যাইতে ছিলেন। পথি মধ্যে তদীয় ঘোটকের পাদ চতুষ্টয় মৃত্তিকায় এরূপ প্রোথিত হইয়া গেলযে কোনক্রমে তাহা ছাড়াইতে পারিলেন না। লোক জন আসিয়া উক্ত স্থান খনন করিতে লাগিল, খনন করিতে২ একটি মন্দির ও তম্মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইল। এগল্পটি আমূল মিথ্যা। দ্বিতীয়টি এই; সীতারাম একদা একটি ঝোপের নিকট মলত্যাগ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় একটি শালগ্রাম দেখিতে পাইলেন। শৌচান্তে বিগ্রহটি আনিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে দেখাইলেন, তাঁহারা লক্ষণ দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি বলিয়া নির্ণয় করিলেন। তৃতীয়টি এই যে, লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং স্বপ্নাবেশে সীতারামকে আপনার অবস্থিতি স্থান বলিয়া দেন; তদনুসারে সীতারাম তাহা আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করেন। এই মন্দিরের পুরোভাগেও একটি সংস্কৃত উৎসর্গলিপি ছিল। তাহা এই:—

"লক্ষ্মীনারায়ণ স্থিত্যৈ
তর্কাক্ষিরসভূশকে,
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থম্
সীতারামেণ মন্দিরম্

অর্থাৎ ১৬২৬ শকে (১৭০৪ খৃঃ অঃ) পিতৃ পুণ্যার্থে সীতারাম কর্ত্তৃক এই লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের কৃপায়ই সীতারামের উন্নতি। সুতরাং সীতারাম ইহাঁর সেবার জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। দোল ও রথ যাত্রায়ই বিশেষ আমোদ হইত। রথ যাত্রায় কানাই নগর হইতে বলরাম ও হরেকৃষ্ণ আসিতেন। ১৮৩৬ অব্দ হইতে মামুদপুর নিতান্ত শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লোকে তাহার কারণ এই বলে যে, নড়ালের জমিদারেরা মামুদপুর ক্রয় করিবার পর আসল লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি হরণ করিয়া আপনাদিগের আলয়ে স্থাপন করিয়াছেন। সেই অবধি নড়াল সমৃদ্ধ ও মামুদপুর শ্রীহীন হইয়াছে।

হরে কৃষ্ণ মন্দির। এই মন্দিরটি নিকটবর্ত্তী কানাই নগরে অবস্থিত। ওয়েষ্ট লেণ্ড সাহেব ইহার অতি সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়াছেন; কিন্তু তাহা বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিলে পাঠকের তত হৃদয়গ্রাহী হইবে না। সুতরাং স্থূল স্থূল কথাগুলি বলিতেছি। দ্বিহস্ত উচ্চ একটি ভিত্তির উপর মন্দিরটি অবস্থিত; নিম্নভাগ চতুষ্কোণ, কিন্তু উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে একটি ত্রিশূলযুক্ত গুম্বেজ। চারি কোণে চারিটি স্তম্ভ ও তদুপরিও চারিটি ক্ষুদ্র গুম্বেজ। ইষ্টকে শ্রীমদ্ভাগবৎ বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার প্রতিমূর্ত্তি খোদিত। তদ্ব্যতীত লতা পুষ্প প্রভৃতি বিবিধ কারুকার্য্যে খচিত। সম্মুখে একটি বারেণ্ডা, এক২ দিকে তিনটি খিলান দ্বার। প্রত্যেক দ্বারের উপর সিংহ ও উৎক্রোশ পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি। মন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বলরামের ও আর কয়েকটি বিগ্রহের মন্দির আছে। তৎসমুদয় এই প্রধান মন্দিরের শাখা বলিয়াই অনুভূত হয়। ইহার পুরোভাগে ও একটি সংস্কৃত শ্লোক এখন বিদ্যমান আছে। কিন্তু এত অস্পষ্ট হইয়াছে যে, পাঠকরা দুষ্কর। যথা—

"বাণবহ্ন্যঙ্গচন্দ্রৈঃ পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী
শ্রীমদ্বিশ্বাস ভাবোদ্ভব কুলকমলোল্লাসকো ভানুতুল্যঃ।
অভ্রভ্রম্ সৌধযুক্তং রুচিরকচিহরেকৃষ্ণগেহম্ বিচিত্রম্।
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ।"

১৬২৫ শকে (১৭০৩ খৃঃ অ) কৃষ্ণতোষাভিলাষী বিশ্বাসাখ্য বংশরূপ কমলের দীপ্তিকারী ভানুতুল্য শ্রীসীতারাম রায় ভক্তিমান হইয়া অসংখ্য সৌধ পরিবেষ্টিত সুন্দর বিচিত্র হরেকৃষ্ণগেহ যদুপতি নগরে উৎসর্গ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টলেণ্ড সাহেব "অভ্রভ্রম্ সৌধযুক্তে" পাঠ দিয়া, উক্ত পদটিকে যদুপতি নগরের (কানাই নগরের) বিশেষণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রথমতঃ দুরন্বয় দোষ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ এটি বৃত্তান্ত ঘটিত ভ্রম হয়। কানাই নগরে পূর্ব্বোক্ত দেবালয় ক একটি ভিন্ন অপর অট্টালিকা ছিলনা; সুতরাং উহা কোন ক্রমেই নগরের বিশেষণ হইতে পারে না। এভ্রমটিও কথঞ্চিৎ মার্জ্জনীয় কিন্তু তিনি যে স্বীয় মত স্থায়ী রাখিবার জন্য কষ্ট কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন, বোধ হয় সীতারাম রায় যদুপতি নগর দ্বারা সমগ্র মামুদপুরকেই বুঝাইয়া থাকিবেন। ইহা বড় আশ্চর্য্য অনুমান।

আমরা এই কষ্টকল্পনাও মার্জ্জনা

করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু উক্ত মহাত্মা যে আর একটি বিষম ভুল করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই মার্জ্জনা করা যায় না। তিনি তৃতীয় চরণটি এই ভাবে স্থাপন করিয়াছেন;—

'অজস্রম্ সৌধযুক্তে রুচিরকচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রম্।' সুতরাং তাঁহাকে 'রুচিরকচি হরে' পদটি যদুপতি নগরের বিশেষণ করিয়া এইরূপ অর্থ করিতে হইয়াছে যে, "সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যহারি যদুপতিনগরে বিচিত্র কৃষ্ণগেহ" ইত্যাদি। ইহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমতঃ দুরন্বয় দোষ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কানাই নগরের উক্তরূপ বিশেষণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ নগরের সৌন্দর্য্য বর্ণন অপেক্ষা বর্ণিত বিষয় অর্থাৎ মন্দিরের সৌন্দর্য্য বর্ণনাই অধিক সম্ভবপর ও বৃত্তান্তের সহিতও সুসঙ্গত। চতুর্থতঃ সাহেব স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, সকল লোকেই ঐ বিগ্রহকে "হরে কৃষ্ণ" কহে। পঞ্চমতঃ উক্ত বিগ্রহের নামে "হরেকৃষ্ণ নগর" বলিয়া একটি নিকটবর্ত্তী গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সাহেব বলেন শ্লোকের পাঠ বুঝিতে না পারিয়া লোকের বিগ্রহ সম্বন্ধে ভ্রম হইয়াছে; এবং তদ্বশতঃ গ্রামের নামেও ভ্রম। এবড় কৌতুকাবহ কথা! দেশ শুদ্ধ লোকের এরূপ সামান্য বিষয়ে এতবড় একটি ভ্রম হইল, আর দুই দিনের তরে একজন বিদেশী আসিয়া সেই ভ্রম প্রদর্শনে প্রবৃত্ত!

কৃষ্ণ সায়র। এই কানাই নগরে রাম সাগরের ন্যায় আর একটি সুবৃহৎ সরোবর আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১০ রশি, প্রস্থ ৬ রশি হইবে। যশোর জিলার আরও অনেক স্থানে সীতারাম রায়ের কীর্ত্তি আছে। তত্তাবৎ বর্ণন পূর্ব্বক প্রস্তাব বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। নাটোরের রাজবংশের আদি পুরুষ রাজা রঘুনন্দন, অভ্যুদয়ের প্রাক্কালেই, সীতারাম রায়ের জমিদারী স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে ক্রয় করেন। প্রধান বিগ্রহ কয়েকটির সেবার জন্য সংপ্রতি কিঞ্চিৎ বিত্ত আছে; আর সমস্তই নানা জমিদারের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে। সীতারামের বংশধর কেহই জীবিত নাই। সীতারামের মৃত্যু সময় তদীয় তনয় প্রেমনারায়ণ রায় বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিও অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত লং সাহেব যে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের প্রাচীন কাগজ পত্র পুস্তকাকারে প্রচারিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে ২। ৩ স্থলে একদল ডাকাতের উপলক্ষে সীতারাম রায়ের জমিদারীর মাত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (জ)

—:০:—

"হোক্ ভারতের জয়।" *

এস এস ভ্রাতৃগণ! সরল অন্তরে,
সরল প্রীতির ভরে,
সবে মিলি পরস্পরে,
আলিঙ্গন করি আজ বহুদিন পরে।
এসেছে জাতীয় মেলা ভারতভূষণ,
ভারত সমাজে তবে,
হৃদয় খুলিয়া সবে,
এস এস এস করি প্রিয় সম্ভাষণ।
দূরকর আত্মভেদ বিপদ-অঙ্কুর,
দূরকর মলিনতা,
বিলাসিতা অলসতা,
হীনতা ক্ষীণতা দোষ কর সবে দূর।
ভীরুতা বঙ্গীয়জনকলঙ্ক প্রধান,
সে কলঙ্ক দূর কর,
সাহসিক তেজ ধর,
স্বকার্য্য-কুশল হও হয়ে এক তান।
হ'লনা কিছুই করা যা করিতে এলে,
এই দেখ হিন্দু মেলা,
তবে কেন কর হেলা,
কি হবে কি হবে আর তুচ্ছ খেলা খেলে।
সাগরের স্রোত সম যাইছে সময়।
তুচ্ছকাজে কেন রও,
স্বদেশ হিতৈষী হও,
স্বদেশের জনগণে দাওরে অভয়।

নাহি আর জননীর পূর্ব্ব সুতগণ,
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীর,
অনন্ত জলধিতলে হয়েছে মগন।
নাহি সেই রাম আদি সম্রাট প্রাচীন,
বিক্রম আদিত্য রাজ,
কালিদাস কবিরাজ,
পরাশর পারাশর পণ্ডিত প্রবীণ।
সকলেই জল বায়ু তেজ মৃত্তিকায়,
মিশাইয়া নিজদেহ,
অনন্ত ব্রহ্মের গেহ,
পশেছে কীর্ত্তিরে শুধু রাখিয়ে ধরায়।
আদরে সে প্রিয় সখী আচ্ছাদি গগণে,
সে লোক-বিশ্রুত নাম,
সে বিশ্ব বিজয়ি ধাম,
নির্ঘোষে ঘুষিছে সদা অখিল ভুবনে।
যবনের রাজ্যকালে কীর্ত্তির আধার,
চিতোর নগর নাম,
অতুল বীরত্ব ধাম,
কেমন ছিলরে মনে ভাব একবার।
এইরূপ কতশত নগর প্রাচীন,
সুকীর্ত্তি-তপনকরে,
ভারত উজ্জ্বল ক'রে,
অনন্ত কালের গর্ভে হয়েছে বিলীন।

---

* হিন্দুমেলা উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল।

নাহি সেই ভারতের একতা বিভব,
পাষাণ বাঁধিয়া গলে,
সকলের পদতলে,
লুটাইছে আর্য্যগণ হইয়া নীরব।
গেল হায়! সব সুখ অভাগী মাতার,
ছিল যত মন আশা,
নিল কাল সর্ব্ব নাশা,
প্রসন্ন বদন হ'ল বিষণ্ণ তাঁহার।
কি আর হইবে মাতা খুলিয়া বদন,
দীপ্তভানু অস্তগেল,
এবে কাল রাত্রি এল,
বসনে আবরি মুখ কাঁদ সর্ব্বক্ষণ।
বিশাল অপার সিন্ধু! গভীর নিস্বনে,
যেখানে যেখানে যাও,
কাঁদিতে কাঁদিতে গাও,
ডুবিল ভারত-রবি অনন্ত জীবনে।
সুবিখ্যাত গৌড় যেই বঙ্গের রতন,
তার কীর্ত্তি প্রতিভায়,
খ্যাতাপন্ন এধরায়,
হয়েছিল একদিন বঙ্গবাসি গণ।
গেল সে বঙ্গের জ্যোতিঃ কিছুকাল পরে.
কোন চিহ্ন নাহি তার,
পরিয়া হীনতা হার,
ডুবিয়াছে এবে বঙ্গ কলঙ্ক সাগরে।
হিন্দু জন ভ্রাতৃগণ! করিহে বিনয়,
একতা উৎসাহ ধর,
জাতীয় উন্নতি কর,
ঘুষুক ভুবনে সবে ভারতের জয়।
জগদীশ! তুমি নাথ! নিত্য নিরাময়
কর কৃপা বিতরণ,
অধিবাসিজনগণ,
করুক উন্নতি "হোক্ ভারতের জয়।"

(র)

আমরা কিরূপ সভ্যতা অবলম্বন করিব।

(২)

স্বার্থশূন্যতা, বৈরাগ্য, পরিতৃপ্তি, ও শিষ্টাচার, প্রাচীন আর্য্য জাতির সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি বিশিষ্ট। এই সভ্যতার জন্মভূমি মধ্য ইউরোপ। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম যোগে গথ ও ভেণ্ডাল, গল্ ও সেকৃসন্ প্রভৃতি অসভ্যজাতীয় লোকেরা রোমান্‌দিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের সাম্রাজ্য অধিকার করে; এবং ইউরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে তাহাদিগের বসতি স্থাপন করে। জর্ম্মণ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি এইক্ষণকার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় জাতি সেই সমুদয় অসভ্য জাতি হইতে উদ্ভূত।

সেই সকল অসভ্য জাতির আদিম বসতি স্থান মধ্য ইউরোপের প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগের রীতি, নীতি,

আচার, ব্যবহার ও মানসিক ভাব প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিল। পরে তাহারা ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, সেই দেশের অবস্থা এবং প্রকৃতিও ঐ প্রকার জাতীয় উন্নতির প্রতিপোষক ছিল বলিয়া, সেই সমস্ত জাতি, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা বিনষ্ট করিয়া, এক প্রকার অভিনব সভ্যতা উদ্ভাবন করে। সেই সভ্যতাই ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া এইক্ষণ পৃথিবীতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

এই সভ্যতার বসতি স্থান, শীত প্রধান ও পার্ব্বত্যদেশ এবং সেখানকার ভূমি অনুর্ব্বরা। সুতরাং আহারোপযোগি সামগ্রী অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথচ গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসী লোকদিগের অপেক্ষা এইরূপ দেশের লোকের অভাব অধিক। শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধনোপযোগী অধিক পরিমাণ স্নেহময় আহারীয় সামগ্রী আবশ্যক; বাহ্যহিম ও ঝটিকা বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সুদৃঢ় ও সুবেষ্টিত গৃহাদি নির্ম্মাণ করা অপরিহার্য্য। গ্রীষ্ম প্রধান দেশীয় লোকের বস্ত্র পরিধান, কেবল লজ্জা নিবারণ ও শোভা বর্দ্ধন নিমিত্ত; কিন্তু হিম প্রধান দেশে শরীরের তাপরক্ষণোপযোগী আচ্ছাদন, আহারীয় সামগ্রীর ন্যায় সমান আবশ্যক। আহারীয় বস্তু প্রস্তুত করিতে যত ইন্ধন লাগে, শীত নিবারণজন্য ঘরে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে তাহা অপেক্ষাও অধিক দাহ্য পদার্থের প্রয়োজন।

এই সকল কারণে, ঐরূপ দেশে লোকের জীবন ধারণ করিতে বহু উপকরণ আবশ্যক, অথচ তৎসমুদয় অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনিচ্ছুক প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া মনুষ্যকে সমুদয় আবশ্যক সামগ্রী আহরণ করিতে হয়; এবং যাহা প্রকৃতির তেমন কোমল ও মধুর ভাব এবং মনোহারিণী শোভা না থাকাতে লোকের মন নিরুদ্বেগ থাকিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন ও কবিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কি প্রকারে প্রকৃতির উপর বল প্রয়োগ করিয়া আবশ্যক সামগ্রী সমুদয় উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে, সেই চিন্তাতেই মন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে; সুতরাং প্রকৃতির নিয়মাবলী অনুসন্ধান এবং ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য স্থাপনের দিকেই তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক চালনা হয়। যেখানে জীবন ধারণোপযোগি উপকরণ এত অধিক পরিমাণে আবশ্যক, অথচ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হয়, সেই স্থানে মানব

সমাজে জীবনের সংগ্রাম অসামান্যরূপে প্রবল হইয়া উঠে।

এই প্রকার সমাজে আত্মসুখসাধন ও সম্পত্তি অর্জ্জনের বাসনা অসাধারণরূপে তেজস্বিনী হয়, আর সেই বাসনার তৃপ্তি সাধন চেষ্টায় অসামান্য বীর্য্য, শ্রমশীলতা, একাগ্রতা ও কার্য্য নৈপুণ্য আপনা হইতে জন্মে। প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপে সুখ ও সম্পত্তি অর্জ্জন চেষ্টায় নিযুক্ত থাকাতে যে ভয়ঙ্কর জীবন সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে আততায়ীর হাত হইতে উপার্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করা, অথবা আততায়ীরূপে অন্যের উপার্জ্জন হস্তগত করা, ইত্যাদি ব্যাপারে বল, বিক্রম, সাহস ও মানসিক তেজ অতিশয় সবল হইয়া পড়ে।

ইউরোপীয় জাতি সমূহের সভ্যতার স্রোত একবার এই দিকে প্রবাহিত হইলে অল্প কাল মধ্যেই তাঁহারা সমুদয় অভাব মোচন করিবার উপায় অবলম্বন করিতে অভ্যাস করেন; তৎপর যে পরাক্রম, তেজ ও পরিশ্রমক্ষমতা তাঁহাদিগকে অভাব ও হীনতার অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহাই আরও অধিক পরিমাণে প্রকৃতির উপর তাঁহাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এবং ক্রমে তাঁহাদের পরাক্রম পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে।

স্বকীয় সুখসাধন ও সম্পত্তি [illegible]নের প্রবৃত্তি, সংসার লিপ্সা, এবং অবশেষে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, এই সমুদয় আধুনিক ইউরোপীয় জাতির সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ। পরিশ্রমক্ষমতা, উদ্বেগসহনশীলতা, বল, বীর্য্য, মানসিক পরাক্রম এবং বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি, সেই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ।

আমরা ভারতবর্ষবাসী লোকেরা এই ক্ষণ প্রাচীন আর্য্য জাতির সভ্যতা, এবং আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা, এই দুই সভ্যতার মধ্যে পড়িয়াছি। আমরা পূর্ব্ব পুরুষ হইতে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার এক প্রকার রূপান্তরিত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদিগের জীবনের অধিকাংশ ব্যাপার সেই সভ্যতার অনুযায়ী। আমাদিগের মনের গতি স্বভাবতঃ তাহারই অনুরূপ। বাহির হইতে বিশেষ বল প্রযুক্ত না হইলে, অথবা আন্তরিক চেষ্টা দ্বারা মনের গতি পরিবর্ত্তিত না করিলে, আমরা স্বভাবতঃ সেই সভ্যতার দিকেই যাইতে থাকিব।

অল্প উপভোগে আমাদিগের পরিতৃপ্তি জন্মে। উপার্জ্জিত সম্পত্তি বা সম্মানের হানিজনক কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে, আমাদিগের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া, আমাদিগের অসন্তুষ্টি ও মনস্তাপ দূর করিয়া দেয়। আমরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারি

না, পারিলেও চাহি না। কিছুমাত্র উদ্বেগ উপস্থিত হইলেই, আমরা তাহা হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা পাই। কষ্টসাধ্য কোন কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিলেই মনে অসুখ জন্মে। আমাদিগের মনে শ্রমের উৎসাহ নাই; উদ্যোগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, একাগ্রতা, বীর্য্য বা কর্ম্মোৎসাহ নাই। আততায়ী দেখিলে তাহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহা হইতে পলায়ন করি। তাহারা আমাদিগের যেমন কেন অনিষ্ট সাধন করুক না, বৈরাগ্য রূপ মহৌষধের প্রসাদে আমরা ত্যাগের ভাব অবলম্বন করিয়া নিশ্চেষ্ট ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারি। আমাদিগের মনে ক্রোধ, বীরতা ও তেজ নাই। আমরা এই চাই যে, দিবসের শেষ ভাগে পথের পার্শ্ব হইতে কিঞ্চিৎ শাক আহরণ করিয়া, একমুষ্টি তণ্ডুলসহ আহার পূর্ব্বক জীবন ধারণ করি, এবং অঋণী ও অপ্রবাসী থাকিয়া, কোন ব্যক্তির সহিত কোন প্রকার বিষয় ঘটিত সম্বন্ধে সংলিপ্ত না হই, এবং স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে কোন নূতন অবস্থাতে পতিত হইতে না হয়; আর আমরা এই চাই যে, আমাদিগের এই সন্তুষ্টি ও নিরুদ্বেগের অবস্থাতে কেহ আসিয়া আমাদিগকে কোন প্রকার উপদ্রব না করে।

কিন্তু আমাদিগের এই শেষোক্ত বাঞ্ছাটি আর সম্পূর্ণ হইবার নয়। এইক্ষণ আর আমাদিগের সেই অবস্থায় থাকিবার সুযোগ নাই। অভিনব সভ্যতায় উৎসাহী ও পরাক্রমশালী লোকেরা সমস্ত জগত করতলস্থ করিবার প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, এদেশে আসিয়াও আমাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের রাজা হইয়া সমুদয় রাজকার্য্য ও নিয়মপ্রচারের ভার আপন হস্তে লইয়াছেন এবং আপন ইচ্ছামত সম্পাদন করিতেছেন। পূর্ব্বে, দেশীয় রাজার সময়ে, এদেশবাসী লোকেই প্রধান প্রধান রাজ-কার্য্য সম্পাদন করিতেন, এদেশীয় লোকেই গৌরবান্বিত ও উন্নত পদবীতে থাকিয়া অপরাপর জনগণের জীবন রক্ষার হেতু এবং আশ্রয়স্থান স্বরূপ হইতেন। প্রশস্ত বট চ্ছায়া রূপ তাঁহাদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া আপামর সাধারণ সকলে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এইক্ষণ সেই সমস্ত বটবৃক্ষ ছিন্ন হইয়াছে, অথবা জীবন শূন্য হওয়াতে তাহাদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় জীবন্ত হরিদ্বর্ণ প্রগাঢ় পল্লবরাজি নাই। ভিন্ন দেশীয় লোক সেই সমুদয় উচ্চতর পদবী অধিকার করিয়াছেন, এবং এদেশীয় লোকের শ্রমজাতসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া তাহা সঙ্গে লইয়া বিদেশে চলিয়া

যাইতেছেন। তাহা এদেশের ব্যবহারে আইসেনা। ক্রমেই ভিন্ন দেশীয় লোক আসিয়া দেশের সমুদয় লাভজনক কার্য্য হস্তগত করিয়া লইতেছেন। ইউরোপীয়েরা অভিনব সভ্যতার তেজঃপ্রভাবে যন্ত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া, অনায়াসে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া, অতিসহজমূল্যে এদেশের লোকের নিকট বিক্রয় করিতেছেন। এদেশের সমুদয় ব্যবসায়ই এক কালে উঠিয়া যাইতেছে। ইহাতে কেবল এইমাত্র অনিষ্ট হইতেছে তাহা নহে। এদেশীয় লোকেরা নানা প্রকার বিলাস সামগ্রী অতি সহজ মূল্যে পাইয়া এককালে ভুলিয়া যাইতেছেন, এবং আয়ের যে অংশ পূর্ব্বে সঞ্চয় করিতেন, এবং যাহা মূলধনরূপে ব্যবহার করিয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যের স্রোত প্রবাহিত রাখিতেন, তাহা দিয়া, অনেকে ঋণ করিয়াও এইক্ষণ সেই সমুদয় বিলাসসামগ্রী ক্রয় করিয়া এককালে নিস্ব হইয়া পড়িতেছেন। অবশেষে দেশের অবস্থা এইক্ষণ এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, সামান্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে আমরা ভুলিয়া যাইতেছি, এবং নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যবহারোপযোগী সামগ্রীর জন্যও বিদেশীয় লোকের মুখপ্রেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। এই সমুদয় কারণে, দেশের যত ব্যবহারাতিরিক্ত উৎপন্ন সামগ্রী অর্থরূপে পরিণত হইয়া পূর্ব্বে দেশীয় লোকের হাতে থাকিত এবং দেশের সঞ্চিত মূল ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিত, এইক্ষণ সেই অতিরিক্ত অর্থ সমুদয়ই বিদেশীয় লোকে লইয়া যাইতেছেন। তাহা ভিন্নদেশের সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে।

প্রকৃতি আমাদিগের জন্য তাঁহার যে প্রশস্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা উপভোগ করিতে পারিতেছি না। এদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, এক গুণ পরিশ্রম করিলে দশ গুণ কল উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহাতে আমাদিগের লাভ কি? দেশের অতিরিক্ত উৎপন্ন ভিন্নদেশীয় লোকেরা উপভোগ করেন। জননী জন্মভূমি আমাদিগের পোষণ হেতু, বক্ষঃস্থল উন্মোচন পূর্ব্বক যে অমৃত ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ভিন্ন মায়ের সন্তান আসিয়া আমাদিগকে দূর করিয়া দিয়া, তাহা পান করিয়া যাইতেছেন। আমরা সেই সুধাপান করিয়া বলিষ্ঠ হইতে পারিতেছি না। (দ)

——০:(::০):০——

স্বার্থপরতার সূক্ষ্মভেদ

স্বার্থপরতা মানব প্রকৃতির কলঙ্ক কি স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম, সেবিষয়ে বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অনেকে স্বার্থপরতাকে সংসারের একমাত্র কণ্টক, উন্নতির একমাত্র অন্তরায় এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের অসৌহার্দ্দের একমাত্র হেতু বলিয়া ইহার প্রতিকূলে চীৎকার করেন। অনেকে আবার, ইহা হইতেই গ্রাম, নগর, জনপদ, রাজ্য, সাম্রাজ্য, ইহা হইতেই মনুষ্যের মহত্ত্ব এবং পৃথিবীর সমস্ত অনুষ্ঠান, এইরূপ স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া স্বমতবিরোধীদিগকে উপহাসে উড়াইয়া দেন। এই দুইয়ের কোন্ পক্ষ সত্যের অধিকতর সন্নিহিত, তাহা আমরা এইক্ষণ মীমাংসা করিতে বসিব না। আমরা সম্প্রতি স্বার্থপরতার কতকগুলি মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত সূক্ষ্ম অবান্তর ভেদ প্রদর্শন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব।

মার্জ্জিত প্রভৃতি শব্দ এস্থলে কি অর্থে ব্যবহৃত হইল, তাহা দুই একটি উদাহরণ দিয়া বিশদ করিব। নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং নিতান্ত অশিক্ষিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, যদি বিধিবিড়ম্বনায় নিতান্ত যশোলিপ্সু হন, তাহা হইলে তিনি কথায় কথায় কিরূপে স্বকীয় যশঃস্পৃহা ব্যক্ত করেন, এবং নিকটস্থ আশ্রিত পারিষদেরাও কিরূপ স্তুতিবাদে কথায় কথায় তাঁহার শ্রুতিকণ্ডূয়ন পরিতৃপ্ত করে, তাহা সকলেই বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন। এইরূপ যশোলালসাকে অমার্জ্জিত বলি, এবং এই প্রকারের স্থূল স্তুতিবাদকেও মূঢ়জনযোগ্য অমার্জ্জিত স্তাবকতা বলিয়াই নির্দ্দেশ করি।

সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের রীতি স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগের প্রশংসাপ্রিয়তা এরূপ অপূর্ব্বকৌশলসহকারে প্রকাশিত হয় যে, অতি বিজ্ঞলোকে ও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এবং যোগ্যব্যক্তিরা আবার এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহাদিগের প্রদীপ্ত তৃষ্ণায় আহুতি দেন যে, তাঁহারা আপনারাও সকল সময়ে সেই স্তুতিবাদের সন্ধিভেদ করিতে সমর্থ হন না। চতুরের সহিত চতুরের এক হাত খেলা হইয়া যায়; মূর্খেরা নিকটে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। এইরূপ প্রশংসাপ্রিয়তা পরিমার্জ্জিত, আর এইরূপ স্তাবকতাও তথৈব পরিমার্জ্জিত। মূর্খের অভিমান একপাদপরিক্রমেই প্রকাশ হইয়া পড়ে; কিন্তু অভিমান

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত মিশ্রিত হইলে সেই বিনয়চ্ছত্র গভীর গর্ব্ব কার চক্ষে না ধূলি নিক্ষেপ করে? সেই সুমার্জ্জিত, সুসজ্জিত মিষ্ট কথার অভ্যন্তর হইতে অভিমান কি ভাবে উঁকি মারিতেছে, তাহা কে দেখিতে পারে?

স্বার্থপরতারও এইরূপ মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত এই দুইটি বিভিন্নমূর্ত্তি আছে। ইহার নামও স্বার্থপরতা, উহার নামও স্বার্থপরতা। একই পদার্থ, একই প্রকৃতি। প্রভেদ এই মাত্র, একটি সহজেই ধরা পড়ে; আর একটিকে চিনিয়া উঠিতে তাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তিও অনেক সময়ে পরাজিত হন। মূর্খেরা যখন স্বার্থপরতায় অন্ধীভূত হইয়া পরের প্রয়োজনে বাধা দেয়, অথবা পরের প্রতি নিষ্ঠুরতার একশেষ প্রদর্শন করে, তখন সকলেই তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া নিজ নিজ নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পরিচয় দেয়। কিন্তু সেই স্বার্থপরতা সুশিক্ষার মায়াময়স্পর্শে আবার যখন আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন দেখিলে, নিন্দা করা দূরে থাকুক, বরং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করিতেই সকলের প্রবৃত্তি জন্মে।

আধুনিক সুসভ্য ভাষায় পরিমার্জ্জিত স্বার্থপরতার প্রথম নাম 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য'। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা পরের প্রতি কর্ত্তব্য কাহাকে বলে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতেন। এইক্ষণ আপনার প্রতি কর্ত্তব্য তাহার সঙ্গে যোজিত হইয়া নীতিশাস্ত্রের বৃহৎ এক পরিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিয়াছে। অন্যদীয় ইষ্টের বিঘ্ন জন্মাইয়া স্বকীয় অভীষ্ট সংসাধন করিতে হইলে, এক্ষণ আর স্বার্থপর বলিয়া অপযশের ভাজন হইতে হয় না; আপনার প্রতি কর্ত্তব্য এই প্রচলিত বাক্যটিকে অতি গম্ভীর ভাবে উচ্চারণ করিলেই সকল দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। তুমি যে বস্তুটিকে ভালবাস, অন্যেও যদি সেই বস্তুটিকে ভালবাসে, তাহার ভাল বাসিবার উৎকৃষ্টতর কারণ থাকুক আর না থাকুক, তুমি আপনার প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের জন্যই তাহার হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইতে পার। ইহাতে স্বার্থপরতা নাই। কেহ যদি অকারণেও তোমার অপ্রিয় হয়, তাহার অনিষ্টচেষ্টায় ব্যাপৃত হইতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি স্বতঃ পরতঃ অশেষবিধ অত্যাচার করিয়া তাহাকে আহার নিদ্রায় বঞ্চিত করিতে পার। ইহাতে অনুমাত্রও অপরাধ স্পর্শিবে না। যেহেতু, ইহা আপনার প্রতি কর্ত্তব্য।

নিজমুখে নিজের যশোগীত গান করাকে প্রাচীন ভাষায় আত্মশ্লাঘা বলে। আত্মশ্লাঘা দ্বাদশ মহাপাত-

কের মধ্যে পরিগণিত। কেহ কেহ আত্ম-শ্লাঘাকে মৃত্যুরই নামান্তর বিবেচনা করিতেন। পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় একদা পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদ করিয়া, মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। যদুকুল-পতি, মধ্যবর্ত্তী হইয়া, উভয়দিক্ রক্ষার্থ পরামর্শ দিলেন,—'তোমার মরিবার আর প্রয়োজন নাই, আত্মগুণ কীর্ত্তন কর, তাহাতেই সমান ফল ফলিবে।' পার্থ সেই কথাপ্রমাণ আত্মগুণ কীর্ত্তন করিয়া অবধারিত মৃত্যুসংকল্প হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্যাপি আত্মনাম উচ্চারণে বিশেষ নিষেধ রহিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণকার প্রথানুসারে আপনার ভেরী আপনাকে বাজাইতে হইলে কিছুই আর আপত্তি নাই। 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' এই শব্দ কয়টিকে একটুকু স মুনাসিক স্বরে পূর্ব্ব বলিয়া লইলেই, নীতিজ্ঞের বুদ্ধি এবং নিন্দুকের জিহ্বা মন্ত্রমুগ্ধসর্পের ন্যায় সংকুচিত হইয়া যায়। তাহার পর, যাহা কিছু বলিবার থাকে, সকলই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, এক 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' স্বার্থপরতার শত শত কার্য্যকে অতি সুদৃশ্য আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছে; অথচ কেহই তৎসমুদয়কে প্রকৃত নামে পরিচয় দিতে সাহস পাইতেছে না।

বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে স্বার্থপরতার আর এক নাম 'পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য'। পরিবার শব্দের অর্থ প্রধানতঃ স্ত্রী। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে, অবশ্যই রক্ত মাংসের আকর্ষণে সময়ে সময়ে পরাজিত হইতেহয়; অবশ্যই মন কখনও না কখনও স্নেহ, মমতা, ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি দুর্দ্দম বৃত্তিচয়ের শাসনে অভিভূত হইয়া পড়ে। অতি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরাও চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পাইয়াছেন যে, এ সকল বন্ধন সহজে শিথিল হয় না। হৃদয়, সর্ব্বথা অবহেলিত হইয়াও, যেন আপনার পরাক্রমে আপনি আসিয়া আধিপত্য করে। কিন্তু হৃদয়ের আধিপত্য স্বীকার করিতে গেলে, কে পৃথিবীতে অভীষ্ট ফল ভোগ করিয়া সুখে অবস্থান করিতে পারে? হৃদয় অন্ধ। হৃদয়ের গণিতজ্ঞান নাই, হিতাহিতবোধ নাই, এবং আত্মপরবিবেচনা নাই। কেহ ক্ষুধায় কাতর হইলে, উহা আপনার মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিতে বলে। কাহারও কোন বিশেষ অভাব দেখিলে, উহা সেই অভাব মোচনের জন্য নিরন্তর উৎপীড়ন করে। আপদের উপর আপদ এই, যদি উহার শ্রুতিমোহন কোমলকণ্ঠে মোহিত হইয়া একবার কোন একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, উহার স্পর্দ্ধা ও পরাক্রম এত বাড়িয়া উঠে যে, "পরি-

নামে উহার সহিত একত্র অবস্থানও অসাধ্য হয়। এই সকল সংসারযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতির নিমিত্তই পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, এই প্রশস্ত নীতি, অন্ধকার গৃহে আলোকবর্ত্তিকার ন্যায়, সহসা সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহার আশ্রয় লইলে হৃদয় দুচারি দিন অত্যাচার করিলেও শেষে পরাভব মানিয়া পলায়ন করে, অথবা পাদদলিত কুসুমবৎ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া থাকে।

পথশ্রান্ত ভিখারী, মধ্যাহ্নরৌদ্রে গলদঘর্ম্ম হইয়া দ্বারে এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতেছে। তাহার আর্ত্তনাদে তোমায় আর কর্ণপাত করিতে হইবে না। যদি মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহার প্রতি ফিরিয়া চাও, তবে তোমার দ্বারা পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য রূপ পরম ধর্ম্ম আর প্রতিপালিত হইল না। কোন দূরসম্পর্কিত আত্মীয় দুর্দিনের তরে আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান কর। প্রবৃত্তির ক্ষণিক স্ফুরণে অধীর হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলে, পরিবারের প্রতি নিঃসন্দেহ ঘোরতর অকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হইবে। বহুদিনের পরীক্ষিত বন্ধু আজ বিপন্ন হইয়া নিকটে উপাগত। তাঁহার নিকট শতবার উপকার পাইয়াছ, এবং মুখে মুখে তাঁহাকে শতবার প্রাণ, মন, ও সর্ব্বস্ব উপহার দিয়াছ। এইক্ষণ কোন্ প্রাণে অথবা কোন্ মুখে তাহা অস্বীকার করিবে? যদি স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতার ঋণ কিঞ্চিন্মাত্রও পরিশোধ করিতে যাও, তাহা হইলে অপরিনামদর্শী হৃদয় একটুকু তৃপ্ত হইয়া অর্থশূন্য অকর্ম্মণ্য আশ্বাসদানে ক্ষণস্থায়ী একটুকু আনন্দ জন্মাইতে পারে; কিন্তু লোকে যাহা বিবেচনার কার্য্য বলে, কোন অংশেই তাহা করা হয় না। নিষেধ করাও কঠিন, কারণ তাহার উপযুক্ত একটি হেতুবাদ চাই। তুমি এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ নানাবিধ দুর্ভাবনায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছ, এমন সময়ে পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, অকস্মাৎ স্মৃতিপথে উদিত হইল, এবং সদয় চিন্তা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যের নিকট বন্ধুতা, প্রতিশ্রুতি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা কোথায় থাকে?

বস্তুতঃ পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন পার্থিবপ্রয়োজনসন্ধির এক অন্যার্থসন্ধান। আপনার প্রতি কর্ত্তব্যের ভাবে স্বার্থপরতার সামান্য কিঞ্চিৎ গন্ধ পাওয়া গেলেও, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যের ভাবে কখনও তাহা অনুভূত হয় না। এই নাম লইয়া ভ্রাতা অনায়াসে ভ্রাতা ও ভগিনীকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে পারে, স্বজন স্বজনের মমতায় জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ হয়,

এবং কুলপাবন কৃতী পুত্র সাক্ষাৎ স্নেহরূপিণী জননীকেও পিতার পরিবার বলিয়া পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে সাহস পায়।

স্বার্থপরতার যে দুইটি নাম ব্যাখ্যাত হইল, তাহা শ্রুতিকঠোর হইলেও এক পক্ষে কল্যানকর, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত না হইলেও অর্থবাদশাস্ত্রসম্মত, এবং সকলের প্রীতিকর না হইলেও পণ্ডিতসমাজের নিতান্ত প্রিয়। কিন্তু ইহা কাব্য শাস্ত্রে যে সকল নামে সমাদৃত হইয়াছে, তাহা এমনই মধুর ও মনোহর যে, শুনিলে সকলেরই চিত্ত তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে।

কেহ পরদুঃখ নিতান্ত অন্ধ ; কাব্য শাস্ত্রে তাঁহার নাম কোমলপ্রাণ। তিনি কখনও কাহারও দুঃখ কি দুরবস্থার কাহিনী শুনিতে পারেন না। কাহারও কোনরূপ ক্লেশ দর্শন তাঁহার কোমল চক্ষে কখনও সহ্য হয় না। নাটক কি উপন্যাসাদির যে যে স্থলে করুন রসের কথা থাকে, তাহা পাঠ কি শ্রবণ করিবার সময়, তাঁহার কপোল দেশ বহিয়া ধারায় নয়ন বারি নিপতিত হয় ; যাত্রাভিনয়ে রামের জটা বল্কল অথবা বিরহবিধুরা ব্রজাঙ্গনার আলুলায়িত কুন্তল দর্শন করিলে, তাঁহার বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বাক্য স্ফূর্ত্তি রহিত হইয়া যায় ; এবং মহারাজ রিচার্ডের সময় ইংলণ্ডে য়িহুদীয় অঙ্গনাদিগের কিরূপ দুর্দ্দশা ছিল, তাহা যখন কেহ তাঁহার নিকট বর্ণনা করে, তখন তাঁহার হস্তপদ নিস্পন্দ হইয়া আসে। কিন্তু এদিকে এক জন প্রতিবেশী তেমন কোন আপদে পড়িলে, কিংবা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেহ কোনরূপ উৎকটব্যাধিতে শয্যাগত হইলে, তাহার নিকটস্থ হওয়া তাঁহার পক্ষে প্রাণান্তকর হইয়া উঠে। যাহারা পরের রোগ শোক ও বিঘ্ন বিপত্তির সময় নিতান্ত নির্ম্মমের মত সম্মুখে থাকিয়া, নিয়ত পরিচর্য্যা করে, তাঁহার বিবেচনায় তাহাদিগের মন পাষাণ হইতেও কঠিন। নহিলে, যে সকল অবস্থা স্মরণ করিতেও তাঁহার মর্ম্মস্থান দগ্ধ হইয়া যায়, তাহারা কিরূপে চক্ষু মেলিয়া তাহা দর্শন করে, এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার মধ্যে ডুবিয়া রহে ?

কাহারও স্বভাব এই, তিনি সর্ব্বদাই লোকের নিকট নিজ দুঃখের গীত গাইয়া গাইয়া পৃথিবীর সময় নাশ করেন। তাঁহাকে কেহ বিনয়নম্র বলে, কেহ অবলার ন্যায় মৃদুস্বভাব বিবেচনায় ভাল বাসে এবং কেহ বা অতি সূক্ষ্মচর্ম্মা বলিয়া কৃপা করে ; কিন্তু প্রায় কেহই স্বার্থপর বলিতে সাহসী হয় না। তিনি, যে কোন সময়ে, যে কোন কথা উত্থাপন করেন, তাহার আরম্ভ, মধ্য ও শেষ সর্ব্বত্রই দীর্ঘশ্বাস।

বিধাতা তাঁহার প্রতি চিরকালই বাম; অদৃষ্ট চক্রের আবর্ত্তনে অশুভ বিনা তাঁহার অদৃষ্টে কখনও কোন শুভ ঘটনা ঘটে না। জনক জননী বীতস্নেহ, ভার্য্যা অপ্রিয়চারিণী, ভ্রাতা উদাসীন, ভৃত্য অবাধ্য, এবং বন্ধুবর্গও যার পর নাই স্বার্থপর। যে তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছে, সেই তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। তিনি মনুষ্যকে অমৃত বলিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লন; তাঁহার কপালদোষে সেই অমৃতই গরল হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দাহন করে। তিনি সোনা বলিয়া হাত বাড়ান; দৈবের ছলনায় সেই সোনাই তাঁহার হাতে ছাই হইয়া উঠে। তাঁহার আপনার দুঃখেরই অবধি নাই, তিনি পরের দুঃখ কখন কি শুনিবেন, বল। আরও দুঃখ এই, সংসার এমন হৃদয়শূন্য যে, কেহ দুদণ্ড বসিয়া, কর্ণ পাতিয়া তাঁহার সকলগুলি কথাও একবার আদ্যোপান্ত শুনিতে চাহে না। কাব্যে স্বার্থপরতার এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত এবং আরও অনেক নাম আছে। সমুদয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক।

স্বার্থপরতা রাজনীতিশাস্ত্রের নিকটও কতকগুলি শ্রদ্ধাস্পদ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় তন্মধ্যে 'সভ্যতা-বিস্তার' এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার উপর আর কথাই নাই। সভ্যতা বিস্তার কাহাকে বলে, অতি সংক্ষেপেই তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে কর, তুমি এক দেশের এক পরাক্রান্ত রাজা। তোমার রাজভাণ্ডার ধনে পরিপূর্ণ, রাজ্য জনতাভরে টলমল, বাণিজ্য দিগন্তবিস্তৃত, সকলই শোভাময়। কিন্তু সৃষ্টির কি নিয়ম! এত সম্পদ সত্ত্বেও তোমার শান্তি নাই। ঐ যে অনতিদূরে তোমার দুর্ব্বল প্রতিবেশি দিগের একটি দুর্ব্বল রাজ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তোমার সহ্য হয় না। তুমি যত কেন চেষ্টা না কর, ঐ দিগেই তোমার চক্ষু পুনঃ পুনঃ নিপতিত হয়। তোমার কেনই যেন ইচ্ছা হয় যে, যে কোনরূপে পার, একবার ঐ রাজ্যটিকে তুমি কবলিত কর। যদি উৎকৃষ্ট কোন কারণ বিনা হস্ত প্রসারণ কর, তবে অন্যান্য পরশ্রীকাতর নিষ্ঠুর প্রতিবেশীরা অমনি তোমাকে লুব্ধ শৃগাল কি বুভুক্ষু ব্যাঘ্র বলিয়া তিরস্কার করে। অথচ উপায়ও একটি না হইলেই নয়। সেই উপায়, সভ্যতা বিস্তার,—অমোঘ, অনবদ্য এবং অনন্ত যশের নিদান। যাহারা পূর্ব্বে তোমার ক্ষুধাকুলতা দেখিয়া নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত ছিল, এইক্ষণ তাহারাই তোমার স্তাবক। কারণ, এইক্ষণ তুমি কিছুই আত্মসাৎ করিতেছ না; কেবল সভ্যতা বিস্তাররূপ মঙ্গলময় ব্রতপালনেই রত রহিয়াছ।

অসভ্য বৃটনেরা তরু শাখায় কি ভূগর্ভে বাস করিয়া অসুখে দিনপাত করিতেছে ; তুমি সভ্যতা বিস্তার করিতে গিয়া তাহাদিগের গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিতেছ, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র কাড়িয়া আনিতেছে, এবং তাহাদিগের প্রধান সেনাপতিকে শৃঙ্খলবদ্ধ দশায় স্বদেশের সকলের নিকট দেখাইয়া তোমার নিঃস্বার্থপ্রেমের পরিচয় দিতেছ। অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন আমেরিকেরা সুদুস্তরসাগরপারে কোন প্রকারে পড়িয়া আছে ; তুমি সভ্যতা বিস্তারের জন্য তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অসভ্যতার অঙ্কুরও যেন পৃথিবীতে না থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে স্ববংশ উচ্ছিন্ন করিতেছ, এবং তাহাদিগের বাস্তু ভূমিতে তোমার নিজ বাসগৃহের স্তম্ভ তুলিতেছ : সভ্যতার মধ্যে জ্ঞান, ধর্ম্ম, বাণিজ্য সকলই পরিগণিত হয়। সুতরাং ইহার জন্য তুমি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই ন্যায়ানুমোদিত। হে মনুষ্য ! যদি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কেহ তোমাকে স্বার্থপর বলে, সে ইহ পরত্র কোথাও সুখী হইবে না।
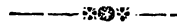
প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শরৎ সরোজিনী নাটক ; ৺ দুর্গাদাস দাস প্রণীত। শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

নাটকাদি গ্রন্থের ভাগ্যপরীক্ষা বড়ই অদ্ভুত। কতকগুলি নাটক প্রকাশমাত্রই পাঠকসমাজে নিতান্ত প্রমত্ত তৃষ্ণার সহিত পঠিত ও সর্ব্বত্র অভিনীত হইয়া কিছু দিন পরে হতাদর হইয়া পড়ে ; কতকগুলি দুচারি বৎসর কি দুচারি যুগ উপেক্ষিত থাকিয়াও পরিণামে কাব্যজগতে অতি উচ্চ আসন লাভ করে। আডিসনের কেটো যখন প্রথম বাহির হয়, তখন লণ্ডনে কিছু দিন কাহারও মুখে কেটো ব্যতীত আর কথা ছিল না। কএক মাস পর্য্যন্ত রাজধানীতে এবং প্রধান প্রধান নগরে ও উপনগরে প্রায় প্রতি রাত্রিতেই কেটোর অভিনয় হইত ; এবং পাছে অপরাহ্ণে স্থানলাভ না ঘটে, এজন্য সকলে দিবা দুপ্রহরের পূর্ব্বেই রঙ্গ ভূমিতে ঝুকিয়া পড়িত। যাহারা কবির স্বপক্ষ তাহারা ও প্রশংসা করিত, যাহারা বিপক্ষ তাহারাও করতালি দিত। কিন্তু এক্ষণ সহৃদয়সম্প্র

দায়ে কেহই আর কেটোর তাদৃশ আদর করেন না; অথচ যে সকল নাটক একসময়ে গ্রন্থব্যবসায়ীদিগের বিপণিতে বিপণিতে ধূলিধূসরিত ও কীটাকুলিত হইয়া পড়িয়া থাকিত, তাহাই লইয়া সকলে নিজ নিজ স্বাদগ্রাহিতা ও কাব্যানুরাগের পরিচয় দেন। আদরের স্রোতে এই রূপ জোয়ার ভাটার কারণ কি? আমাদিগের বিবেচনায় ইহার একটি মাত্র উত্তর সম্ভবে। সেই উত্তর এই,—যে সকল নাটকে স্থান বিশেষে ও সময়বিশেষের চিত্র অঙ্কিত থাকে অথবা সম্প্রদায়বিশেষের উত্থান কি পতনের সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা বর্ণিত হয়, সেইগুলিই প্রথমচ্ছটায় নিতান্ত আদরণীয় হয়; আর যে সকল নাটকে তাহা না থাকিয়া, বিশ্বজনীন মানবপ্রকৃতি আলিখিত হয়,তাহা আশু হৃদয়গ্রাহী না হইলেও, নিজ গুণ গরিমায় ক্রমে ক্রমে লোকের মনকে আকর্ষণ করে।

শরৎসরোজিনীকে আমরা ইহার কোনশ্রেণীস্থ বলিব, বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে যেমন সময়ের চিত্র আছে, তেমন যে সকল ভাবের কালে বিলয় নাই, সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তে পরিবর্ত্তন নাই, রুচির স্বাস্থ্য ও বিকারের সহিত সম্বন্ধ নাই, মধ্যে মধ্যে তাহারও দুই একটি অতি সুন্দর প্রতিমা মেঘাবৃতজ্যোৎস্নার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কিন্তু ইহার অধিক ভাগই সময়ের চিত্র। এই জন্যই ইহার এইক্ষণ এত প্রশংসা, এবং এই জন্যই ইহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু কিছু ভয়।

ইহার রচয়িতা বাস্তব জীবিত কি মৃত, তাহা আমরা বুঝিলাম না। কিন্তু তিনি জীবিত আর মৃত যাহাই হউন, তাঁহাকে আমরা নিপুণ কারুকর বলি। বাঙ্গালির মধ্যে অনেকলোকে লেখনী লইয়া এইরূপ চিক্কণ কারুকার্য্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। শরৎসরোজিনীকে নিন্দাই কর, আর প্রশংসা কর, ইহাকে পড়িতে হইবে। ইহার আদি হইতে অন্ত সমস্তই কৌতূহলোদ্দীপক। আরম্ভ করিয়াছ, কি ঠেকিয়াছ। কোন মতেই নিঃশেষ না করিয়া পারিবে না।

আনুপূর্ব্বিক সমতার সহিত চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা নাটক ও উপন্যাসের এক প্রধান গুণ। ইহাতে সেই গুণ বহুলপরিমাণে লক্ষিত হইল। ঐ সরোজিনী, এই সুকুমারী। দুটিই অতি কমনীয় প্রকৃতি। কবি দুটিকেই সমান আদরে, সমান আভরণে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তথাপি, স্থিরচক্ষে চাহিয়া দেখ, এটির সহিত ওটি কখনও কোন অংশে মিশিয়া যায় না। সরোজিনী ফুল্ল কমলিনী; সুকুমারী

লাবণ্যলজ্জিত প্রভাতশিশিরসিক্ত গোলাপ। সরোজিনী মুকুরপ্রতিভাতসূর্য্য রশ্মির ন্যায় ঝল মল করে। সুকুমারীর ক্ষীণ আলোক নীলোৎপলপ্রতিফলিত চন্দ্রিকার ন্যায় অতি মৃদু মৃদু বিলসিত হয়। বুলওয়ার লিটনের রায়েনজিতে নায়নার পার্শ্বে আইরিণকে দেখিয়া যেমন প্রীতি বোধ হয়, সরোজিনীর পার্শ্বেও সুকুমারীকে দেখিয়া আমরা সেইরূপ সুখী হইয়াছি।

তবে, স্ত্রী চরিত্র চিত্র করিতে গ্রন্থকার যেরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, পুরুষ চরিত্রে সেরূপ পারেন নাই। আদৌ, গ্রন্থের নায়ক শরৎকুমারের ছবিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। শরৎ বাবুর বীরদর্প, প্রায় সকল স্থলেই, গ্রন্থকারের নিজ বীরদর্পের ন্যায় চিন্তাপ্রসূত ও অভ্যাস্তের মত অনুমিত হয়। তার পর, বিনয়ের চরিত্রও নিতান্ত হাতগড়া। এদেশীয় প্রাচীনদিগের মধ্যে, এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বিধাতা রাজা দেখিয়া রাণী গড়ান, পুরুষ দেখিয়া স্ত্রী নির্ম্মাণ করেন। আমাদের কবি, সুকুমারীকে দেখিয়া বিনয়কে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উভয়ের সম্মিলন আকস্মিক না হইয়া কবির ইচ্ছাকৃত বলিয়াই দৃঢ়প্রতীতি জন্মে। পুরুষের মধ্যে মতিলালের ছবিটি ঠিক হইয়াছে। এইরূপ পুরুষ সংসারে নিতান্ত বিরল নহে। শিক্ষা ও সতেজ বুদ্ধির সহিত নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নিতান্ত পাশব স্বভাবের মিশ্রণ হইলেই এইরূপ ফল ফলে। ফ্রান্সের মেরাট ও মোরাবো প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ;—নিরাশ, নির্ম্মম, বিষাদপূর্ণ ভয়ঙ্কর! কিন্তু অন্তিম কালে মতিলালের এক মুহূর্ত্তেই যেরূপ প্রকৃতি পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক কি না বলিতে পারি না।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে অন্যান্য প্রকারের যে সকল সামান্য দোষ আছে, আমরা তাহা গণনায় আনিলাম না। যে গ্রন্থের গুণরাশি উপরে ভাসে, আর দোষ গুলি খুজিয়া বাহির করিতে হয়, সে গ্রন্থকে আমরা কখনই নিন্দা করিতে পারি না। উপসংহারে কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, শরৎসরোজিনীর সংগীতগুলি নিতান্তই নীরস হইয়াছে ; আর রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, কর্ম্মনীতি সকল কথাই এক খানি পুস্তকে পুরিয়া দেওয়া সুরুচির পরিচায়ক হয় নাই। ইহাতে গ্রন্থকারকে একটুকু অসহিষ্ণু বোধ হয়। তথাপি বলি, বঙ্গভাষায় প্রতি বৎসর এইরূপ দু একখানি নাটক প্রকটিত হইলে আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব।

•০ঃ(০ঃঃ০)ঃ০•

বাঙ্গালির অভিমান ও অকীর্ত্তি।

বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে যার লজ্জা হয় হউক, আমাদের লজ্জা হয় না। আমরা ঐ নামে পরিচিত হইতেই সম্মান জ্ঞান করি এবং যে কোন বিষয়ে বঙ্গদেশের গন্ধ সম্পর্ক আছে, তাহাই প্রাণের সমান ভাল বাসি। পিতা কি পিতামহের নাম যেমন প্রিয়, বাঙ্গালি এই নামটিও আমাদিগের নিকট ঠিক্ তেমন অথবা ততোধিক প্রিয়। আজ বঙ্গভূমিকে পরপদানত দেখিয়া, যাঁহারা বাঙ্গালি বলিয়া অভিহিত হইতে লজ্জা অনুভব করেন, এক দিন হয়ত তাঁহারা, জীর্ণাম্বরাদি দারিদ্র্য চিহ্ন দেখিয়া, পিতাকেও পিতা বলিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। আমরা এইরূপ সুকোমলস্বভাব, সলজ্জ পুরুষদিগের তেমন একটা প্রশংসা করি না। আমাদিগের গণনা এই যে, আমরা বিশ্বজনীনমানবজাতির সম্বন্ধে পৃথ্বীবাসী, তাহা হইতে নিকটতর সম্বন্ধে ভারতবাসী এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম সম্বন্ধে বঙ্গবাসী। ইহাতে যদি দোষ থাকে, তবে সে দোষ স্বীকার করি। কিন্তু বঙ্গভূমিতে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরক্ত বলিয়া আমরা বাঙ্গালির অন্ধ স্তাবক নহি। বাঙ্গালির গুণটুকু আমাদের অন্তরে যত না জাগে, দোষরাশি তাহা অপেক্ষাও অধিক জাগে।

ভারতবর্ষে এইক্ষণ যে কয়টি জাতি বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গালি, আর কোন গুণে না হউক, চক্ষুষ্মান্ বলিয়া বিদেশীয়দিগের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়াছে হিন্দুস্থানবাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতির শরীরে সামর্থ্য থাকিলেও মস্তিষ্কে আর পদার্থ নাই। তাহারা হস্তীর মত অঙ্কুশচালনায় চালিত হয়, আপনার অঙ্গ আপনারা দেখিতে পায় না। দাক্ষিণাত্যবাসীরা তমসাচ্ছন্ন। তাহারাও কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনা, এবং আর কেহও তাহাদিগের কোন সংবাদ লয় না। মহারাষ্ট্রীয় বংশের একটি চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, আর একটিও রুগ্ন। এই সমস্ত কারণবশতঃ, বাঙ্গালি একটু দেখে শুনে বলিয়া তাহার প্রসিদ্ধি। কিন্তু প্রসিদ্ধি ভাল নহে। প্রসিদ্ধি অনেক আপদের মূল। বাঙ্গালিও প্রসিদ্ধ হইয়াই বিপন্ন। দেশে বিদেশে এইক্ষণ বাঙ্গালির যে সকল অকীর্ত্তি, প্রসংবাদপত্রে ও লোকের মুখে মুখে বিঘোষিত হইতেছে, এই প্রসিদ্ধিই, আমাদিগের বিবেচনায়, তাহার

এক প্রধান হেতু। অথচ দেখা যাইতেছে যে, অকীর্ত্তির শত শত ঢক্কানাদেও বাঙ্গালির অভিমান কিছুতেই খর্ব্ব হইতেছে না। লোকে যতই নিন্দা করিতেছে, বাঙ্গালির অভিমানও ততই বাড়িয়া উঠিতেছে। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইতে না হইতেই বাঙ্গালি যুবা অভিমানভরে মৃত্তিকায় পাদক্ষেপ করিতে চায় না; এবং কথার ছটায় ব্রহ্মাণ্ড উড়াইয়া দেয়। আর, যাঁহারা বার্দ্ধক্যহেতু গতিশক্তিবিহীন হইয়াছেন, তাঁহারাও শয্যার এক পার্শ্বে কোন প্রকারে পড়িয়া থাকিয়া, চক্ষু আধ আধ নিমীলিত রাখিয়া, ঐ শয়ান অবস্থাতেই দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ইংলণ্ড ও আমেরিকা সমস্ত সংসার তৃণজ্ঞান করেন। আমরা এই নিমিত্ত, এই প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে বাঙ্গালির অভিমান ও অকীর্ত্তি দুইয়েরই সমালোচনা করিতে মনঃস্থ করিয়াছি। কি কি বিষয়ে বাঙ্গালি প্রকৃত প্রস্তাবে অভিমান করিতে পারে, আমরা তাহাও দেখাইব, এবং কি কি কথায় বাঙ্গালির অধোবদন হওয়া উচিত, তাহাও নির্ম্মুক্তকণ্ঠে বলিব। স্বপক্ষ বিপক্ষ কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সত্য কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত। কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহার পরীক্ষা বিবেচক পাঠকবর্গের নিকট।

বাঙ্গালির অভিমানের প্রধান সামগ্রী বুদ্ধি, এবং আমরা বিবেচনা করি এ অভিমান নিতান্ত বৃথা নহে। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের জন্য প্রশংসায় মনুষ্যের মন যত না স্ফীত হয়, কেহ বুদ্ধির জন্য প্রশংসা করিলে, মনে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রফুল্লতা জন্মে। ইহা মানব প্রকৃতির কলঙ্ক হইলেও স্বরূপ কথা। বাঙ্গালি বুদ্ধির জন্য সর্ব্বত্র এবং সকল সময়েই প্রশংসিত। সুতরাং এ বিষয়ে অভিমান করিলে, কে কি বলিয়া নিন্দা করিবে? পৃথিবীর অন্যান্য জাতীয় মনুষ্যের নিকট বাঙ্গালি আর যে কোন বিষয়ে খাট হউক, বোধ হয় বুদ্ধিতে কাহারও নিকট খাট নহে। বাঙ্গালির নিন্দা প্রসঙ্গে বিদেশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন,—অনেকে রসিকতা দেখাইয়াছেন, অনেকে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকে যোগ্যাযোগ্যের উপদেশ শুনাইয়াছেন; কিন্তু কোন দেশের কোন মহাত্মাই, বাঙ্গালিকে নির্ব্বোধ বলিয়া, দয়া করেন নাই। মেকলে প্রভৃতি নিঃস্বার্থস্বভাব, নির্ব্বিকারচেতা, মহাশয় পুরুষদিগের লেখা কাহারও অবিদিত নহে। তাঁহারা কেহ বাঙ্গালিকে ব্যাঘ্র বলিয়াছেন, কেহ জম্বুক বলিয়াছেন, কেহ সর্পের সহিত তাহার

তুলনা দিয়াছেন, এবং কেহ কেহ, হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, শঠ, ধূর্ত্ত, বঞ্চক ইত্যাদি যত প্রকার শ্রবণমনোহর সুললিত উপাধি মনুষ্যের ভাষায় রচিত হইতে পারে, সমস্তই তাহার মস্তকে ঢালিয়া দিয়া, উপকারের প্রতীকার করিয়াছেন। তথাপি ধন্যবাদ দি, এত করিয়াও কেহই তাহাকে মেষ গর্দভাদি শান্তমতি ও শিষ্টপ্রকৃতি প্রাণিবর্গের উপমাস্থান বলিয়া বর্ণন করেন নাই। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব, অনৈসর্গিক উদারতার যদি কিছু কারণ থাকে, সেই কারণ অবশ্যই বাঙ্গালির বুদ্ধিমত্ত্ব। বুদ্ধি এমনই এক বস্তু, উহাকে কেহই সহজে পায়ে ঠেলিতে পারে না। বিদ্বিষ্ট জাতির বুদ্ধি, প্রখর বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, বিদ্বেষের ভাব আরও গাঢ় হইতে পারে, কখনও ঘৃণায় পরিণত হয় না।

'হেকমতে বাঙ্গালি হুনরে চীন' ইহা একটি প্রাচীন প্রবাদ। আধুনিক হিন্দুস্থানিদিগের মধ্যেও এইরূপ কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এসকল কথার অর্থ এই যে, বাঙ্গালি বড় চতুর ও বড়ই বুদ্ধিমান্। বাঙ্গালির বুদ্ধি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সীমান্তবর্ত্তি দেশসমূহেও অনেক প্রকার আশ্চর্য্য কাহিনী কথিত হইয়া থাকে। আমরা এই হেতু পুনরুক্তি করিতেছি, যখন চতুর্দ্দিগের লোক একবাক্য হইয়া বাঙ্গালির বুদ্ধিকে নমস্কার করিতেছে, তখন সে বিষয়ে সংশয় করা বিড়ম্বনা। তবে এস্থলে একটি কথার বিচার করা আবশ্যক। বুদ্ধি অনেক প্রকার। কাহারও বুদ্ধি সুচিরমত সূক্ষ্ম, কেশপ্রমাণ সংকীর্ণ পথেও অক্লেশে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু কঠিন বস্তুর প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারে না। কাহারও বুদ্ধি আপাততঃ স্থূল বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ কুঠারের ন্যায় দৃঢ় ও ভারবিশিষ্ট;—বহুদূরে প্রবেশ করে, বহু আঘাত সহ্য করিতে পারে, এবং বহুকাল সজীব থাকে। পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই ইদানীং ইয়ুরোপীয়দিগের বুদ্ধিকে কুঠারজাতীয় বলেন, এবং বাঙ্গালির বুদ্ধিকে সূচিজাতীয় বলিয়া একটু উপহাস করেন। পূর্ব্বে যে লেখকের নামোল্লেখ হইয়াছে, তিনিও এই শ্রেণীস্থ এবং এবিষয়ে তাঁহার মতানুসারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বাঙ্গালি, ব্যবস্থা শাস্ত্রের কূট কথা লইয়া, কিরূপ বিতর্ক করে, বিষয়বিবাদে কিরূপ নিপুণতা দেখায়, পরের নিন্দায় সময়, কত কি টীকা, টিপ্পনী এবং ভাষ্য ও মহাভাষ্য করিয়া একগুণে দশগুণ পরিশোধ করে, ইহাই তাঁহারা দেখিয়াছেন এবং ইহা দেখি-

য়াই একদেশদর্শীর ন্যায় অন্ধসংস্কারের অধীন হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গের ইতিবৃত্ত ভালরূপে আলোচনা করিলে এই সংস্কার ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। আমাদিগের বিবেচনায় বাঙ্গালির বিষয়বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম, বাঙ্গালির শাস্ত্রীয় বুদ্ধি তেমনই প্রগাঢ়। আমরা ইহার গুটি দুই নিদর্শন দিব।

ইয়ুরোপীয় কএকটি পণ্ডিত, অল্প কএকদিন হইল, শব্দশাস্ত্রের অনেকগুলি গূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। দিনান্তে একবার তাঁহাদিগের প্রশংসা করা না হইলে, নব্যশিক্ষাভিমানীরা অনুতাপবিষে জর্জ্জরিত হন এবং কেহ তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রমাদ কি অসারতা প্রদর্শন করিলে, তাহাকে মহাপাতকী বিবেচনা করেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায়, বঙ্গীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ শব্দশাস্ত্রের মূলানুসন্ধানে যেরূপ সুগভীর দৃষ্টি, সারগর্ভ পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, ইয়ুরোপের বর্ত্তমান উদ্যম তাহার কাছে কিছুই নহে। বঙ্গদেশপ্রচলিত বাদার্থশাস্ত্র শব্দ বিজ্ঞানের এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। যদি শব্দবিজ্ঞানশাস্ত্রের কিছু মাত্র সার্থকতা থাকে, তবে তাহা বাদার্থ শাস্ত্রেই প্রযুজ্য হইতে পারে। ইহাতে বিচারের যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং যে সকল কঠিন কথার মীমাংসা রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, এবং ইহা যাঁহাদিগের বিশাল মস্তিষ্ক বিলোড়নের ফল, তাঁহাদিগকে অতি উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই বাদার্থশাস্ত্রের অধিকাংশ প্রধান গ্রন্থই বাঙ্গালির লেখা।

আধুনিক লেখনী শিক্ষার মাহাত্ম্যগুণে এদেশে স্বাধীনচিন্তা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কেহই এইক্ষণ আর নূতন কিছু নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে না, অথবা ইচ্ছা করিলেও সামর্থ্য পায় না। সকলেই নকলনবিশ এবং প্রায় সকলেই চোর। বিলাতে মোক্ষমূলর কোন একটি শব্দের ব্যাখ্যাচ্ছলে একটি নূতন কথা বলিলেন; সেই কথাটি একজনে অনুবাদ করিল, আর একজনে তাহা দেখিয়া অবিকল তুলিয়া লইল, কি একটু খাদ মিশাইল; তৃতীয় একজনে মুখে মুখে শুনিয়া সভাস্থলে বক্তৃতা করিতে চলিল। ইহাই এক্ষণকার বিদ্যা প্রকাশ। কিন্তু বাঙ্গালি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীনভাবে যে সকল শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে আর এক রূপ বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। সে বিদ্যার সমুচিত সম্মান করা হামিলটন, ও কাণ্ট প্রভৃতি লোক ভিন্ন যে সে ব্যক্তির কর্ম্ম নহে।

ন্যায় দর্শন, যাদার্থ হইতেও কঠিনতর ও সারবিশিষ্ট পদার্থ। কিন্তু, বাঙ্গালির বুদ্ধি ইহার নিকট পরাজিত হওয়া দূরে থাকুক, বাঙ্গালির আশ্রয় পাইয়াই ইহা জীবিত রহিয়াছে এবং ইহার বর্ত্তমান উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম ইহার বীজ মাত্র রোপণ করেন; সেই বীজ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের প্রযত্নে অঙ্কুরিত হয়, তৎপর তাহার শাখ.পল্লব বিস্তার এবং ফল ফুল সমৃদ্ধি যাহা কিছু হইয়াছে, সমস্তই বঙ্গদেশের অক্ষয় ভূষণ, ধীমান রঘুনাথ শিরোমণি এবং তদীয় অনুবর্ত্তীদিগের মনস্বিতা এবং গভীরচিন্তাশীলতার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। বস্তুতঃ ন্যায়দর্শনের অনুশীলনে ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশই বঙ্গদেশের সমকক্ষ হয় নাই। বরং সকলেই বঙ্গকে গুরুস্থান বলিয়া মানিয়াছে। কাশী, দ্রাবিড়, মথুরা, পঞ্জাব মহারাষ্ট্র প্রভৃতি, সকল স্থানের বিদ্যার্থীরা বঙ্গে আসিয়া উপদেশ লইয়াছে। এসকল কথা স্মরণ করিলে, বাঙ্গালি কি শাস্ত্রানুসারে অভিমান করিতে পারে না? যদি আরিষ্টোটল প্রভৃতির নাম লইয়া ইয়ুরোপের শিক্ষাগুরু গ্রীক জাতির অভিমান করা অসংগত না হয়, যদি হিয়ুম প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি মাহাত্ম্য, বৃটন জাতির অভিমানের বিষয় হইতে পারে, তবে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতরত্নমালাও বঙ্গভূমির কণ্ঠে অভিমানের কণ্ঠমালার ন্যায় চিরকাল দোলায়িত থাকিতে পারে।

অভিমান করিবার কথা হইলে, সর্ব্বতোমুখী সহৃদয়তাও বাঙ্গালির আর এক সামগ্রী। যাঁহারা, স্বজাতীয় তরলমতি মূর্খ সমাজের ক্ষণিক প্রমোদ সাধনের জন্য শপথ করিয়া, অন্যজাতির নিন্দা করিতে উপবিষ্ট হন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা দেবতা। তাঁহাদিগের সকলই শোভা পায়। একান্ত অন্ধ ও অনভিজ্ঞ হইলেও তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ। একটি মনোহরবাক্য বিন্যাসের অনুরোধেও তাঁহারা অম্লানবদনে সাধারণ সমক্ষে অসাধারণ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। কপোলকল্পিত, অমূলক কথাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতে তাঁহাদিগের কখনও লজ্জা হয় না, এবং কখনও লজ্জা হইবে এরূপ কারণ দেখিনা। বাঙ্গালির হৃদয় সম্বন্ধে এই শ্রেণীর সাধুপুরুষগণ যে সকল সুধাসিক্ত, মধুর কথা কহিয়া গিয়াছেন, অথবা আজও কহিতেছেন, আমরা তাহা গণনায় আনিলাম না। কিন্তু যাঁহারা অভিনিবিষ্ট মনে বাঙ্গালির হৃদয় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, জগতে যদি কোন জাতিকে হৃদয়বান্ বলিয়া আদর করা যায়, সেই জাতি বাঙ্গালি।

বঙ্গভূমি হৃদয়েরই বিলাস ক্ষেত্র। এখানে, যে দিগে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিগেই হৃদয়ের পূজা দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হই। চক্ষু, ফিরাইলেও, কোন ক্রমেই ফিরিতে চায় না। জনক জননীর প্রতি ভক্তি, ভ্রাতার প্রতি স্নেহ অপত্যবাৎসল্য, দাম্পত্য প্রেম, বন্ধুত্ব, প্রতিবেশীর প্রতি অনুরাগ, অতিথির অভ্যর্থনা, দরিদ্রে দয়া ইত্যাদি হৃদয়ের ভাবনিচয় এখানে বহুকাল হইতে মার্জ্জিত হইয়া হইয়া এইক্ষণ এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে, দেখিলে যোগীর মন মুগ্ধ হয় এবং মুহূর্ত্তের জন্য সংসারে আসক্তি জন্মে। পৃথিবীর অনেক সুসভ্য দেশেই পিতাকে নিকট সম্পর্কিত আত্মীয় বলিয়া গণনা করে, বিবাহের পর দিন হইতেই মাতাকে কুটুম্বিনী সংখ্যায় ফেলিয়া দেয়, অভ্যাগত স্বজনবর্গকে আদর সহকারে স্বগৃহে গ্রহণ করা প্রায় কেহই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া মানে না, কিন্তু বঙ্গদেশে, পিতা মাতার সেবা, ভ্রাতা ভগিনীর সুখ এবং আত্মীয় স্বজনের সম্মানের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলেও সকলে তাহা শ্লাঘা মনে করে। বঙ্গের যে গৃহে অতিথি বিমুখ হয়, সে গৃহ পিশাচ গৃহ; যে গৃহের দ্বার দেশ হইতে ভিখারী দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া যায়, দেবতারা সে গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং যে গৃহে স্বজনবর্গ উৎসবে ও ব্যসনে স্থান লাভ করে না, সে গৃহ সদাচার বর্জ্জিত বলিয়া সমাজস্থ সকলেরই পরিত্যাজ্য। সর্ব্বশস্যশালিনী, স্বর্ণখনি বঙ্গভূমি আজ দরিদ্র ও অন্নের জন্য লালায়িত। এই দারিদ্র্য দুঃখ কেন? ইহার এক কারণ পরের শোষণ আর এক কারণ হৃদয়ের সেবা ও সম্মাননা। হৃদয়ের এত আনুগত্য স্বীকার না করিলে, পরকীয় প্রপীড়ন সত্ত্বেও বাঙ্গালি এইক্ষণ সম্পদের সুকোমল শয্যায় বিরাজ করিতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গালি হৃদয় শূন্য সম্পদকে বিপদ জ্ঞান করে। অধিক আর কি বলিব, হৃদয়ের সুখে বঞ্চিত হইলে, প্রভুত্ব, প্রতাপ এবং স্বাধীনতার অনন্ত স্বর্গ ও তাহার নিকট বিষবৎ অসহ্য হইয়া উঠে।

বাঙ্গালির হৃদয় মার্জ্জিত, মাধুর্য্য বিশিষ্ট এবং উচ্চ শ্রেণীর কিনা, তাহার আর একটি প্রমাণ দেখ। সত্যের পরীক্ষা বুদ্ধি, সাধুতার পরীক্ষা বিবেক এবং কাব্য কিংবা রসের পরীক্ষা হৃদয়। বাঙ্গালির হৃদয় কাব্যের চিরকুসুমবিকসিত নিকুঞ্জস্বরূপ এবং সৌন্দর্য্য ও সংগীতাদি রসের অক্ষয় ভাণ্ডার। অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা স্বদেশীয় কাব্যের রসাস্বাদে অধিকারী হইলেও

অনেকেই ভিন্নদেশীয় কবির কল্পনা কাননে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাঁহারা সেক্সপীর কি বায়রণের সঙ্গে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন অথবা করতালি দিয়া নৃত্য করেন, তাঁহারা কালিদাসের কথা বুঝেন না; এবং যাঁহারা গেটে কি দান্তের ভাবতরঙ্গে দোলায়িত হন, তাঁহারা হাফেজের পবিত্রপ্রেমপূর্ণ সংগীত সুধায় মোহিত হন না। বাঙ্গালির হৃদয় পৃথিবীর সকল স্থানের কবিকেই পূজা করিতে পারে। বাঙ্গালি, হোমরের সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়া, বীররসে গর্জ্জন করে, এবং বাল্মীকির বীণায় মুগ্ধ হইয়া একবার হুঙ্কার দেয় আবার জনক নন্দিনীর করুণ কাহিনীতে দ্রবীভূত হয়। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিগের কাব্যই বঙ্গে আসিয়া স্বগৃহোচিত পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে কেহই অপরিচিত এবং অনাদৃত নহে, এবং এদেশে জাতিভেদের শাসন যদিও এত দৃঢ়, তথাপি সাদি ও হাফেজ প্রভৃতিকে কেহই যবন বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই এবং বিদ্যাপতি ও ভারতের গুণে ভুলিয়া গিয়া কেহই বায়রণ প্রভৃতিকে গৃহের বাহিরে রাখে নাই। বস্তুতঃ কাব্য বিষয়ে এই বিশ্বজনীনতা অসামান্য প্রশংসার কথা। যে জাতি, কাব্যের অমৃত রসে এত প্রমত্ত তাহাকে কখনই নীচহৃদয় মনে করিও না। কারণ কাব্যের নাম প্রেম, কাব্যের নাম ধর্ম্ম, কাব্যের নাম সাহস, শৌর্য্য, মহত্ত্ব ও দয়া। যেখানে কাব্য আছে, সেখানে এই সমস্ত পদার্থই বর্ত্তমান আছে। যদি কখনও কোন একটি না দেখিতে পাও জানিও উহা নিদ্রিত রহিয়াছে, কিন্তু মরিয়া যায় নাই।

বাঙ্গালির সহৃদয়তার তৃতীয় প্রমাণ বঙ্গভাষা। জাতীয় বুদ্ধি প্রখর হইলে, ভাষাকে পরিমার্জ্জিত করে, ভাষার অবয়ব গুলিকে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে এবং চিন্তাপ্রসূত ভাবনিচয়ের প্রকাশের জন্য পথ খুলিয়া দেয়। কিন্তু হৃদয়ের দুর্দ্দমস্রোত যাবৎ না ভাষারূপ প্রণালীতে প্রবাহিত হয় তাবৎ উহা কখনই ফুলিয়া উঠে না। বুদ্ধির ভাষা পাষাণময়ী ভূমিতে স্রোতস্বিনীর ন্যায়; সংকীর্ণ অথচ সুধীর; উহার তলভূমি পর্য্যন্ত দেখিতে পারে। হৃদয়ের ভাষা আলোড়িত আবিল এবং নিয়ত কলকলায়মান। উহার তরঙ্গলীলায় কখনও বিরাম নাই। বঙ্গভাষা বুদ্ধির প্রয়োজন সাধনে অপটু হইলেও হৃদয়ের ভাষা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। হৃদয়ের সকল কথাই উহাতে অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইতে পারে। বিলাসের আলস্য, বৈরাগ্যের উদাসীনতা, শান্তির নির্ব্বিকার আনন্দ, শোকের করুণ কণ্ঠ, প্রেমের বিহ্বলতা, স্নেহের

মৃদুমধুর সম্ভাষণ, আরাধনার গাম্ভীর্য্য এবং প্রার্থনার পবিত্রতা হইতে যেরূপ পরিস্ফুট হয়, পৃথিবীর অনেক পুরাতন ভাষাতেও তেমন হয় না। সাধনার নির্ভরের ভাব, মিলন, বিরহ, বাৎসল্য বঙ্গীয় সংগীতে কত সুধাই না ঢালিয়া রাখিয়াছে! রামপ্রসাদ ও চৈতন্য প্রভৃতি ভগবদ্ভক্ত যোগী এবং চণ্ডীদাস ও নিধু বাবু প্রভৃতি প্রেমের কবি অন্য কোন দেশে অবতীর্ণ হইলে এইরূপ হৃদয় খুলিয়া কাঁদিতে পারিতেন কিনা সন্দেহের বিষয়। বঙ্গভাষার উদ্দীপনী শক্তি ও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নহে। উহা সময়ে সময়ে কল্পনার রাজ্যকেও অতিক্রম করে, এবং বাঙ্গালির হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে কি ভয়ানক বহ্নি নিহিত রহিয়াছে, তাহার পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ বঙ্গভাষার ঢল ঢল সৌন্দর্য্য, লালিত্য এবং ওজস্বলতা মনে করিলে বাঙ্গালি নামে কোন কলঙ্ক আছে এমন কথা স্মরণ থাকে না। বঙ্গদেশের বিজয়তারকা বহুকাল হইল অস্তমিত হইয়াছে; স্বাধীনতার সম্মান করিতে বাঙ্গালি, বহুকাল হইতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং মানের জন্য প্রাণকে ও যে উপেক্ষা করিতে হয়, এই কথা কালের প্রবলস্রোত বাঙ্গালির স্মৃতিপট হইতে ধুইয়া ফেলিয়াছে। যদি ইহা না হইয়া বর্দ্ধমান, রঙ্গভূমি বর্ত্তমান ইংলণ্ডের অবস্থায় থাকিত, বঙ্গভাষা তাহা হইলে কি আশ্চর্য্য পদার্থ হইয়া উঠিত বলিতে পারিনা।

আমরা বাঙ্গালির অভিমানের কথা আর বলিব না। যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ঠ। বিড়ম্বনার পর বিরম্বনায়, এবং লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনায় এই দুর্ভাগ্য জাতির সকল অভিমানই নিশার স্বপ্নের মত অলীক হইয়াছে। অগ্নির লক লক জিহ্বা অদৃশ্য হইয়াগেলে অঙ্গার বই আর কিছুই যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, বাঙ্গালির বর্ত্তমান জীবনেও অকীর্ত্তির কতকগুলি লক্ষণ বিনা এইক্ষণ আর কিছুই কেহ দেখিতে পারে না। কিন্তু আমরা বহুচিন্তা করিয়া দেখিলাম, আজ-কালকার বাঙ্গালির যতকিছু অকীর্ত্তি সমস্তই অভাবমূলক। শারীরিক সামার্থ্য, সামাজিক একতা এবং স্বজাতিবাৎসল্য এই তিনটি বস্তুর অভাবেই সোনার বাঙ্গালা শ্মশান, এবং এই অত্যুৎকৃষ্ট জাতি কর্দ্দমের কর্দ্দম অথবা নরকের কীট। আর যাহা কিছু বল সমস্তই মিথ্যা, এই তিনটি অভাবই বাঙ্গালির সকল কলঙ্কের সার। এই অভাবত্রয় প্রদর্শনের জন্য যদি কেহ আমাদিগের উপর নিদারুণ কশাঘাত করে, আমরা তাহাও বক্ষঃস্থল প্রসারণ করিয়া সহিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কেননা ইহা সত্য কথা এবং সত্য

আমাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল করিবে না।

শারীরিক সামর্থ্যকে এদেশের অনেকে বস্তুমধ্যে ই গণনা করেন না। কলঙ্কের কাহিনী কোথায় গিয়া কাহার নিকট কহিব, এবং কহিলেই বা মনের মর্ম্ম দুঃখ কে বুঝিবে, এদেশের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীস্থ ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এমন লোকও বিস্তর আছেন যে, তাঁহাদিগকে কেহ দুর্ব্বল ও নির্ব্বীর্য্য বলিলে তাঁহারা, লজ্জিত না হইয়া, শ্লাঘান্বিত হন, এবং নিন্দার পরাকাষ্ঠাকে স্তুতির একশেষ মনে করিয়া আহ্লাদে গদ গদ হইয়া পড়েন। যেমন অদৃষ্ট, তেমন ফল! বাবুর আহার নাই, বাবু কোন কর্ম্মই নিজের হাতে করিতে পারেন না, বাবুর নবনীতনিন্দি কোমল অঙ্গে ছাতাটি কি লাটিখানেরও ভর সয় না, পাঁচটি ভৃত্য ধরাধরি না করিলে বাবুর স্নানাদি কর্ম্মও সম্পন্ন হয় না, এবং এখান হইতে ওখানে উঠিয়া বসিতে হইলেও একজন সঙ্গী বাবুর পৃষ্ঠবল না হইলে হইয়া উঠে না। শারীরিক সামর্থ্যের অভাব যারপরনাই দুঃখজনক হইলেও নিতান্ত নিন্দাজনক না হইতে পারে; কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যের অভাবে যদি আনন্দ ও আত্মশ্লাঘা হয়, তবে তাহা হইতে লজ্জাকর ও ঘৃণাকর কথা, তাহা হইতে গভীরতর কলঙ্ক কল্পনা করাও মনুষ্যের অসাধ্য।

আরও দেখ। পূর্ব্বে এদেশে পুরুষের রূপের প্রশংসা করিতে হইলে, লোকে পুরুষোচিত রূপেরই প্রশংসা করিত। শারীরিক সামর্থ্যের অভাববশতঃ এইক্ষণ রুচি এত পরিবর্ত্তিত ও এত অধোগত হইয়াছে যে, যখন কেহ বরের রূপের প্রশংসা করিতে থাকে, তখন বোধ হয় যে বাছা ছেলে না হইয়া মেয়েটি হইলে বাসরঘরে কত শোভাই না বিকাশ করিত। রূপের কথা যদি অসহ্য হয়, বঙ্গীয় নবীন যুবক বৃন্দের নাম গুলি আরও অসহ্য। নামের শেষ অংশ পরিহার করিলে, এদেশের অধিকাংশ পুরুষের নামই স্ত্রীলোকের নাম। যথা—কামিনী, রমণী, রাই, কিশোরী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, যামিনী, ভামিনী, নলিনী, ইত্যাদি। ইহার পরও কি ধিক্কার আবার আছে? মাতঃ বঙ্গভূমি! তুমি কেন এত কুসন্তানের ভার বহন কর, বুঝিতে পারি না! তোমার মলিন মুখ পানে কেহই কি ফিরিয়া চাহিবে না?

বহুদর্শী কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" এই শ্লোকার্দ্ধ বঙ্গের গৃহে গৃহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। বঙ্গে এইক্ষণ আর কোন প্রকার উন্নতির তেমন আবশ্যকতা নাই। শারীরিক উন্নতি সংসাধিত হইলেই বাঙ্গালির সকল উন্নতি সংসা-

খিত হইবে। বাঙ্গালির প্রাণে সাহসের অভাব নাই; কোন্ জাতির অন্তরে এত আগুণ তাহা জানি না। কিন্তু সে সাহস ফোটে না; যদি ফোটে তাহাও অধরে। ইন্ধনবিরহে অগ্নি কোথায় প্রজ্বলিত হয়, বল। বাঙ্গালির উদ্যম, উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত অল্প নহে। মনের বেগে বাঙ্গালি উন্নতির উর্দ্ধতম গগণেও উড্ডীন হইতে ইচ্ছা করে; এবং মনের বেগ উচ্চদরের প্রশংসার বিষয়। কারণ, মনে বেগ না জন্মিলে কখনও, বাহিরে কার্য্যকারিতা জন্মে না। কিন্তু, যেমন যন্ত্রের অভাবে যন্ত্রী, তেমন শরীররূপ সাধনের অভাবে এই মানসিক বেগ, সর্ব্বথা অকিঞ্চিৎকর; অথবা অনিষ্টকর। যে শক্তি পরত্র প্রযুক্ত না হয়, তাহা আপনি আপনার অপকার করে।

বাঙ্গালির সামাজিক একতা এবং স্বজাতিবৎসলতা বিষয়ে আমরা এই প্রবন্ধে কিছু লিখিলাম না। এবিষয়ে অবসর ক্রমে পৃথক্‌রূপে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এই স্থলে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে জাতি শারীরিক সামর্থ্যে হীন হয়, সামাজিক একতা তাহাদের সেই অভাব মোচন করে; এবং যাহারা আর কোন বিষয়ে সামাজিকবন্ধনে বদ্ধ হইতে না পারে, স্বজাতিবৎসলতা বন্ধনীরজ্জু হইয়া তাহাদিগের মধ্যে একপ্রাণতা জন্মাইয়া দেয়। বাঙ্গালির ভাগ্যে এটি ও দৃষ্ট হয় না, ওটিও দৃষ্ট হয়না। সুতরাং যত দিন স্বজাতিবাৎসল্য জন্মিবে না, ততদিন বাঙ্গালি কখনও একদেহ ও একপ্রাণ হইবে না; এবং যত দিন এই চিরপ্রার্থিত সামাজিক একতা কল্পনা ছাড়িয়া কার্য্যে পরিণত হইবে না, তত দিন এদেশের কোন কলঙ্কই একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে না। বিষবৃক্ষ বিনাশ করিতে হইলে, মূলেই আঘাত করা আবশ্যক। তরু সতেজ থাকিলে,শাখা পল্লব ছেদনে কোন ফলই ফলে না।

বঙ্গের ইতিবৃত্তঘটিত কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাতশতী ব্রাহ্মণ।

আমাদিগের কোন কোন সহৃদয় ও বিবেচক পাঠক বলেন, সাতশতীরা বৈদিকব্রাহ্মণগণ মধ্যে অধিকাংশ অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছেন কিনা তাহা সন্দে

ছল। তাহাদিগের সেই সন্দেহ ভঞ্জন ও অন্যান্য পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ জন্য সাতশতীর সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল। পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ পূর্বকালে ইহাঁরাও রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায় নৃপতিবর্গের নিকট নিজ নিজ বাসস্থলে অন্য আপন আপন আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেকে পৃথক পৃথক গ্রাম পাইয়াছিলেন। প্রমাণ—

সাগাঁই, সুগাঁই, নালসী, জগাঁই (যবগ্রামী) হাটুরী কাটুরী, ধাঁই, কান্দরে, কাটানী, কন্যাপিতুড়ী, বাথাড়ী, পিথাড়ী, সাঁই। উল্লুক, ধরু ধরু মুলুক করকর, বিশেষে শুনহ গাঁই। ইত্যাদি।

বৈদিকদিগের মধ্যে ৪২টি গোত্র প্রচলিত আছে। তদনুসারে ইহাঁরা দ্বিচত্বারিংশৎ পৃথক বংশে বিভক্ত। সাতশতীরাও ৪০টি পৃথক (গ্রামীণ) গাঁই বলিয়া বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেকের গোত্র পৃথক, অর্থাৎ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই পৃথক পৃথক গোত্র সম্ভূত। বৈদিকদিগের বিয়াল্লিশটি গোত্র। যথা—

১ শাণ্ডিল্য
২ কাশ্যপ
৩ ভরদ্বাজ
৪ বাৎস্য
৫ সাবর্ণ
৬ কাণ্ব
৭ কাঞ্চন
৮ আত্রেয়
৯ অত্রি
১০ কৃষ্ণাত্রেয়
১১ কাত্যায়ন
১২ পরাশর
১৩ বশিষ্ট
১৪ সাংকৃতি
১৫ বৈয়াঘ্র
১৬ বৈয়াঘ্রপদ্য
১৭ শক্তি
১৮ শুনক
১৯ বিশ্বামিত্র
২০ অগস্ত্য
২১ কাষায়ন
২২ সৌকালীন
২৩ গৌতম
২৪ গোতম
২৫ আঙ্গিরস
২৬ অনাবৃকাখ্য
২৭ ঘৃতকৌশিক ৫প্রবর
২৮ ঘৃতকৌশিক ৩ ঐ
২৯ মৌদ্গল্য
৩০ সৌপায়ন
৩১ জমদগ্নি
৩২ কৌশিক
৩৩ বৃদ্ধি
৩৪ বিষ্ণু
৩৫ কুশিক
৩৬ কৌণ্ডিন্য
৩৭ গর্গ
৩৮ অব্য
৩৯ জৈমিনি
৪০ আলম্যান
৪১ বাসুকি
৪২ রোহিত।

এই বিয়াল্লিশটির মধ্যে দুইটি ঘৃতকৌশিক এবং জামদগ্ন্য ও জামদগ্নি নামে পৃথগ্বিধ অপর দুইটি গোত্র আছে। সাতসতীগণমধ্যে দুই ঘৃতকৌশিক, জামদগ্ন্য প্রচলিত ছিল না। এক ঘৃতকৌশিক ও জমদগ্নি প্রচলিত থাকে। বৈদিকেরা, যখন বঙ্গে আসিয়া নিবাস গ্রহণ করিলেন এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণের নিকট সম্মানাস্পদ হইতে পারিলেন, সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া, সাতশতীগণ আপনাদিগের গাই ত্যাগ করিয়া বৈদিকদিগের মত নিগাঁই রূপে

আপনাদিগকে বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এইরূপে অধিকাংশ সাতশতী, বৈদিককুলে মিলিত হইয়া গিয়াছেন। নতুবা বৈদিকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টবেদপারগ, তাঁহারা কেন দলে বলে ব্রহ্মপুত্রাদি প্রাচ্য দেশে নিবাস গ্রহণ করিলেন?

লোকের কৌতূহল চরিতার্থজন্য কুলজ্ঞের কুলশাস্ত্র হইতে সাতশতীদিগের গাঁইগুলি লিখিত হইল; পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন।

১। নাগড়ি ২। দীর্ঘহড়ি ৩। হর্ষামুর্বাপি ৪। কাশ্যপকাঞ্জিকা। ৫। বাপাড়ি ৬। গুসিকা

৭। কেয়ুর্গাইচ ৮। স্বর্ণনাসিকঃ ॥ ৯। পিতাড়ি ১০। বাগুড়িশ্চৈব ১১। ভাদুড়িঃ

১২। ১৩। পিচুকুলকৌ। ১৪। সাড়াকুলী ১৫। কোঁয়াড়িশ্চ ১৬। মূলুকজুড়ীশ্চ ১৭। হাজুড়ীঃ

১৮। কাটানিঃ ১৯। কামদেবাশ্চ ২০। বেড়্গ্রামীচ ২১। মালসী। ২২। সাগাঁই ২৩। পুংসিকো

২৪। ভট্টশালী ২৫। করকরহজ্রিকা ॥ ২৬। ২৭। আদিত্যোজ্জুলগাঁইতু ২৮। সরাহ

২৯। দীঘলস্তথা। ৩০। ঘবগ্রামী ৩১। কড়ারিচ ৩২। কোণ্ডিল্যো ৩৩। বৈজুড়ী তথা ॥

৩৪। কুড্যালো ৩৫। হেলনী ৩৬। ধায়ী ৩৭। বাতাড়ী ৩৮। বেলাড়ীপিচ। ৩৯। ৪০। করঞ্জাস্তাড়ি

রিত্যেব চত্বারিংশৎস্মৃতা দ্বিজাঃ। তৈরূঢ়া নৃপতের্বাক্যাৎ— সপ্ত সপ্ত শতাস্মজাঃ। ততৈশ্চব বশতা জাতা স্তাস্বু সপ্ত সুতা বরাঃ। বরন্দরং গতাঃ পঞ্চ কলিষ্ঠৌ রাঢ়সংস্থিতৌ।

কেহ কেহ বলেন, কোমটী বা কল্যাণী এবং করলা নামে আরও দুইটি গাঁই ছিল। এই দুইটি গাঁই ধরিলে ৪২টি গাঁই হয়। তাহা হইলে বৈদিকদিগের গোত্রের সংখ্যার সঙ্গে ইহাদিগের গাঁই সংখ্যার বিশেষ ঐক্য হয়।

এখন দেখ কে কোথায় মিশ্রিত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা অতদ্ভাবে আছেন। বচনানুসারে দেখা-যায়, উত্তর কালে ঐ চত্বারিংশৎ বুলের মধ্যে যত সন্তান জন্মিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে যাহারা, সর্ব্ব বিষয়ে সদ্‌গুণ সম্পন্ন বলিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে ইহারা আপনাদিগের দলে উঠাইয়া লয়েন। প্রথমাবস্থায় সাতজন মাত্র পরিগৃহীত হন। তন্মধ্যে পাঁচজন বারেন্দ্রবংশের মধ্যে অন্তর্ভাব হন। দুইজন রাঢ়ীদিগের সঙ্গে মিলিত হন। দুই চারিটি কুল ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই প্রায় বৈদিককুলে মিশিয়া গিয়াছেন, যথা। (২৩০ পৃষ্ঠা।)

পূর্ব্বকালে মুলুকজুড়ী, পিপুরী, কাশ্যপ কাঞ্জারী ও সুরাই কন্যা গ্রহণ করিয়া রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীনগণ দোষাশ্রিত হন। তদবধি যে সকল ব্যক্তি বা ঐ সকল গ্রামীণের সন্তানেরা সংস্পৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে তদ্ভাবাপন্ন জ্ঞান করিয়া দূষিত করা হয়। তদনুসারে, রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনগণমধ্যে কয়েকটি থাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এক্ষণেও কাটানী কৌণ্ডিল্য, ঘবগ্রামী শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন এবং রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে মিশিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই শ্রেণীর কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা জ্ঞান করেন।

কোন্ বংশ কোথা আছেন এবং কোন্ গোত্র কে কি কুল করিয়াছেন, তাহা ২৩১ পৃষ্ঠায় দেখ। (শ্রীলাল:)

-•••-

রাঢ়ী শ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বারেন্দ্র শ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বৈদিক শ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	যাঁহারা আপনাদিগকে মনে২ খাঁটী সাতশতী বলিয়া জানেন, অথচ রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ইহার ই একতর বলিয়া পরিচয় দিতে অপ্রসন্ন।
পুংসিক। ২৩ দীঘল গাঁই। ২৯ উভয়েই কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।	ভাদাড়ী ১১ ভট্টশালী ২৪ করঞ্জ ৩৯ আদিত্য ২৬ কামদেবতা ১৬ ভাদাড়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাদুড়ী হইয়াছে। ভাদুড়ী কুলীন বলিয়া খ্যাত। অবশিষ্ট চারি গাঁই শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।	কেঁয়াড়ী ১৫ পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে যে দুই সম্প্রদায়, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম জোঁয়াড়ী অপরেরনাম কোঁয়াড়ী; অধিকাংশ সাত শতী গণের আদি বাসস্থান পূর্ব্ব বাঙ্গালা। কোয়াড়ী সমাজ পূর্ব্বব্রহ্মপুত্রের ধারে।	কাশ্যপ কাঞ্জাড়ী ৩ কাটানী ১৮ পিতাড়ী বা পিথুরী ৯ মুলুকজুড়ী ১৬ সুরাই ২৮ যবগ্রামী ৩০ কৌণ্ডিন্য ৩২

বংশ	আধুনিক বাসস্থান।	গোত্র।	কে কিরূপ ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।
কাটানী গাঁই বা বংশ।	বুড়োল পরগণা	কাশ্যপ	চতুঃসাগরী (অর্থাৎ ফুলে, খড়দা, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী এই চারি মেলে।
কাশ্যপ কাঞ্জাড়ী রায় গোষ্ঠি।	শ্রীরামপুর	এক্ষণে কাশ্যপ	ঐ
যবগ্রামী গোস্বামী	সিগুের কোন	গৌতম	ফুলে মেলে রমণ ঠাকুরেরস স্তান,উনার নিবাস।
কৌলিন্য	শান্তিপুর।	কৌণ্ডিন্য	সর্ব্বানন্দী মেলে।
মালসী	লাড়ু গ্রাম (বর্দ্ধমান জেলা)	বশিষ্ঠ	ফুলিয়া মেলে মুখোপাধ্যায়।
কড়ারী (করাল)	সা নগর (মুরশীদাবাদ)	সাণ্ডিল্য	বেগের গাঙ্গুলির কোন সন্তানে, ও অবসতি গাঙ্গনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কোন সন্তানে ফুলিয়া মেলের মুখোপাধ্যায়ের কোন সন্তানে।
ঐ	বিক্রমপুর (ঢাকা)	ঐ	

রোম সেনানী জর্ম্মেনিকসের মৃত্যুকালীন খেদ।

—

(১)

"কে তুমি আঁধারে ঢাকি আপন শরীর,
হানিলে অনর্ক-দন্ত-বিষ-লিপ্ত বাণ ?
বাহিরিতে চায়, কিন্তু না হয় বাহির
ছট্ ফট্ করে সদা আমার পরাণ।

(২)

"করেছি কি স্বপনেও অপকার, বল,
প্রতিশোধ তরে যার প্রয়াস এমন ?
কারণ অভাবে কোথা বৃথায় কেবল
প্রতিহিংসাপর আশী-বিষের দংশন।

(৩)

"অথবা তোমায় আমি বৃথা দেই দোষ
ক্ষমাকরি; অন্তে যেন ক্ষমেন ঈশ্বর—
রাজার, যাঁহার মাত্র সাধিতে সন্তোষ
অকালে ত্যজিতে হল মম কলেবর।

(৪)

"হা অদৃষ্ট ! পরাক্রান্ত অসভ্য বর্ব্বরে
শাসন অধীন করি এত পরিশ্রম—
যাঁর জন্য, তিনি মোরে পর জ্ঞান ক'রে
পাঠালেন হেথা প্রায় নির্ব্বাসিত সম !

(৫)

"যে দিন অরাতি দেশে মম অনীকিনী
স্থাপিতে, মস্তকে এই, মুকুট রাজার
উদ্যত; ভ্রাতার রাজ্য ভ্রম ভ্রমে গণি
শমিল সকলে প্রিয় বচনে আমার।

(৬)

"পারিতাম হতে আমি রোমের সম্রাট্
একক বিপুল এই বিশ্বঅধিপতি।
এত বড় লোভ ত্যজি, ত্যজি রাজ পাট
যাঁর জন্য এত, হায় তিনি মম প্রতি—

(৭)

"প্রতি কূল আচরণে রত অবিরত
হায় এ মনের দুঃখ কহিব কাহায় !
সুখের পথেতে তাঁর কন্টকের মত
জ্ঞান করি বিনাশিতে যতন আমায় !

(৮)

"ক্ষতি নাই ; আঘাতিয়া সুতীক্ষ্ণ কুঠার
মম বক্ষে, রোমের মঙ্গল যদি হয়,
লভে যদি ইথে সুখ মানস ভ্রাতার
মরণেও মম মনে হবে সুখোদয়।

(৯)

"কিন্তু এক পরিতাপ ! বিশ্বাস ঘাতক
ছলেতে সাধিল বৈর, ভীরুর মতন !
'ভীরুজন এই বীর-জীবন অন্তক'
এদুঃখ অনলে সদা দহে মম মন।

(১০)

"এই বাহু, এই অস্ত্র নিরখি অন্তরে
রোমের বিপক্ষ যাহে ভয়ে অভিভূত
হায়রে ! এখন সেই অস্ত্র একধারে,
বাহু অবসন্ন ; আঁখি কুয়াসা আবৃত !

(১১)

" মারিনু মরিতে আমি বীরের মতন
অসি চর্ম্মে সুসজ্জিত বদ্ধপরিকর।
মরি আসিয়ায়! যুদ্ধ করি প্রাণপণ
দেশ হেতু মারিনু ত্যজিতে কলেবর!

(১২)

" হা অম্ব! হা রোমরাণি! আর কি দেখিব,
তোমার মরম ভরি জীবন থাকিতে?
প্রিয়জনপ্রীতি হায়! আর কি লভিব
একবার জন্মশোধ বিদায় লইতে?

১৩

—" আশা নাই; এক দুঃখ যাহারা সকল,
আমার যশের সেতু তনয় মতন
রোমের গৌরব, বীর্য্য, রোম-বাহুবল,
না দেখিনু তাহাদেক থাকিতে জীবন!

১৪

" কোথা সেই দিন মম সুখের সময়?
করে ক্লাস কোথা আজি জর্ম্মণ উপর?
সেই আমি, সেই হস্ত সেই সমুদয়,
তবে কেন অবসন্ন শরীর অন্তর?

১৫

" সেই আমি, প্রাণসম সন্তান সকল,
স্নেহের পুত্তলি, বেষ্টি চৌদিকে আমায়;
তবে কেন মনঃপ্রাণ হইল বিকল?
শরীর-শোণিত যেন শুকাইয়া যায়!

১৬

"বুঝিলাম শেষ দিন; স্নেহ, ভালবাসা
বীরত্ব,—মানবলীলা, রহিল হেথায়
ফুরাইল অতৃপ্ত এ জীবনের আশা,
জীবপবিত্রতা ভিন্ন সকল বৃথায়!

১৭

" 'ভালবাসা'! মধুময়ী, জীবন-তোষিণী
হৃদয়ের কোমলতা ইহ লোকান্তরে?
কভু নয়; নাশে সর্ব্ব সকলনাশিনী
কাল-লীলা; ভালবাসা আত্মার অন্তরে।

১৮

" বাছাগণ! রাজকুলে জনম লভিয়া,
পথের ভিখারী হলে! হায়রে বিধাতঃ!
কহিতে না পারি আর, হৃদি বিদরিয়া
যায় মোর, ভাবিতেই প্রাণ ওষ্ঠগত!

১৯

" প্রেমময়ি! ধর্ম্মময়ি! হৃদয়ের ধন—
রহিল সন্তানগণ; লইনু বিদায়
প্রতিহিংসা তরে কভু করোনা যতন;
মিলন হইবে অন্তে দোঁহে পুনরায়।

২০

" সামান্য আমার এই জীবন কারণ
দেখিও না ভাসে যেন রোমের শরীর
শোণিতের স্রোতে আতিনাশে অগণন।
এ কি? বীরজায়ানেত্রে কেন বহে নীর?"

২১

এতবলি প্রেয়সীর বদন কমলে
কালের কুহেলাবৃত রাখিলে নয়ন,
থাকিল তনয়হস্ত পিতৃপাদতলে
দেহহ'তে বাহিরিল অমূল্য জীবন।

২২

হৃদয় বিদারি উচ্চ উঠে হাহাকার,
কাঁদে সতী পাঁচজন সন্তান সহিত,
কাঁদিল আসিয়া, আর্দ্রচিত সবা-
কার,
উজ্জ্বল অরুণ কালমেঘে আবরিত!

২৩

যে বাহু রোমের বল রোমের সম্বল,
যে দেহ পবিত্রবীরধর্ম্মের আশ্রয়,
হেন জন দেহ ভস্ম লইয়া কেবল
যখন রোমেতে সতী হইলা উদয়—,

২৪

—অশনিআহত প্রায় রোমবাসিগণ
শোকেতে অস্থির, সবে আকুল হৃদয়
পিতৃহীনে, পতিহীনে হৃদয় বেদন
কেমা জানে? দুঃখ কার না হয় উদয়?

২৫

ধিক্ কুৎসাপরায়ণে, ধিক্ দুষ্টমতি।
সামান্য জনের নীচ আচরণে তায়!
হেন জনে ভগ্নচিত্ত এহেন দুর্গতি,
অবশেষে ধরাহতে করিল বিদায়!!!

মিত্র—

মুখরা ভার্য্যা।

অথবা গৃহিণীরোগ।

(প্রাপ্ত পত্র)

প্রিয় বান্ধব!

আপনার আর কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক, নামটি বড় মধুর। আমি ঐ নামটি শুনিয়াই আপনাকে একজন সহৃদয় লোক বলিয়া ঠাউরাইয়া রাখিয়াছি, এবং মন খুলিয়া মনের একটি নিগূঢ় বেদনা আপনার নিকট আজ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। যদি আপনার হৃদয় সত্য সত্যই আপনার নামের অনুরূপ হয়, তবে দয়া করিয়া উপদেশচ্ছলে আমায় দুটি কথা বলিয়া বাধিত করিবেন। আপনার চক্ষু পরের দুঃখে কখনও আর্দ্র হয় কি?

আবদেরে ছেলে কাহাকে বলে, তাহা জানেন ত? আমি শৈশবে ষোড়শোপচারে বাপ মার আবদেরে ছেলে ছিলাম। যখন একটু বড় হইয়া স্কুলে গেলাম, তখন তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য শিক্ষক মহাশয়েরা সকলেই পঞ্চমুখে আমার প্রশংসা করিতেন। আমি বড় সুবোধ, আমি বড় সুস্থির, আমি বড় আজ্ঞাবহ, ও আমি বড় বিনীত এই বই আর তাঁহাদিগের মুখে কথা ছিল না। শিক্ষকদিগের অনুকরণে প্রতিবেশীরাও পিতা মহাশয়ের নিকট আমার প্রশংসায় নানা কথা কহিতেন।

এই আনন্দে পিতা অধীর হইলেন এবং মাতাও একবারে গলিয়া পড়িলেন, এবং এক বৎসর অতীত হওয়ার পরই আমার লেখা পড়ার কথা ভুলিয়া গিয়া, কিসে শীঘ্র শীঘ্র আমায় বিবাহ করাইবেন, সর্ব্বদা ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদি আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ সাহস করিয়া নিষেধ করিত তাহার প্রতি যারপর নাই বিরক্ত হইতেন, এবং এমন পুত্রকে পুত্রবধূর সহিত একত্র বসে করিয়া উভয়ের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ না করিলে জীবনে আর প্রয়োজন কি, এই বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেন।

পিতা আমার বিবাহের নাম লইতে না লইতেই ঘটক ও কুলাচার্য্যগণ চতুর্দ্দিগ হইতে পঙ্গপালের ন্যায় ঝুঁকিয়া পড়িল। বঙ্গদেশে মেয়ের বাজার আজ কাল কিরূপ সস্তা, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে। এদেশের ইদানীন্তন পুরুষেরা প্রায়ই দৈবদোষে স্ত্রীলোকের মত অলস, অকর্ম্মণ্য ভীরুস্বভাব, বিলাসরত ও বিদ্যাবিমুখ। বোধ হয় ইহা দেখিয়াই বিধাতা বঙ্গে পুরুষের সংখ্যা কমাইয়া ঘরে ঘরে কন্যাসন্তানের সংখ্যা দ্বিগুণ কি চতুর্গুণ করিয়া বাড়াইতেছেন। কেন না, পুরুষের দ্বারা যখন কিছু হইল না, তখন হয় ত স্ত্রীলোকেরাই পুরুষাচারপ্রিয় ও পৌরুষগুণসম্পন্ন হইয়া, একদিন না একদিন দেশের দুঃখভার মোচন করিতে পারে। সে যাহা হউক, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বিবাহযোগ্য বরের সংখ্যা হইতে বিবাহযোগ্যা পাত্রীর সংখ্যা যে অনেক অধিক, তাহাতে আর কিছুই সন্দেহ নাই। আমার বিবাহ উপলক্ষেও ইহাই দেখা গেল। আমি মাত্র একজন; কিন্তু অন্যূন পঁচিশটি পাত্রীর প্রসঙ্গ লইয়া ঘটকেরা আমাদের বাড়ী দিন রাত যাতায়াত করিতে লাগিল।

পিতা স্বভাবতঃই একটু অভিমানী ছিলেন। পুত্রের মহার্ঘতা দর্শনে তাঁহার অভিমান আরও বাড়িয়া উঠিল এবং অভিমানের সঙ্গে কামনারেখও ক্রমে ক্রমে নিতান্ত উচ্চ হইতে চলিল। দশজনের ঘরে সচরাচর যেরূপ মেয়ে দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার মন অগ্রসর হইল না। তাঁহার পুত্রবধূ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা হইবে, স্ত্রীজনসুলভ সুকুমার বিদ্যাচয়ে দীক্ষিতা থাকিবে, এবং বুদ্ধি প্রভৃতি নানা গুণে দেশের সকল মেয়েকে পরাজয় করিবে, তাহা হইলেই মনঃপূত, নচেৎ অগ্রাহ্য। এখন এরূপ সাগরসেঁচা অমূল্য মাণিক্য কয়জনের ঘরে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা না জানেন এমন নহে। ঘটকেরা শুনিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল, এবং বিবাহ ও কাজে কাজেই

কিছু দিনের জন্য কথার রহিল। আমি নিজে কোন দিনও তেমন একটা সুন্দর ছিলাম না। কিন্তু যখন বিবাহের বররূপে, আজ ইহার কাছে, কাল উহার কাছে, শ্রীনাবজুম্ভত লীলাম-র্কটের ন্যায় প্রদর্শিত হইতে লাগিলাম তখন পিতার প্রসাদে এবং প্রিয়ংবদ-প্রতিবেশিগণের মুখের গুণে আমিও ভয়ানক (!) সৌন্দর্য্যশালী হইয়া পড়িলাম। আমার লাবণ্যবর্জ্জিত অসমৃদ্ধ শ্যামবর্ণ সকলকে নবদূর্ব্বাদল শ্যামের কথা স্মরণ করাইল, আমার কোটরস্থিত কুঞ্চিত চক্ষু সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক হইল, শরীরে রোমবাহুল্য সৌভাগ্যচিহ্নের নাম ধারণ করিল এবং সংক্ষেপে আমি একজন দিব্যাঙ্গ-সম্পন্ন গন্ধর্ব্ব পুরুষ হইয়া সকলের নয়ন বিনোদনে প্রবৃত্ত হইলাম।

কথা আছে যে, বিবাহের ফুল না ফুটিলে এবং লক্ষ কথা পূর্ণ না হইলে কখনও কাহারও বিবাহ কার্য্য সিদ্ধ হয় না। গতিকে, কথোপকথনে এবং পাত্রী অন্বেষণে ১০।১২ মাস ঐরূপ দেখা দেখিতেই অতিবাহিত হইয়া গেলে, শেষে সত্য সত্যই একদিন আমার বিবাহের ফুল ফুটিয়া উঠিল। আমাদের গ্রামের অনতিদূরে একজন ধনাঢ্য লোক বাস করিতেন। তাঁহার সবে একটি মাত্র কন্যা ছিল। কন্যা-পক্ষীয়েরা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া আমাকেই সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত সুপাত্রবলিয়া স্থির করিলেন, এবং আমার পিতা মহাশয়ও পাত্রীর উচ্ছলিত রূপ লাবণ্য এবং অশেষ গুণপনা দর্শনে একবারে মোহিত হইলেন। উভয় পক্ষেই আগ্রহ জন্মিল, এবং ঐ আগ্রহহেতু ব্রাহ্মণের অদা শ্রাদ্ধর ন্যায়, অদূরদর্শী অনভিজ্ঞদিগের মিত্রতার ন্যায়, অথবা কৃতসংকল্প বিচারকের বিচার কার্য্যের ন্যায়, মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতেই আমার এবং পিতা মহাশয়ের অত সাধের পুত্র-বধূর 'শুভবিবাহ' সম্পন্ন হইয়া গেল। এস্থলে কেবল এই মাত্র আপনাকে জানাইয়া রাখা আবশ্যক যে, এই 'শুভ বিবাহে' পিতা আমার সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। বড় লোকের সহিত সমানে সমান চলিতে গিয়া, তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমস্তই অল্প সময় মধ্যে দায়ে ঠেকিয়া বিক্রয় করিলেন, এবং আমারও লেখা পড়া ও বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য ঐ পর্য্যন্তই শেষ হইল।

আপনি এইক্ষণ মনে করিতে পারেন যে, কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে এইরূপ পূর্ণ-চন্দ্রের উদয়হইল, ইহার উপর সৌভাগ্য কি?—হউক কেনে দারিদ্র্য দুঃখ, অমন রূপের ডালি সতত সম্মুখে থাকিলে, তাহার পর আবার শুভাদৃষ্ট কি? যদি এইরূপ ভাবিয়া থাকেন,

তবে আমার সৌভাগ্য ও শুভাদৃষ্টের কথা মনোযোগ দিয়া ধীরে ধীরে শ্রবণ করুন। বিবাহের সময়, আমার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর; আর আমার চিত্ত-হারিণী তখন, একাদশীর চন্দ্রলেখার ন্যায়, অনতিপরিস্ফুটরূপা অথচ শোভা-ময়ী। আমার সপ্তমপুরুষের মধ্যেও কেহ কোন দিন কবি হয় নাই; অন্ততঃ কেহই কাব্য লেখে নাই। কিন্তু প্রেয়-সীর সেই প্রণয়োৎফুল্ল পবিত্র সৌন্দর্য্য রাশি আমাকে অচিরেই কবির কনিষ্ঠ করিয়া তুলিল। আমার মনে সংসারে বিরাগ জন্মিল; কার্য্য কর্ম্মে অশ্রদ্ধা হইল, এবং উৎসাহ, উদ্যম যাহা কিছু ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরাইতে লাগিল। আমি আমাছাড়া হইয়া একবারে উন্মত্ত হইলাম, এবং ভক্তের ন্যায় নয়নে নয়ন মিশাইয়া ঐ মুখ নিরখিয়াই পড়িয়া রহিলাম।

জীবনের স্রোত চিরদিন যদি এই ভাবে প্রবাহিত হয় তবে সে এক মন্দ কথা নহে। কিন্তু তাহা হয় না। স্রোতে জোয়ারও আছে, ভাটাও আছে। আমার স্রোতেও যদি ভাটা না লাগিত, তাহা হইলে আমি কখনই লজ্জার মাথা খাইয়া ঘরের কথা লইয়া আপ-নার নিকট উপস্থিত হইতাম না। সুখ কাহাকে বলে, তাহা যদিও জানিতে পাই নাই, তথাপি বলিতে পারি যে, আমি পরিণয়ের পর কএক বৎসর কাল বিশেষ কোন দুঃখে দগ্ধ হই নাই। পিতা সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া আমাদের অন্নবস্ত্র আহরণ করি তেন; আমি ঘরে বসিয়া, মৃদুবায়ুকত-সঞ্চালিত সরোবরজলে মৃণালবদ্ধ কম-লের ন্যায়, একবার ঈষৎ ডুবিয়া, এক বার ঈষৎ ভাসিয়া, কখনও সুখের কান্না কাঁদিয়া, কখনও দুঃখের হাসি হাসিয়া, সেই একভাবে দিনযামিনী যাপন করিতাম। অবশেষে পিতা লোকলীলা সংবরণ করিলেন; মাতা সংসারের ক্লেশ সহিতে না পারিয়া কাশীবাসিনী হইলেন; আমি রাশীকৃত জ্বালযন্ত্রণা এবং আমার সেই রূপের ডালি লইয়া সেই পুরাতন জীর্ণগৃহে পড়িয়া রহিলাম। সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সংসার সহস্রজিহ্বা প্রসারণ করিয়া আমার রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং স্বপ্না-স্থিতের মত আমার নিকট তখন সক-লই আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল।

আগে ভাবিতাম কাব্যই প্রকৃত স্পর্শমণি। উহা অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য সকলই আনিয়া দেয় এবং সকল অভাবই যথা সময়ে মোচন করে। এখন দেখিতে লাগিলাম যে, উহা এক কথার কথা, উন্মত্তের কল্পনা, অথবা আকাশের

ফুল। উহার সহিত পৃথিবীর কোন প্রয়োজনের কোন রূপ সম্বন্ধ নাই এবং কোন অভিষ্টই উহার সাধনায় সিদ্ধ হয় না। আগে জানিতাম, যে প্রেমিক, সেই পূজ্য; সেই দেবতা, সেই মানব জাতির মাথার মুকুট। সকলের উচিত যে, প্রতিদিন ভক্তির সহিত তাহার পদধূলি লয় এবং তাহাকে আদরের শয্যায় শয়ান রাখিয়া তাহার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। এখন বুঝিতে পাইলাম যে, ইহা আর এক বিষম ভ্রম। এ আশা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায়;—মনোহারিণী অথচ চিরবঞ্চনাকারিণী। পৃথিবীর লোকেরা সকলেই প্রয়োজনের দাস। সকলেই আপনার লইয়া আপনি ব্যস্ত। কোন্ প্রেমিক কোথায় বসিয়া পূর্ব্ব রাগ, প্রণয়, পরিণয়, মান ও বিরহ প্রভৃতি কোন্ পালা কি রাগিণীতে গাইতেছেন, কেহই তাহার সংবাদ নেয় না। আগে ইহাও মনে করিতাম যে, পৃথিবীর সার প্রাণিবর্গ; প্রাণি জগতের সার মনুষ্যজাতি; মনুষ্যের সার রমণী; রমণীর সার রূপ। রূপই স্বর্গ, রূপই সম্পদ, রূপই সকল সুখের প্রস্রবণ। যেমন যেখানে চন্দ্র, সেই খানেই জোৎস্না এবং সেই খানেই অমৃত; তেমন যেখানে রূপের হিল্লোল, সেখানেই গুণের গরিমা, সে খানেই হৃদয়ের বিলাসলীলা এবং সে খানেই প্রীতি, প্রফুল্লতা, ও নিত্য আনন্দ। আমার এই বিশ্বাসও একদিনে দুদিনে একটু একটু করিয়া টুটিতে লাগিল। কেন টুটিল, তাহা কি বুঝিতে পারেন নাই?

আমার কুসুমে এত দিনের পর কীট প্রবেশ করিল। আমারও চক্ষু ফুটিল এবং প্রেয়সীর কুসুমকোমল-মোহন অধরেও এত দিনে ক্রমে ক্রমে কঙ্করের ন্যায় কঠোর কথা সকল ফুটিতে প্রবৃত্ত হইল। ধন্য মনুষ্যের প্রকৃতি! ধন্য অবলার প্রেম! যিনি রঙ্গভূমিতে, একবার জানকীর সাজ সাজিয়া, সুধামাখা কথা কহিয়া, সকলকে মোহিত করিয়া যান; তিনিই যদি আবার ক্রুরকরভাষিণী কৈকেয়ী কি দুর্দ্দর্শনা শূর্পণখার সাজে অবতীর্ণ হন, তাহা কেমন দেখায়, জানেন? অবস্থাপরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বল্লভার এই আকস্মিক বেশপরিবর্ত্তও আমার নিকট ঠিক তেমন বোধ হইল। যিনি পূর্ব্বে ফুলটি, ফলটি, লতাটি, পাতাটি পাইয়াই আহ্লাদে ডগ মগ হইতেন, তিনি এইক্ষণ রজতকাঞ্চনাদি পাপ-বস্তু চয়ের জন্য প্রমত্ত হইলেন। যাঁহার অভিমানের ক্রোধ, অভিমাত্রায় উপচিত হইলেও, পূর্ব্বে ত্রিবক্রীর ঝঙ্কারের ন্যায়, প্রাণ মন কাড়িয়া লইত, তাঁহার

কণ্ঠরাবে এইরূপ কাংস করতাল এবং চক্কারবও নীচে পড়িল। লজ্জা সৈকত ভুমিতে ভাটার জলের মত দেখিতে দেখিতেই অপসারিত হইল; সম্ভ্রমের ভাব দূরে পলায়ন করিল এবং পৃথিবীর যত কিছু আপদ সমস্ত আসিয়া, যেন মন্ত্রনা করিয়া, আমার সেই দীননিবাসে প্রবিষ্ট হইল।

মনুষ্যের মনে কেন এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটে তাহার অনুসন্ধান করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি একে পণ্ডিত নহি, তাহাতে আবার ভাবুকতা নাই। ঐ সকল কথার তত্ত্ব নিরূপণের ভার আপনাদের মত লোকের উপর। আমি আমার বর্ত্তমান গার্হস্থ্য জীবনের সামান্য এক খানি ছবি আঁকিয়া তুলিতে পারিলেই আপনাকে আপনি কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আপনি কৌতুকের কথা চান, না করুণরস চান? আমার এই কাহিনীতে দুই ই পাইবেন এবং তাহার উপর বীর রসের ও ছিটা টা, ফোটা টা দর্শন করিবেন।

আমাদের গৃহে এইরূপ এক এক দিন এক এক নাটকের অভিনয় হয়; দুঃখের বিষয় এই, যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা বই প্রায় আর কেহ দর্শক থাকে না। কোন দিন গৃহিণী পাঠশালার গুরু মহাশয়, আমি পলাতক ছাত্র। কোন দিন তিনি জজ গজ গোছের একটি মফঃস্বলী হাকিম, আমি দস্তুরের আসামী। কোন দিন আবার আমি অমাবস্যার নিশিপূজার ছাগ, আর তিনি আলুলায়িতকেশা, বিকটবেশা আরক্তলোচনা চণ্ডী। এই রঙ্গলীলার আমি এক দিনও বেশ বিনিময় করিতে পারিনা। কারণ অপরাধের ভাগ সমস্তই আমার। আমি বামণ হইয়া চাদে হাত দিয়াছি, চণ্ডাল হইয়া ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিয়াছি, কুক্কুর হইয়া যজ্ঞের ঘৃত খাইয়াছি। অতএব কোন শাস্তিই আমার উচিত শাস্তি নহে।

শৈশবে আমার চরিত্র কিরূপ প্রশংসনীয় ছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমার সেই চরিত্রের আদি, অন্ত, মধ্য, সমুদয়ই এইক্ষণ তাঁহার চক্ষে নিন্দনীয়। আমি সভায় গিয়া ভেকরাগিণীতে বক্তৃতা করিতে পারি না; অতএব আমি অধার্ম্মিক। আমি নবীন কি হেমচন্দ্র প্রভৃতির মত নাচনিচ্ছন্দ কবিতা লিখিতে পারি না; অতএব আমি অরসিক। আমি নিরীহ প্রতিবেশীদিগের সহিত অনর্থক গলা বাজাইয়া কোন্দল করিতে পারি না, অথবা কাহারও উৎপীড়নে যাই না; অতএব আমি অসার ভেতো বাঙ্গালি এবং অকর্ম্মণ্য কাপুরুষ। আজ আকাশে মেঘ নাই, সে আমার দোষ। আজ বৃষ্টির জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়া যায় না,

সেও আমার দোষ। আমি মধ্যাহ্ন-রৌদ্রেও একজন অভুক্ত দরিদ্রকে একটি পয়সা তুলিয়া দিলে, তাহা অপরিণামদর্শিতা এবং অপব্যয়। আর তিনি, আজ ঘরে খাবার নাই ইহা জানিয়াও, পায়ে আলতা পরিবার জন্য কিংবা একখানি সামান্য আভরণের অনুরোধে, মূল্যবান্ একটি বস্তু অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলে, তাহা ভদ্রাচার এবং সভ্যতা। যদি আমার আহ্বানে ঘরে ছোট একটি বালকও আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে লোকের জ্বালায় সেখানে টেকা যায়না। এবং যদি তাঁহার অনুরোধে পাড়ার নবীনা ও প্রবীনা সমুদয় অ্যালাতনকারিণীরাও ঐ সংকীর্ণ স্থানে আসিয়া জড় হন, তথাপি পোড়া ঘরে আগুন দিয়া লোকের সহিত আলাপ করিবার সাধ নিবৃত্ত হয় না।

মহাশয়! আর বলিব কি? প্রভাতপূর্ণা সন্ধ্যা সমীর এবং নৈশ গগণ সকলেই আমার যন্ত্রণার সাক্ষী। জ্বলযন্ত্রণা কাহাকে বলে, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতাম না, এইক্ষণ অক্ষর অক্ষরে বুঝিতে পাইতেছি। রেলের গাড়ি যেমন ঘড় ঘড় নাদে অবিরামগতি চলিয়া যায়; আমার সকল উদ্বেগের আকররূপিণী ঐ মধুরাখ্যা জিহ্বাখানিও ঘটিকায় ঘটিকায়, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, ঐরূপ অবিরাম চলিতে থাকে। দিবে, নিশীথে, কখনও এই অত্যাচারের বিশ্রাম নাই। রোগে শোকে, দুঃখ ক্লেশে কোন অবস্থাতেই ইহার নিবৃত্তি নাই।

বর্ষাবিপ্লুত নভোমণ্ডলে ঘনঘটা কখনও থাকে, কখনও থাকে না। আমার রূপাভিমানিনীর মুখগগন এইক্ষণ সকল সময়েই নিবিড় মেঘাম্বরে সমাচ্ছন্ন। এই শ্বাস প্রশ্বাসে কি অঞ্চল তাড়নে ঝড় বহিতেছে; এই অশ্রুবারি ধারায় নিপতিত হইতেছে। এই নয়নপ্রান্তে ক্ষণপ্রভা ক্ষণিক খেলা দেখাইয়া লুক্কায়িত হইতেছে, এই আবার রসনারূপ অমোঘ অশনির ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ আমার হৃদয়কে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছে। আমার অনুপ্রাসচ্ছটা দেখিয়া আপনি বিরক্ত হইবেন না। দুঃখের কথাতেও অনেকের অনুপ্রাস বাহির হইয়া পড়ে। যদি বিশ্বাস না করেন, তবে দাশরথি গোবিন্দ অধিকারী মধুকান এবং ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি কবিদিগের কবিতা কি গীতমালা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। অতএব পরিহাসরসিকতা পরিত্যাগ করিয়া, আমি এই নিরুপায় অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিলে, এই পায় পায় আপদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, তাহাই আমাকে উপদেশ করুন।

আমার বুদ্ধি সাধ্যে যাহা কিছু যুটিয়াছিল, সমস্তই করিয়া দেখিয়াছি; অভাগার ভাগ্যে কোন ফলই ফলে নাই। একজনে বলিয়াছিলেন, বসন্তপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা না করিয়া যন্ত্রস্বরূপিণী চক্রাদেবীর পূজা করিলে গৃহিণীর চক্রানুকারিণী মুখরতা নিবৃত্ত হয়। আমি তাহা করিয়া আরও বিপন্ন হইয়াছি। আগে শুধু মূর্খ ছিলাম, এইক্ষণ মূর্খের উপর ক্রূরকর্ম্মা পৌত্তলিক বলিয়া অবিরত ধিক্কৃত হইতেছি। আর একজন কুচক্রী আমায় বোকা পাইয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে, দাল উথলিয়া উঠিলে একটুকু সুগন্ধ দ্রব্য প্রক্ষেপেই সেই উচ্ছলতা যেমন প্রশমিত হয়; তদ্রূপ মুখরা ভার্য্যার ক্রোধাবেগও যখন নিতান্ত উথলিয়া উঠে তখন ঐরূপ কোন প্রক্রিয়াই তন্নিবারণের প্রধান উপায়রূপে কার্য্যকর হইতে পারে। আমি বুদ্ধিদোষে একদিন এই কুপরামর্শ অনুসারে চলিয়া, এইক্ষণ অশেষ বিড়ম্বনা ভুগিতেছি এবং অহোরাত্র কথার জ্বালায় পুড়িয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আমার পরিত্রাণের জন্য কোন পন্থাই কি আর নাই?

প্রত্যুত্তর।

আমরা এই পত্রখানি পড়িয়া দুঃখে বিগলিত হই নাই। কারণ ইহাতে দুঃখের কথা যত না আছে, রসিকতা আর বাগাড়ম্বর তাহা অপেক্ষা অধিক। পত্রলেখক গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্যের কেহ হইবেন, না কোন প্রগল্ভস্বভাব সুচতুর যুবা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইটুক বেশ বুঝা যায় যে, তিনি স্বাহচরিত্র চিত্রিত করেন নাই। পরের ঘরে উকি মারিয়া একটু আধটু যাহা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাই কল্পনার তুলিতে নানা রঙে রঞ্জিত করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা তথাপি তাঁহার এই অতিচিত্রিত বর্ণনাই স্বীকার করিয়া নিয়া, প্রতীকারের জন্য সাধ্যানুরূপ ব্যবস্থা করিব।

বর্ণিত অবস্থা, আমাদিগের বিবেচনায়, গার্হস্থ্য জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা নহে। ইহার নাম গৃহিণীরোগ এবং গৃহলক্ষ্মীর অপ্রাকৃত মুখরতাই ইহার প্রধান উপসর্গ। আমরা যে অপ্রাকৃত শব্দটি ব্যবহার করিলাম, তাহার বিশিষ্ট হেতু আছে। মুখ থাকিলেই মুখরতা জন্মে; সুতরাং তাহাকে আমরা দোষ বলিতে পারি না। কিন্তু মুখরতা যখন প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করে, তখন তাহাকে দোষ বলি, এবং সেই দোষ গাঢ়তর হইলে রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যামিনী মুখরা; সে বসন্তবিলাসিনী কোকিলা কি এস্রাজের মত। প্রণয়বিহ্বলাও কখনও মুখরা; সে জল

কলবাহিনী স্রোতস্বিনীর মত। কিন্তু কোন কোন নারীর মুখরতা যথার্থই চড়কা কি ভাঙ্গা ঢাকের বিকট শব্দের ন্যায়, এবং উহা এক ভয়ানক রোগ। ঐরূপ রুগ্নস্ত্রীলোকের স্বামীকে পণ্ডিতেরা বিলাতে কুক্কুটারিত এবং এদেশে গৃহিণীগ্রস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

এই রোগের প্রকৃত নিদান নিরূপিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার লক্ষণাদি সহজবোধ্য। ইহার প্রথমসঞ্চার সময়ে চক্ষু ঈষৎ লোহিতবর্ণ হয়, ভ্রূযুগ অল্প অল্প আকুঞ্চিত হইয়া আসে, নাসা স্ফীত হইতে থাকে, এবং অধর ও ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, অবস্থা আর একটুকু আশঙ্কাজনক হয় এবং অপস্মাররোগের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা, তখন চক্ষু শুধু আরক্ত না রহিয়া, চক্রের মত আবর্ত্তিত হয়, হস্তপদ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, মুখ ফেনিল হইয়া উঠে, এবং রোগী ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির মত অনর্গল প্রলাপ বলে।

যাহা হউক, এ ব্যাধি অচিকিৎসনীয় নহে। হোমিওপেথিসম্মত সদৃশ চিকিৎসা অবলম্বন করিলে, বৈদ্যের বুদ্ধিবলে কোন কোন স্থলে ঝটিতি রোগোপশমন হইতে পারে। কিন্তু রোগী অনাহারাদি ক্লেশে বাতাহত লতার ন্যায় ঢুলিয়া পড়ে এবং রোগও এক বারে নির্ম্মূল হয় কি না সন্দেহ। এক আশ্চর্য্য এই, পূর্ব্ব পশ্চিম দুইদিগের দুইটি প্রধান লোক এই প্রণালীর পক্ষপাতী। শেক্সপীয়রকৃত কর্কশার বশীকরণ নামক চিকিৎসাগ্রন্থ অনেকেই হয়ত পাঠ করিয়াছেন। আমাদিগের কালিদাসও এ বিষয়ে ঠিক্ ঐরূপই আর এক ব্যবস্থা অল্পাক্ষরগ্রথিত সূত্রের মত বিধান করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা না জানেন তাঁহারা " বিষস্য বিষমৌষধং " এই চিকিৎসাসূত্রের টীকা ও টিপ্পনী পাঠ করিবেন ; এবং ইচ্ছা হইলে, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, কদাচৎ কথঞ্চিৎ সাবধানতার সহিত মৃদুভাবে প্রয়োগ করিয়া দেখিবেন।

এলোপেথির বিরুদ্ধচিকিৎসা বহুকাল কলনীয় ও চিকিৎসকের পক্ষে বহুক্লেশকর হইলেও, রোগীর অধিক মনঃপ্রিয় এবং বোধ হয় রোগের নির্ম্মূলতাসাধনেও অধিকতর অনুকূল। সক্রেতিশের গৃহিনী এই রোগে অভিভূত ছিলেন, এবং রুশিয়ুর শেষবয়সের প্রেয়সীও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার অকথ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন। শুনিয়াছি, তাঁহারা উভয়েই এই প্রণালীর চিকিৎসায় রোগমুক্ত হন। কিন্তু বিরুদ্ধচিকিৎসা অবলম্বন করা, যে সে ব্যক্তির কর্ম্ম নহে।

ইহার অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে. তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। চিকিৎসকের পক্ষে একটু কাব্য জানা চাই, একটু দর্শন ও বিজ্ঞান জানা চাই. এবং বৈদ্যের তত্ত্ব প্রভৃতি অপ্রচলিত তত্ত্বাদিতেও ভাল রূপ দীক্ষিত হওয়া চাই। তাহা হইলেই সিদ্ধ, নচেৎ সাধনার পথেই বিষম বিপদ।

আমাদিগের পত্রপ্রেরক যেরূপ মৃদুলস্বভাব, মধুরভাষী, এবং সুরসিক লোক, যদি সেইরূপ বুদ্ধিবৈভবসম্পন্ন ও লোকপ্রকৃতিজ্ঞ হন, তবে তাঁহার পক্ষে উপরোক্ত দুই প্রণালীর মধ্যে শেষোক্তপ্রণালীই আমাদিগের বিবেচনায় প্রশস্ত বোধ হয়। তাঁহার গৃহিণী আবার যখন হুঙ্কার ঝঙ্কার দিয়া ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠেন, তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, ভাবমুগ্ধভক্ত কিংবা সুকবির ন্যায় তদীয় স্তুতিবন্দনায় রত হওয়াই তাঁহার একমাত্র পথ। যদি বুকে এক টুকু সাহসও রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে নিহিলোপেথ অর্থাৎ হরির নাম সার করিবেন। শেষে, ফলাফল অদৃষ্টের হস্তে।

দুর্গাবতী।

মান বড়, না প্রাণ বড়? যদি একথার উত্তর চাও, রাণী দুর্গাবতীকে জিজ্ঞাসা কর। শারীরিক শক্তিসামর্থ্য যে সাহস ও শৌর্য্যের অদ্বিতীয় সহায়, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। কেননা, মনুষ্য বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় হইলে প্রায়ই সাহসী হইয়া থাকে, এবং সম্মুখস্থিত কিছুই গণনার মধ্যে আনিবা, শুধু গায়ের গরিমায়, অসংখ্য প্রতিবন্ধকও লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হয়। আর, দুর্ব্বল ও দীনসত্ত্ব হইলে, প্রকৃতবিপদের কথা দূরে থাকুক, তীরে মৃদু মৃদু তরঙ্গভঙ্গি দেখিয়াই তরী ডুবাইয়া দেয়, অথবা দূরের বাতীতেই ঝটিকার শঙ্কা করিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়ে। তবে পৃথিবীতে কোথাও কখনও এ নিয়মের অন্যথাভাব দৃষ্ট হয় না, এমন নহে। অনেক লোক এইরূপ আছে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে প্রস্তরকেও পদাঘাতে চূর্ণ করিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগের সে ইচ্ছা জন্মে না। সাহসবিরহে তাহাদিগের মুখের আস্ফালন মনেই বিলীন হয় এবং কার্য্যকালে বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। অনেকের অবস্থা আবার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপাততঃ এইরূপ বোধ হয় যে, উহা একটি অঙ্গুলির আঘাতও সহিতে

পারিবে না। কিন্তু আপন যখন নবীমুখ মেঘমালার ন্যায় চতুর্দ্দিগ হইতে তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করে, আকাশ যখন গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, এবং আশার শেষ আলোকটিও যখন নিভিয়া যায়, তখন তাঁহাদিগের সেই শীর্ণদেহের অভ্যন্তর হইতেই এমন এক ভাস্কর সাহসের তেজ উদ্গীর্ণ হয় যে, সকলের চক্ষেই ক্ষণকালের জন্য ধাঁধাঁ লাগে এবং নিরাশহৃদয়েও আশা অকস্মাৎ ফিরিয়া আসে। এই সাহস শরীরের নহে; ইহা মনের। সংসারে সচরাচর ইহা দৃষ্ট হয় না। ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, সকলই মানের জন্য। যাঁহারা মানের তুলনায় সমগ্র ধনসম্পদকেও তৃণ জ্ঞান করেন তাঁহারাই ইহার মূল্য ও মর্ম্ম বুঝিতে পান। আমরা যে রমণীরত্নের নাম শীর্ষস্থলে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তিনি এইরূপ মানমূলক অভিমমুখক সাহসের একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তস্থল। ভারতের নরনারী সকলেই তাঁহার নামে গর্ব্বিত ও স্ফীত হইতে পারে।

মোগলসম্রাটদিগের শাসনসময়ে, এলাহাবাদ হইতে অনুমান এক শত ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে গড়মণ্ডল নামে একটি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য ছিল। পরিব্রাজকেরা এখনও গড়মণ্ডলের পুরাতন মঠ ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দর্শনের জন্য পর্য্যটন ক্লেশ স্বীকার করেন। গড়মণ্ডল আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। উহার সীমা মধ্যে কতকগুলি সুন্দর এবং সুরক্ষিত গ্রাম ও নগর ছিল। এখন যেখানে জব্বলপুর, তাহার অতি নিকটে নর্ম্মদার দক্ষিণ তটে একটি মনোহর শৈলমালা বিদ্যমান আছে। গড়মণ্ডলের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ গড়নগর ঐ শৈলমালাবেষ্টিত থাকিয়া চতুর্দ্দিগের সকল শত্রুকে উপহাস করিত। ইংলণ্ডীয় বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা ঐ নগরকে গরা এবং উহার অনুবর্ত্তী আর একটি নগরকে মণ্ডলা বলিয়া সমগ্র রাজ্যটিকে গরামণ্ডলা কিংবা গড়মণ্ডলা নামে নির্দ্দেশ করেন। আমাদিগের বিবেচনায় গড়মণ্ডল নামই নানাকারণে অধিকতর সংগত।

গড়মণ্ডলের রাজারা পুরুষানুক্রমেই নিতান্ত প্রতাপশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা কখনও শান্তি ও সুনিদ্রার লোভে স্বাধীনতার কণ্টকাকীর্ণমসৃনকে উপেক্ষা করিতেন না, এবং নিজের বাহুবলে অবহেলা করিয়া কোন মতেই পরকীয় পালনেহনে সম্মত হইতেন না। যবনদিগের উদ্বেল তরঙ্গমালা একে একে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমুদয় হিন্দু রাজ্যকে গ্রাস করল। কিন্তু সেই ঢেউ গড়মণ্ডলে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত

হইল। বস্তুতঃ এই সমস্ত হেতুতে উক্ত রাজ্য বহুকাল যাবৎ মুসলমান দিগের চক্ষুঃশূল ছিল। যিনি দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হইতেন, তিনিই একবার উহার প্রতি আক্রমণার্থে দৃষ্টিপাত করিতেন। কিন্তু সকলেই কেবল চক্ষু রক্ত করিতেন, আর দন্ত কড় মড়ি করিতেন; কার্য্যতঃ কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

যখন অমিতপরাক্রম আকবর সাহ দিল্লীর সম্রাট্ হন, তখন পতিহীনা দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের অধীশ্বরী। কথিত আছে, তৎকালে ভারতে তাঁহার মত অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী ও তেজস্বিনী নারী আর একটিও ছিল কি না, সন্দেহ। তাঁহার মানসিকক্ষমতাও সর্ব্বথা রূপের অনুরূপ ছিল। তিনি স্বয়ং রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন; রাজ্যের কোথায় কি অবিচার ঘটিতেছে, কোথায় কি অভাব রহিয়াছে, তৎপ্রতি সতত স্বয়ং দৃষ্টি রাখিতেন; এবং মন্ত্রীবর্গকে যথাযথ, এবং সেনানায়ক দিগকে কর্ত্তব্যবিষয়ে স্বয়ং উপদেশ দিতেন। যে সময়ের প্রসঙ্গ হইতেছে, তৎকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র যুবরাজ বীরবল্লভ অনূ্যন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম লাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কখনই জননীর শাসনে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে শস্ত্রধারী হইয়া উপস্থিত থাকিতেন না। সুতরাং রাণীর বয়ঃক্রম তখন অবশ্যই পঞ্চত্রিংশতের অধিক ছিল।

রাণী দুর্গাবতী পিতার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, না পরলোকগত পতির রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন; ইতিহাসে তাহার নির্দ্দেশ নাই। তদীয় পিতা এবং পতির নামটি পর্য্যন্তও কোন গ্রন্থে উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে তাঁহার দিগন্তবিস্তারিত অকলঙ্কযশোরাশি তৎসম্পর্কিত আর আর সকলের যশ ও নামকে একেবারে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাঁহারই কীর্ত্তি কলাপের আলোচনা করিয়াছেন, ঐতিহাসিকেরা তাঁহারই বিবরণ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং কবি ও ভাটেরাও তাঁহারই গুণ গান করিয়া বেড়াইয়াছেন; গড়মণ্ডলে আর কে কি করিয়াছেন, তৎপ্রতি কেহই ফিরিয়া চান নাই।

যদি গড়মণ্ডলের ন্যায় তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজ্যগুলিও যবনসম্পর্ক শূন্য হইত, তাহা হইলে দুর্গাবতী তাঁহার জীবনে কত কি কল্যাণকর ও যশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ভারত লক্ষ্মীর অশুভদর্শনহেতু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আকবর সাহ তাঁহার সকল আশার অন্তরায় হইলেন।

আকবর, সময়ে সময়ে চক্ষু মুদিয়া এবং দরিদ্রদিগকে কদাচিৎ কিছু কিছু দান করিয়া, যত কেন ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া না থাকুন, তিনি লোভনির্ম্মুক্ত ছিলেন না। গড়নগরের রাজভাণ্ডারে অনেক দিনের সঞ্চিত ধন রক্ষিত ছিল। এই সংবাদ তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ইহার উপর আবার দুর্গাবতীর প্রতাপ ও স্পর্দ্ধার কথাও তাঁহার অভিমানে আঘাত দিল। তাঁহার উত্তরোত্তর মুখী প্রভুতা-শক্তির নিকট ভারতবর্ষের সমুদয় বড় বড় মাথা অবনত হইল, অথচ একটি অনাথা অবলা তাঁহাকে গ্রাহ্যও করিল না, তিনি ইহা সহিতে পারিলেন না।

এদিকে, আসফ খাঁ নামে মুসলমান সম্রাটের একজন নিতান্ত উদ্ধতস্বভাব ও ধনপ্রকৃতি সেনাপতি ছিলেন। কড়া এবং মানিকপুর প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। গড়মণ্ডল বিলুণ্ঠনের লোভ তাঁহার জিহ্বাকেও লালায়িত করিল। তিনি পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে নর্ম্মদা পার হইয়া দুর্গাবতীর অধিকারে এখানে ওখানে উৎপাত জন্মাইতেন, এবং কিছুই করিতে না পারিয়া ভগ্নদন্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ফিরিয়া আসিতেন। এই দণ্ড রাজার ইঙ্গিত পাইয়া তিনি আর পর নাই সাহসী হইলেন এবং একবারে ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও দ্বাদশ সহস্র পদাতি সেনা লইয়া গড়মণ্ডলের অভিমুখে ভয়ানক আড়ম্বর সহকারে যাত্রা করিলেন।

এই আকস্মিক অভিযানবার্ত্তা যেই গড়নগরে প্রবেশ করিল, অমনি রাজ্যের বালক বৃদ্ধ যুবা, এবং প্রধান প্রধান রাজমন্ত্রীরা আতঙ্কে অস্থির হইল; চতুর্দ্দিকে এক বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল, এবং কে কোথায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে, ইহাই সকলে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গাবতীর হৃদয় একটুকুও কম্পিত হইল না। তাঁহার সাহস ও পরাক্রম, বিপদের আণ পাইয়া, বায়ুসঞ্চালিতবহ্নির ন্যায়, আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি ক্ষণমুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, সহস্রাধিক রণমাতঙ্গ, অদ্ভুতসংখ্যক অশ্বারোহী এবং কতকগুলি পদাতিককে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন; আর, পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাহারও সাহস টুটে, অথবা কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে, এই নিমিত্ত আপনিও রণরঙ্গিনীর বেশে, এক হস্তে শাণিত ভল্ল এবং আর এক হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া, মাথায় উজ্জ্বল রাজমুকুট পরিয়া, গজারূঢ় হইয়া বহির্গত হইলেন।

গড়মণ্ডলের সৈনিকেরা প্রথমে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া থাকিলেও রাণীর

তদানীন্তন তেজঃপ্রভা এবং জলদগম্ভীরা আশ্বাসদায়ী কণ্ঠধ্বনি তাঁহাদিগের সকল ভয় দূর করিল। তখন তাহারা নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জিতে লাগিল, এবং কে আগে প্রধাবিত হইয়া স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার্থ শত্রুর সম্মুখীন হইবে, এই ভাবনায় উতলা হইল। অশ্বগজের গর্জ্জন, তরবারির ঝণৎকার এবং শোণিত লোলুপ সৈনিকপুরুষদিগের যুদ্ধকালীন ভীমনাদে তেমন বীরেরও বুদ্ধি অনেক সময় লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু এই কুসুমকোমলা অবলায় ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। তিনি যোদ্ধৃবর্গের প্রমত্ত ভাব দর্শনে লঘুপ্রাণ ব্যক্তির মত আহ্লাদে উন্মত্ত না হইয়া পংক্তিরক্ষার নিমিত্ত সকলকে পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে শাসন করিতে লাগিলেন, এবং কেহই যেন রাজমাতঙ্গপৃষ্ঠে যুদ্ধের অনুমতিসূচক পতাকা উড্ডীন দেখিবার পূর্ব্বে অসি নিষ্কাসন না করে এবিষয়ে দৃঢ় আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

বাহুবলদৃপ্ত যবন সেনারা যাহা ভাবিয়া আসিয়াছিল, আসিয়া তাহা দেখিতে পাইল না। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, দুর্গাবতী শত হইলেও একটি স্ত্রীলোকমাত্র; তিনি তাহাদিগের ভ্রুকুটিভঙ্গিদর্শনেই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পড়িবেন। বস্তুতঃ তাহা রাই শেষে দুর্গাবতীর সেই অসুরত্রাসিনী ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইল। তাহারা কোথাও সহজে পরাভব মানে নাই। এখানে দেখিতে দেখিতেই তাহাদিগের দলবলে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করিল, এবং অন্যূন ছয়শত অশ্বারোহী কিছুকালের যুদ্ধেই ভূতলশায়ী হইবায় অবশিষ্ট সকলে ত্রাসিরবে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। দুর্গাবতী এই বিজয়লাভে পরিতৃপ্ত না হইয়া সমস্তদিন অক্লান্তদেহে অশ্রান্তমনে পলায়নপর শত্রুদিগকে পশ্চাৎ হইতে তাড়াইয়া চলিলেন, এবং শেষে সূর্য্যের অস্তগমন দেখিয়া সৈনিকদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যও যে চিরদিনের জন্য ঐ অস্তমিত হইল ইহা তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন না।

(অবশিষ্ট আগামীতে প্রকাশ্য।)

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণবসু প্রণীত।—একালের অর্থ স্পষ্ট। একাল বলিলে, আমরা এখন যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, এবং

নিত্য যে সকল নূতন পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইতেছি, তাহা বই আর কিছু বুঝায় না। সেকালের অর্থ এইরূপ স্পষ্ট নহে। বিশবৎসর পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও সেকাল; এবং বিংশতিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল অবস্থা সময়ের স্রোতে ভাসমান হইয়া শেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহাও সেকাল। রাজনারায়ণ বাবুর সেকাল আর একাল উভয়ই পরীক্ষিত কালের বৃত্তান্ত এবং এই নিমিত্ত উভয়ই সমান মনোহর এবং স্বতঃসুন্দর। যাঁহারা যৌবনমদে মত্ত, তাঁহারা যে পরিমাণে নূতনের অনুরক্ত; যাঁহারা বার্দ্ধক্যে জড়সড়, তাঁহারা আবার সেই পরিমাণে পুরাতনের ভক্ত। বর্ত্তমান গ্রন্থকার যথার্থ মহাত্মা, তিনি কোন দিগেই গড়াইয়া পড়েন নাই। তাঁহার লেখায় স্মৃতি উপদেশ দিতেছে; আশাও মোহবেশ ধারণ করিয়া আশ্বাস দান করিতেছে। যদি কেহ কিছু কাল বসিয়া অভিনিবেশ সহকারে এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তিনি নিঃসংশয় প্রীত প্রমোদিত ও উপকৃত হইবেন।)

২। বালাবোধিনী—গ্রন্থকারের নাম নাই; কিন্তু তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি ও রচনাকৌশল, সমস্তই অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত। গ্রন্থের কলেবর মুখপত্রাদি সর্ব্বসমেত ১৬ পেজি এক ফরমা, তথাপি গ্রন্থকারের নৈপুণ্যগুণে ইহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং কলিকাতা, বর্দ্ধমান, শান্তিপুর ও সোণার গাঁ প্রভৃতি কত দেশের কত কি কথা পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মূর্খপাঠকবর্গ একবার পাঠ করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না।

৩। জমিদারী মহাজনী হিসাব ও পরিগণিত। শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত।—এখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। যত দূর দেখিলাম, তাহা ছাত্রশিক্ষার অতি উপযুক্ত সহায় বোধ হইল।

৪। কুসুম কলিকা। শ্রীহরিকৃষ্ণ মজুমদার প্রণীত।—এই গ্রন্থের প্রথম অংশে কোকিল, মাস, সুনিদ্র-পদ্ম, বিদ্যুৎ, সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি নানাবিধ প্রসঙ্গে কতকগুলি কবিতা এবং শেষ অংশে সরলা ইত্যভিধেয় সামান্য একটি উপন্যাস বিনিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি আগাগোড়া সমান না হউক, অনেক স্থলেই সুললিত। দুই এক স্থলে সত্য সত্যই উহাতে সুখপ্রতিভার চমক দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। উপন্যাসটি কিছুই নহে।

সামাজিক নিগ্রহ।

অমিশ্রসুখ ও অমিশ্রসম্পদ মনুষ্যের আশাতীতপদার্থ। যেখানে যে পরিমাণে পরিতৃপ্তি, সেখানে সেই পরিমাণে অতৃপ্তি; যে বাণিজ্যে যে পরিমাণে ক্রয়, সেই বাণিজ্যে সেই পরিমাণে বিক্রয়। প্রণয়ে পরাধীনতা, ভোগে বৈরাগ্য, আশায় উদ্বেগ, প্রভুত্বে আপদ, কীর্ত্তিতে কলঙ্ক, বৈভবে লোকের বিদ্বেষ এবং বৃদ্ধিতে অহেতুক ভয়। এই ক্ষতি-লাভ এবং সঞ্চয় ও অপচয়ের নিয়ম অব্যর্থ ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। সংসারে কোথাও ইহার অন্যথাভাব পরিলক্ষিত হয় না। মনুষ্যের সামাজিকসুখ ও সামাজিক সম্পদও আমাদিগের বিবেচনায় কড়ায় ক্রান্তিতে এই নিষ্ঠুর নিয়মের অধীন। দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সমাজ-শক্তির অন্ধভক্ত, তাঁহারা আপাততঃ এই কথায় সায় দিতে ইচ্ছুক না হইলেও, অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিলে, অবশ্যই পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। প্রত্যক্ষপ্রমাণের সহিত কে কোথায় দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে পারে?

সমাজের গৌরব সর্ব্বত্র অবিসংবাদিত। নিতান্ত স্থূলদৃষ্টিতেও ইহা প্রতীত হয় যে, মানবজাতির অদ্য পর্য্যন্ত যে কোন বিষয়ে যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, সমাজবন্ধনই তাহার পত্তনভূমি। মনুষ্য সামাজিক জীব, তাই মনুষ্য পৃথিবীর রাজা; নরলোকে দেবতা; জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে এবং ঊর্দ্ধস্থ নভোমণ্ডলে অধীশ্বর। নহিলে, মনুষ্য কোথায় কি অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। বস্তুতঃ, যদি ব্যাঘ্রপ্রভৃতি শারীরশক্তিসম্পন্ন হিংস্রজন্তুসকল সমাজবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিত, তাহা হইলে মানবীয়শক্তি, বুদ্ধি ও হৃদয়াদি বৃত্তিচয়ের সাহায্যসত্ত্বেও, ভূলোকে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত কি না, সন্দেহের কথা। আবার দেখ, সমাজবন্ধন যে শুধু মনুষ্যের যাবদীয় সম্পদের নিদান, এমন নহে। মনুষ্যের যত কিছু সুখ আছে, তাহারও প্রধান প্রস্রবণ সমাজ। মনুষ্য একাকী দুখানি হাত আর দুখানি পা লইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে; কোটি লোক সমবেত হইয়া সেবকের মত নিয়ত তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। তাহার একটি অভাব অনুভূত হইতে না হইতে, সেই অভাব মোচনের জন্য চতুর্দ্দিগ্ হইতে সহস্রবিধ সামগ্রী আ

পনি আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। সে হাসিলে, সংসার হাসে; সে দুঃখে এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিলে, আকাশ রোদনধ্বনিতে নিনাদিত হয়। ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে। গভীরভাবে চিন্তা করিলে, ইহার অপার মহিমার নিকট মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সৌভাগ্যও অমিশ্র বস্তু নহে। বিধাতার কি ইচ্ছা, এ কমলও কন্টকজড়িত! সামাজিক জীবনের সুখ ও সম্পদের ত অবধিই নাই; কিন্তু নিগ্রহ কতগুলি আছে তাহাও একবার আলোচনা কর। মনুষ্য জাতি বিনা মূল্যে এই অসীমবৈভবের অধিস্বামী হইয়াছে, ইহা ভুলিয়াও মনে করিও না।

সামাজিকনিগ্রহের অনেক অর্থ হইতে পারে। রাজা যে দণ্ড বিধান করেন, এক অর্থে ইহা সামাজিকনিগ্রহ। কারণ, সমাজশক্তি রাজার নিকট অর্পিত না হইলে তিনি কাহারও কিছু করিতে পারেন না। যাজকের অভিসম্পাত, জাতিচ্যুতি, লোকাপবাদ এগুলিও সামাজিকনিগ্রহ। একটি বা কএকটি লোক, সমাজের এক বিভাগের প্রতিনিধিরূপে, এক বা দশজনের এইরূপ নির্য্যাতন করে। যখন সমাজের দোহাই না দিলে ঐরূপ নির্য্যাতনের কিছুই সাহায্য থাকে না, তখন উহাকে সামাজিক নিগ্রহ বলা নিতান্ত অসংগত নহে। কিন্তু আমরা যে সকল নিগ্রহের প্রসঙ্গ করিব, তাহা উল্লিখিত উভয়বিধ নিগ্রহ হইতে পৃথক্। পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহ সকল বাস্তব বা কল্পিত অপরাধের শাস্তি স্বরূপ। কেহ দোষ করে, এবং দোষের ফলভোগী হয়। ইহাতে ক্ষোভ করিবার কিছুই কারণ নাই। কিন্তু মনুষ্য জাতি সমাজের অভ্যন্তরীনকগ্নতাহেতু বিনাদোষে যেসকল অপ্রতীকার্য্য নিগ্রহ ভোগ করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহাকেই প্রকৃত সামাজিকনিগ্রহ বলি। ইহার দুই একটি উদাহরণ দেখ।

আমাদিগের বিবেচনায় সামাজিক জীবনের সর্ব্বপ্রধান নিগ্রহ স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি। যিনি সামাজিক, তিনিই পরাধীন, এবং যিনি যে পরিমাণ উন্নত সমাজের সভ্য, তিনি সেই পরিমাণ সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। স্বাধীনতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইলে, মনুষ্য কখনই সমাজে বাস করিতে পারে না। মনুষ্যের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং মনোবৃত্তি গণের অত্যূর্দ্ধ দেশকেও অতিক্রম করিতে চায়; কিন্তু সমাজ তাহার পায়ে দৃঢ় রজ্জু বন্ধন করিয়া তাহাকে ধূলিময় কৌমার ক্রীড়াতেই চিরকাল বান্ধিয়া রাখিতে চেষ্টা করে।

যাঁহারা শিক্ষার গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন মনে

করেন, তাঁহাদিগের বিড়ম্বনা চিন্তা করিলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়। তাঁহাদিগের স্বাধীনতা কোথায়? কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীন বলিব? যখন দেখিতেছি যে, তাঁহারা যন্ত্রস্বরূপ, আর সমাজ তাঁহাদিগের যন্ত্রী; যখন দেখিতেছি যে, তাঁহারা সম্যক্ প্রকারে পরের হস্তে গঠিত, পরের দ্বারা পরিচালিত এবং পদে পদে পরের অধীন; যখন দেখিতেতেছি যে, তাঁহাদিগের মনের প্রত্যেক চিন্তা, হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব এবং আশার প্রত্যেক তরঙ্গ সমাজের শাসনে এই এক রূপ রহিয়াছে, এই রূপান্তর ধারণ করিয়া আর এক খেলা খেলিতেছি, তখন তাঁহাদিগকে স্বাধীন বলা স্বাধীনতা শব্দের ভয়ানক অপব্যবহার।

ঐ যে ফুলটি স্রোতের জলে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, উহাকে কি তুমি স্বাধীন বল? যদি উহার স্বাধীনতা না থাকে, তবে সামাজিকমনুষ্যেরও স্বাধীনতা নাই। উহাকে জোয়ারে উপরে তুলিতেছে, ভাটায় নীচে নামাইতেছে এবং তরঙ্গের প্রত্যেক অভিঘাত, একবার ডুবাইয়া, আরবার ভাসাইয়া উঠাইতেছে। সামাজিকমনুষ্যও, অবস্থার স্রোতে নীয়মান হইয়া, আজ সাধুর আচরণ করিয়া প্রশংসা লইতেছে, কল্য অসাধুর বেশধারণ করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে; এই দাতা বলিয়া লোকের ধন্যবাদ পাইতেছে, এই কৃপণ কি পরস্বাপহারী বলিয়া কলঙ্কের অর্ণবে ডুবিয়া যাইতেছে। সে কি যেন ভাবে, কি যেন করে, কিছুই তাহার আয়ত্ত নহে। অবোধমনুষ্য করসূত্রধৃত পুতুলের খেলা দেখিয়া আমোদ করে; যাঁহার বুদ্ধি আছে, তিনি মানুষীলীলা রূপ পুত্তল খেলা দেখিয়া গভীরচিন্তায় নিমগ্ন হন।

ধর্ম্ম স্বাধীনতার প্রাণ। মনুষ্যকে সামাজিক জীবনের দক্ষিণাস্বরূপ যথার্থ ধর্ম্মকেও বলিদান করিতে হয়। যথার্থ ধর্ম্মে পরমুখপ্রেক্ষিতা কখনই স্থান পায় না। যথার্থ ধর্ম্মের ভাব স্তুতির কলকণ্ঠে স্ফীত হয় না, এবং নিন্দার বিষদংশনেও শুকাইয়া যায় না। মনুষ্যের সামাজিকধর্ম্ম স্তুতিনিন্দারূপ বিষাণদ্বয়ে বিলম্বিত। বর্ত্তমান সময় যে ভাবের স্বপক্ষ, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম, আর বর্ত্তমান সময় যে ভাবের বিপক্ষ তাহাই মনুষ্যের অধর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্যের পরীক্ষার সময় মনুষ্য অধিকাংশ লোকের মত কোন দিকে ইহারই গণনা করে; আপনাকে কদাপি গণনায় আনে না; আনিলেও আপনার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করে না। সে লোকের নিকটে ভজনা করে, লোক সমক্ষে ঢাকঢোল বাজাইয়া দান ও প-

রোপকারাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং লোকচক্ষুতে প্রসন্নদৃষ্টি দর্শন করিলেই, সকল সাধনা সিদ্ধ হইল ভাবিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে।

ফরাশিরা একবার সভায় বসিয়া ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছিল। সভ্যদিগের অধিকাংশের মত হইল যে, 'ঈশ্বর নাই'। সভার ব্যবস্থাপুস্তকেও অমনি লিখিত হইল যে, 'ঈশ্বর নাই'। এই ঘটনা লইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী পণ্ডিতেরা অনেক হাসিয়াছেন। কিন্তু সংসারে সভ্যসমাজে প্রতিদিন যে এইরূপ কত ঘটনা ঘটিতেছে, তৎপ্রতি অনেকেই দৃষ্টি করেন না। যেসকল কথা সমাজে নীতিসূত্র কিংবা ধর্ম্মের মৌলিকবিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, গাঢ় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, তত্তাবতের অধিকাংশই অধিকাংশলোকের মতের দ্বারা ব্যবস্থাপিত; অনুষ্ঠানকারীর স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনপ্রবৃত্তির সহিত কোনরূপেই সম্বন্ধ নহে। সত্য বটে, কখনও কখনও দুই একটি লোক আপনার পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া প্রবহমান স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, এবং আত্মার স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মের নির্ম্মুক্তভাবকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমস্ত সংস্কারের উপদ্রব নির্ভীক হৃদয়ে মস্তকে বহন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অনেকেই এক আপদ এড়াইতে গিয়া আর এক আপদে নিপতিত হন। যদি মেষ বলিয়া অভিহিত হইলে মনে দুঃখানুভব হয়, তবে ব্যাঘ্র বলিয়া অভিহিত হইলেই সুখী হইবার কারণ নাই। যথার্থস্বাধীনমনা ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতাকে যেমন সম্মান করেন, পরের স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্যও সেইরূপ যত্নপর থাকেন। কোন দিগে ইহার অন্যথা হইলেই তিনি সমাজের দাস।

কপটতাশিক্ষা সমাজিকজীবনের আর এক নিগ্রহ। বালকেরা কপট বলিয়া যাহাকে যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুক। যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবে তুমি কখনই মনুষ্যকে কপট বলিয়া নিন্দা করিও না। কপটতা মনুষ্যসমাজের অপরিহার্য্যপাপ। যে মনুষ্য সমাজে বাস করিয়াছে, সে ই কপট হইয়াছে। কপট না হইলে সামাজিকেরা তাহাকে ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেয় না। তুমি যাহাকে হৃদয়ে অশ্রদ্ধা কর, এবং যাহার সংস্পর্শ হইতে সহস্র হস্ত দূরে রহিতে অভিলাষী হও, সমাজের শাসনে তাহাকেও তোমার আদর সহকারে গ্রহণ করিতে হয়; আর যাহাকে তুমি প্রাণের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে আকাঙ্ক্ষা কর, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না

করিলেও, অনেক সময় তোমার নিন্দার সীমা থাকেনা। লোকে যাহাকে সভ্যতা অথবা শিষ্টাচার বলে, তাহার এক অর্থ প্রদর্শন, আর এক অর্থ আচ্ছাদন। যাহা সত্য, তাহা তুমি আচ্ছাদন করিতেছ, আর যাহা অসত্য, তাহাই তুমি প্রদর্শন করিতেছ। ইহাই সংসারের নীতি এবং ইহাই সভ্যসমাজের পরিগৃহীত আচার। যদি তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও নিরাবরণ হও, যদি তুমি তোমার হৃদয়ের প্রকৃত ইতিবৃত্ত মনুষ্যজাতিকে অন্ততঃ একবারও খুলিয়া পড়িতে দেও, তুমি শৈশব হইতে যাত্রা করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত কখন কোন্ পঙ্কিল হ্রদে, কখন কোন্ দুরিতময়নিরয়ে ডুব দিয়াছ, যদি তাহা অকপটচিত্তে সকলের নিকট ব্যক্ত কর, তাহা হইলে হয় ত রাজা তোমাকে কারাবাসে দেন, সামাজিকেরা তোমাকে অপাংক্তেয় করেন, আত্মীয় স্বজনেরা তোমা হইতে দূরে চলিয়া যান, এবং যাঁহাকে কি যাঁহাদিগকে প্রাণের প্রিয়তম পুতুল বলিয়া পূজা করিতেছ, তিনি কিংবা তাঁহারাও তোমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু তুমি ইহার কিছুই করিতেছ না। সমাজ তোমাকে কার্য্যতঃ বঞ্চনা করিতে শিক্ষা দিতেছে, অথবা বাধ্য করিতেতেছে, তুমিও বাধ্য হইয়া বঞ্চনা করিতেছ। কপট গুরু, কপট শিষ্য উভয়ই সমান শ্রদ্ধাস্পদ ও সমান ভক্তিভাজন!! এইরূপ জীবনে যদিও তোমার সুখের পথে কোন কন্টক পড়িতেছে না, তথাপি এ কথা নিঃসংশয় যে, জলৌকা যেমন নিঃশব্দে রক্তশোষণ করে, ইহাও সেইরূপ নিঃশব্দে তোমার পুরুষকারকে শোষণ করিতেছে; তোমার যাহা হওয়া উচিত ছিল, তোমাকে তাহা হইতে দিতেছে না। যদি একটি মিথ্যা কথা বলিলে পাপ হয়, আর সেই পাপে সাহস শৌর্য্যাদি অধ্যাত্মসম্পদের কোন প্রকার অপচয় ঘটে; তবে আরম্ভ হইতে শেষ নিরবচ্ছিন্নকপটজীবনে অবশ্যই সাংসারিক মনুষ্যের বিষম অনিষ্ট হইতেছে, সন্দেহ নাই।

আমরা প্রকার মাত্র প্রদর্শন করিলাম; বুদ্ধিমান্ পাঠক একটুকু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সংকলন করিতে পারিবেন। কারণ, দেশাচার, কুলাচার ও ভদ্রাচার নামে যতপ্রকার আচার ব্যাবহার সমাজ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সমস্তই কোন না কোন অংশে মনুষ্যের নিগ্রহ স্বরূপ। কেহ দেশাচারের শাসনে দরিদ্র হইতেছে, কেহ কুলাচারের নিকট স্নেহ মমতাকে বলি স্বরূপ উপহার দিতেছে, কেহ ভদ্র হইতে গিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অভদ্রতার প্রান্ত সীমায় পঁহুচিতেছে,

এবং কেহ বা বুদ্ধি ও হৃদয় প্রভৃতি যাহা কিছু বিধিদত্ত বৈভব ছিল, তাহা সমাজের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় নিবিড় অন্ধকারে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সমাজ যদি বস্তুতঃই মনুষ্যের স্বাধীনতার পথে এইরূপ বিষম প্রতিবন্ধক এবং কপটতা, লোকবঞ্চনা ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি অধর্ম্মের শিক্ষক,তবে কি ইহা পরিত্যজ্য ? প্রাচীন ঋষি তাপসেরা পুরুষার্থসাধনের জন্য যেরূপ বনচারী হইতেন, আমরাও কি এত শতাব্দীর পরীক্ষার পর এইক্ষণ ফিরিয়া সেই পথ অবলম্বন করিব ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা একবার নহে,সহস্রবার বলিব,—না। যে আশৈশব সমাজের ক্রোড়ে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সমাজের নিকট অশেষ উপকার পাইয়াছে, এইক্ষণ আর তাহার সমাজ পরিত্যাগের অধিকার নাই। সমাজ মিষ্ট হউক আর তিক্ত হউক, অমৃত হউক আর কাল কূট হলাহল হউক, চক্ষু মু‍ দিয়া তাহাকে অবশ্যই উহার পোষণ করিতে হইবে। ইহার নাম কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম এবং ইহারই নাম কঠোর কর্ত্তব্যব্রত। কর্ত্তব্যের পথ কাহার ও জন্য কুসুমাস্তীর্ণ নহে। আমরা যেরূপ আমাদিগের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক বলিয়া দেহপিঞ্জরকে ভাঙ্গিয়া ফেলি না, জীর্ণ অথবা ভগ্ন হউক উহাতেই কোন প্রকার অবস্থান করি, এবং যত পারি উহার উৎকর্ষসাধনের জন্য চেষ্টা করি ; সেইরূপ আমাদিগের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক বলিয়া এই সমাজপিঞ্জরকেও আমরা বিনষ্ট করিতে অধিকারী নহি।

প্রেম প্লাবন।

ভীষণ কৌরব সমরে আহত,
তৃষ্ণায় কাতর শর শয্যাগত,
যবে শূর শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পিতামহ,
কাতর নয়নে, কৌরবের পানে,
চাহিয়া, সলিল প্রার্থনা করিলা।
যত্নে কুরু-রাজ শত ভ্রাতৃসহ
সেই মহাতৃষ্ণা বারিতে নারিলা।

তখন যেমতি পার্থ ধনুর্দ্ধর,
গাণ্ডীবে সংযোগ করি তীক্ষ্ণ শর,
আকর্ণ পুরিয়া ছাড়িলা ত্বরা।
শন্ শন্ স্বনে কলম্ব ছুটিল,
তলাতল আদি পাতাল ভেদিল,
ভোগবতী স্রোত অমনি বহিল,
কুরুক্ষেত্রে আসি মিলিল ধারা।

হর্ষে ভীষ্ম করি বদন ব্যাদান,
সুখে গঙ্গাজল করিলা পান।
ক্ষণ রণ ভুলি, শত্রুমিত্র মিলি
জয় ধনঞ্জয়, জয় পার্থ বলি,
কিরীটী সুযশ, করিল গান।

—

তথা যবে বঙ্গে তন্ত্র অনুষ্ঠান
জ্বালাইল সবে করি ধর্ম্মভাণ,
হলো বঙ্গহিয়া নীরস পাষাণ,
তখন নদিয়া নগর নিবাসী,
বিপ্রস্তুত এক করুণা প্রকাশি,
মাধুর্য্য চাপেতে যুড়ি ভক্তিবাণ,
প্রেম প্রস্রবণে করিলা সন্ধান।
ভাঙ্গিল বাঁধাল, করি কল কল
ছুটিল ছুটিল ছুটিল জল,
নদিয়া নগর বাজার সকল,
প্রেমের প্লাবনে করে টল মল,
যায়রে নদিয়া যায়রে ভাসি,
নাচেরে গৌরাঙ্গ অধরে হাসি,
অন্তরে না ধরে আনন্দ রাশি।

—

উথলিল ঢেউ ঢেউর উপরে,
তাহার উপরে ঢেউ উথলিল;
তরঙ্গ উপরে উঠিল তরঙ্গ,
তাহার উপরে তরঙ্গ উঠিল।
দেখিতে দেখিতে আর এক যুবা,
প্রেমের তরঙ্গে ঢালিল অঙ্গ
আয়রে নিতাই গুণের ভাই,
বলিয়া গৌরাঙ্গ ধরিল গলে;
দুই প্রেমনদী একত্র মিশিল,
নাচিল নদিয়া প্রেমেরহিল্লোলে।
প্রেমে হুহুঙ্কার ছাড়িল নিতাই,
(প্রেমে মাতোয়ালা পাগলা নিতাই)
দ্বিগুণিত বেগে প্রবাহ বহিল,
শান্তি পুরে যেয়ে তরঙ্গ লাগিল।

—

বৃদ্ধ বিপ্র এক আছিল সেখানে,
তরঙ্গিনী রব পশে তার কাণে,
অমনি মাতিল সুবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ,
নাচে গায় প্রেমে করিয়া ক্রন্দন।
পাগল বলিয়া যে তারে ধরিল,
প্রেমেতে পাগল হইল সে,
মাতিল অদ্বৈত না মাতে কে?
ক্রমে তিন স্রোত একত্রে মিশিয়া,
সমুদয় বঙ্গ প্লাবন করিয়া,
সমগ্র ভারতে ত্বরা ব্যাপিল।
পূরব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে,
পূরবে নাচিল বঙ্গের সাগর,
পশ্চিমেতে সিন্ধু বহিল খর;
সেতুবন্ধে যেয়ে ঢেউ লাগিল,
উত্তরে হিমাদ্রি সঘন কাঁপিল।

—

পাইয়া প্রেমের নূতন জল,
পরম হরষে ডুবে, খেলে, পশে,
ভকত মকর মীন পটল।
তৃণ প্রায় ভাসে পাষণ্ড দল।
রায় রামানন্দ রূপ সনাতন,
গোবিন্দ মাধব বাসু তিন ভাই,

শ্রীজীব গোপাল রঘুনাথ দাস
ছোট হরিদাস বড় হরিদাস,
মুরারি মুকুন্দ পণ্ডিত জগাই,
হইল সকলি প্রেমে নিমগন।
কেহ প্রেমে নাচে, কেহ প্রেমে গায়,
কেহ ভাসে, কেহ হাবু ডুবু খায়,
প্রেম লোফা লুফি, প্রেম ছড়া ছড়ি,
প্রেম লয়ে সবে করে কাড়া কাড়ি ;
'ধর প্রেম' বলি এদেয় উহারে,
তবু ছড়া ছড়ি, তবু জড়া জড়ি,
কলসে কলসে বিলায় প্রেমেরে,
অফুরন্ত প্রেম তবু না ফুরায়,
যতই বিলায় তত বাড়ি যায়।
মুরখ পণ্ডিত, যবন ব্রাহ্মণে,
সাধুকে দস্যুকে একই বন্ধনে,
বাঁধিল স্বর্গীয় পবিত্র প্রেম।
পাষাণ গলিল, লৌহ হলো হেম ॥
গাও বঙ্গ বাসি, প্রেমার্ণবে ভাসি,
জয় গোরাচাঁদ—প্রেম অবতার।
জয় নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র,
যাঁহো হতে বঙ্গে প্রেম প্রচার ॥

শ্রী(জ)—

(প্রাপ্ত।)

মুখরার প্রত্যুত্তর।

পাঠক! আমার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। ইহকালে লোক গঞ্জনা, পরকালে নরকযন্ত্রণা আমার অদৃষ্টের ফল। শত অশ্বমেধ পূর্ণ করিলেও ইহার অন্যথা হইবে না। বোধ করি আপনারা অদৃষ্ট মানেন না। আমি ও পূর্ব্বে মানিতাম না, এখন ঠেকিয়া শিখিয়া মানিতেছি। বাস্তবিক ঠেকা ঠেকির কারবার না হইলে আমরা কিছুই মানিতে চাই না; ইহা আমাদের মনেরই ধর্ম্ম, কি শিক্ষার ফল বলিতে পারি না। আপনাদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন দিন ঠেকিয়া থাকেন, তবে বোধ করি অদৃষ্ট মানিতে অস্বীকার করিবেন না।

আমি জানি, রমণীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, মান, সকলই স্বামী। স্বামী অপেক্ষা গৌরবের ধন আর কিছুই নাই। আজি সেই জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর নিন্দাবাদ করিয়া ইহকাল পরকাল খাইতে বসিলাম। আমি জানিয়া শুনিয়া কেন এমন কুকাজে প্রবৃত্ত হইলাম? ইহাও কি অদৃষ্টের লেখা নহে? অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই করিতে হইবে; যেহেতুক অ-
অখণ্ডনীয়।

পাঠক! আমি বড় মানুষের মেয়ে।

পিতামাতার সোহাগেই বাল্যকাল গত হইয়াছে; যৌবনে পতির গৌরবে গৌরবিণী ছিলাম। সকল কাল সমান যায় না; কাল চক্রের ঘুর্ণনে প্রৌঢ়াবস্থা উপস্থিত; এখন আমি গৃহিণীরোগ বলিয়া পাঠক সমাজে পরিচিত হইয়াছি। আমার জীবনের অদ্বিতীয় সহায় পরমবান্ধব স্বামীই ফাল্গুণ মাসের বান্ধবে আমার প্রতি এই বান্ধবতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একটি বৃহৎ মোকদ্দমা। পতি বাদী, পত্নী প্রতিবাদিনী; তায়দাদ জীবনের সুখ। সম্পাদক মহাশয় বিচারক হইয়া এক তরফাই মোকদ্দমায় ডিক্রী দিয়াছেন; আমার বর্ণনাও গ্রহণ করেন নাই। ইহা যে বিচারকের পক্ষে নিতান্ত অন্যায়, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমি নিরুপায় হইয়া পাঠকগণের নিকট খাস আপীল করিতেছি, যথাবিহিত বিচার বই আর কিছুই আমার প্রার্থনীয় নাই।

নিম্নবিচারক বলেন,- "পত্রপ্রেরক গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্যের কেহ হইবেন, না কোন প্রগল্‌ভস্বভাব সুচতুর যুবা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।' তবে এইতক বেশ বুঝাযায় যে তিনি স্বগৃহচরিত্র চিত্রিত করেন নাই।" এইটি বিচারকের বুঝিবার ভ্রম। বাস্তবিক আমার হৃদয়বল্লভ আরজিতে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন সকলই সত্য, একটি কথাও মিথ্যা নহে। আমিই সেই হতভাগিনী মুখরাকামিনী; আমিই জীবনের একমাত্র অবলম্বন সেই হৃদয়রঞ্জনের গৃহিণীরোগ।

পাঠক! এখন আপনাদের নিকট আমার বক্তব্য এই যে, রোগীর রোগ কি স্বতঃই জন্মে, না কোন অনিয়ম কার্য্যে জন্মায়? আমার প্রিয়ংবদ পতি স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে আমি প্রিয়ভাষিণী ছিলাম। তবে এখন চক্কানুবাদিনী হইলাম কেন? পূর্ব্বে ফুলটি ফলটি পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতাম।— এখন অলঙ্কারে লোভ কেন? পূর্ব্বে লজ্জাবতী লতার সহচরী ছিলাম।—এখন কুলাঙ্গনার উপাদেয় অলঙ্কার সেই লজ্জার তিরোভাব কেন? পূর্ব্বে আমার ক্রোধের ঝঙ্কারও বীণাধ্বনির ন্যায় প্রাণ মন কাড়িয়া লইত।— এখন মর্ম্ম বেদনা দেয় কেন? ইহার কি কিছুই কারণ নাই? বিনা কারণেই কি এই সকল রোগের উৎপত্তি হইয়াছে? কখনই না; অবশ্যই কারণ আছে। যখন কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিই নাই, তখন এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন কি অকারণ হওয়া সম্ভবে? পাঠকের নিকট আত্ম বিবরণ বিশেষ করিয়া না বলিলে ইহার কারণ পাইবেন না। তাই পূর্ব্ব ঘটনাবলী কিছু বিশদরূপে বলিতে হইল।

পাঠক জ্ঞাত আছেন অতি অল্প বয়সে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্বেই পিত্রালয়ে কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম। শ্বশুরালয়ে যাইয়া ক্রমশঃই সেই শিক্ষার উন্নতি হইল। তথায় জীবিতনাথ শিক্ষক, আমি শিষ্য ; এই শিক্ষা উপলক্ষে আমাদের অঙ্কুরিত প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল ; প্রণয়জাত ফলফুলের রমণীয় শোভায় আমরা একবারে আনন্দে আটখান হইলাম। তখন মনে করিয়াছিলাম সংসারে আমাদের ন্যায় সুখী অতি দুর্লভ। কিন্তু আমার পোড়া কপালে আগুণ লাগিয়া সেই অতুল সুখ ভস্মশেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব হইল না। প্রিয়তম আমার আধুনিক শিক্ষিত যুবা ; আমি প্রিয়তমের উপদেশে পৌত্তলিক ধর্ম্ম ছাড়িলাম, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়িলাম, কার্পেট বুনিতে শিখিলাম, বলিতে কি সাংসারিক কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একবারে বিবি সাজিয়া বসিলাম। হাতে টাকা নাই, তথাপি আমার সৌখীন স্বামী ধার কর্জ্জ করিয়া আমার জন্যে বিবিয়ানা পোষাক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, সুতরাং অতি সত্বরই দারিদ্র দশা উপস্থিত হইল।

পাঠক ! বলুন দেখি এই দোষ কি আমার ? আমি কি সাধ করিয়া বিবি সাজিয়াছি, না তিনিই সাজাইয়াছেন ? যদি তিনিই সাজাইয়া থাকেন, তবে আমি দোষী কিসে ? নিজে অপব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইলে কি সেই দোষ স্ত্রীর ঘাড়ে চাঁপাইয়া দেওয়া উচিত ? শোভানুভাবকতা সকলের মনেই আছে, এবং সকল প্রকারের ইচ্ছাই অভ্যাসে বৃদ্ধি পায়। এখন আর আমাদের সেই দিন নাই, পরিচ্ছদের আড়ম্বর চলে না ; তাই বলিয়া কি দুই খানা বাঙ্গালি গহেনাও পড়িব না ? আপনারা বলিবেন না পড়াই উচিত, আমিও বুঝি না পড়াই উচিত; কিন্তু অভ্যাস দোষ ত্যাগ করা সহজ কথা নয়। আমি ত্যাগ করিতে পারিব না। যিনি শোভানুভাবকতার উত্তেজনা করিয়া আমার মন আকুলিত করিয়াছেন, এখন আবার তিনিই পাপিনী বলিয়া তিরস্কার করেন। ধন্য পুরুষের মাহাত্ম্য !!

দিনে দিনেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। কিছুকাল পরে আমাদের প্রণয়ের পূর্ণাবস্থায় আমার প্রিয় সখার হৃদয় নব্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইল। তিনি পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যানুরোধে স্বকীয় গর্ভধারিণীর প্রতি পরুষাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন ; কথায় কথায় জননীকে পিতার পরিবার বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন।

আমিও আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ভাল রূপে শিখিয়া উঠিলাম। কাহার নিকট শিখিলাম তাহা আর বলিতে হইবে না; পাঠকগণ আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন। আমি আত্ম কর্ত্তব্য রক্ষার জন্যেই একবারে ঘরের গিন্নী হইয়া বসিলাম; কাজেই সময়ে সময়ে শাশুরীর প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ না করিয়া পারিতাম না। শাশুরী ঠাকুরাণী অপমান বোধে সংসার বিরাগিণী হইয়া কাশীবাসিনী হইলেন। পাঠকের যদি বুদ্ধি থাকে তবে বুঝিয়া লউন, এই বিষয়ে অপরাধ কার ?

সুশিক্ষিত পতির কৃপায় আমি যখন বুঝিতে পারিলাম যে, আমি একটি স্বাধীনরমণীরত্ন, তখনই পাড়ার নবীনা প্রবীণা সকলের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলাম। অশিক্ষিত কামিনী কুলের সহিত আলাপ করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা আমার শিক্ষিত শিক্ষকের মনে ভাল লাগিল না। আমি এই জন্য কিছুকিছু তিরস্কৃতাও হইলাম। (যেমন ফাল্গুণ মাসে হইয়াছি) তিনি কেবল দুই চারি কথা মন্দ বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; অপরিচিত, যুবকদিগের সঙ্গে আলাপ করিতে পরামর্শ দিলেন; যেহেতু যুবকগণ সভ্য সভ্য এবং তাঁহার বন্ধু। প্রথমতঃ আমি এই নির্লজ্জতার সোপানে পদার্পণ করিতে অস্বীকার করিলাম; তিনিও জিদ্ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে আমাকে স্বাধীনতা দিয়া প্রকৃত পরাধীনার মত ইচ্ছার বিপরীত কাজ করান তোমার উচিত নহে। এই কথায় তিনি চটিয়া উঠিলেন। অগত্যা আমাকে তাঁহার মতেই সম্মত হইতে হইল; অল্প দিনের মধ্যেই লজ্জার মাথা খাইয়া চতুরা নায়িকা হইলাম। তবে আবার এখন " লজ্জা, সৈকতভূমিতে ভাটার জলের মতন দেখিতে দেখিতে অপসারিত হইল " বলিয়া খেদ কেন ?

" দিন বায় থাকে না,,। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, প্রণয়ও পাঁকিয়া আসিল। পাঁকা প্রেমের কাঁচা উপকরণ অসুখেরই মূল। সুতরাং পাঁকা উপকরণ সামগ্রীর আবশ্যক হইল; বিনোদ নাগর প্রমোদের আড্ডায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিবার কালে নিয়তই একটি বোতল বাহ্নিনী-রস তরঙ্গিণী সঙ্গে করিয়া আনিতেন, উহাই নাকি প্রেমের পাঁকা উপকরণ। ছি ! ছি ! বলিতে লজ্জা হয়, রসরাজ গৃহে আসিয়া, আমার হাতে ধরিয়া, পায়ে পড়িয়া, আমাকে সেই সুধারস উৎসর্গ করিতেন। আমিও আর মানিনী রাই রঙ্গিণী নই, কাজেই প্রিয়তমের উপঢৌকন অবহেলা

করিতে পারিতাম না। দ্রব্য গুণে কি না হয়? সেই সুধারসের প্রবল শক্তিতে আমি আর আমাতে থাকিতাম না; প্রচণ্ডা চণ্ডী আসিয়া আমার আবির্ভূত হইতেন। ছাগমুণ্ড না হইলে চামুণ্ডার তৃপ্তি হয় না; নিশীথ সময়ে ছাগ ঘটানও দুষ্কর, বিশেষতঃ দরিদ্রের পক্ষে। সুতরাং পূজকই ছাগরূপী হইয়া সেই সময়ে চণ্ডী পূজা সমাধা করিতেন। ইহা পাঁকা প্রেমের পরিণাম। প্রেমিকবর এইক্ষণ তদুপলক্ষে দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিতান্ত অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

এই ত গেল প্রণয়ের দশম দশা। এখন প্রেমের পরিপাক শুনুন। আমি আগে জানিতাম না যে, আমার প্রণয়ের পুতুল রূপজ প্রণয়ে মুগ্ধ; আগে জানিতাম না যে,তাঁহার ভালবাসা গিল্‌টিকরা; আগে জানিতাম না যে পুরুষের হৃদয় এত কদর্য্য!! এখন সকলই জানিয়াছি। এখন আমি প্রৌঢ়া নারী। যৌবনের রূপ গলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ীর প্রণয়ও গলিয়াছে। একজন রসিক উপন্যাস লেখক বলেন, রূপজ মোহের নাকি ধর্ম্মই এইরূপ। এই রূপজ মোহ যদি শরীরী হইত,তবে আমি গণিয়া, গণিয়া অষ্টোত্তরশত ঝাঁটা মারিয়া উহাকে দেশত্যাগী করাইতাম। কিকরি! অশরীরীর প্রতি শাসন আমাদের সাধ্যের অতীত।

আমাদের এত সাধের প্রণয়ের পরিণাম শুনিয়া পাঠকগণ দুঃখিত হইবেন কি হাসিবেন জানিনা। দুইই আপনাদের ইচ্ছাধীন। আমি যখন বলিতে বসিয়াছি তখন না বলিয়া ক্ষান্ত হইব না।

আমার রূপের বাগান ভাঙিল; প্রেমের আদর ঘুচিল; ভালবাসা অদৃশ্য ভাবে অন্তর্দ্ধান হইল, এবং আমার রসময়ও দেখিতে দেখিতে ষট্‌পদ প্রকৃতি হইলেন। তাঁহার স্বভাবে কোন দোষ আছে কি না বলিতে পারি না। আমি তাঁহার বিষয়ে অন্ধ কেবল মধ্যে মধ্যে অলিরাজের পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন দেখিতাম। শরীরে কেতকী রেণু দেখিয়া বুঝিতাম যে, কেওয়া কাঁটার আঘাতেই এইদশা ঘটিয়াছে। স্মায়ংকালে পাশ্চাত্য প্রভাকরের সহিত তিনি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সহিয়া সহিয়া বিষম অন্তর্জ্বালায় পুড়িতেছি। আর সয়না; কাজেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া যতদূর পারি কটু বলি। এই সময়েই তিনি পলাতক ছাত্র, আমি গুরু মহাশয়; তিনি দস্যুকের আসামী, আমি হাকিম। এই সময়েই আমি চক্রানুবাদিনী এবং কাংস করতালনাদিনী হইয়া তাঁহার কর্ণপটাহ ব্যথিত করি। ভালবাসার সময়ে ইহা হইতে শতগুণ অধিক কটূ-

ক্তিও ত্রিতন্ত্রীর ঝঙ্কারের ন্যায় প্রাণ-মন হরিত । এখন সেই ভালবাসা নাই, সুতরাং আমার কণ্ঠ স্বরের সেই মনোহারিণী শক্তিও আর নাই । এখন আমার প্রত্যেক কথাই তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধহয় । হায় ! আমার ভাগ্যে যে এত হইবে তাহা ভ্রমেও ভাবি নাই । আমি অসহায়া অবলা ; পতি প্রতিকূল পথগামী ; পতিবশীকরণ মন্ত্র তন্ত্রও কিছু জানি না ; কেবল বিড়ম্বনাই আমার সার । পাঠক ! "আমার পরিত্রাণের অন্য কোন পন্থাই কি আর নাই ?"

জীবিত সর্ব্বস্ব ! আমার কথায় রাগ করিও না । আমি তোমার নিন্দা করি নাই । যাহা বলিয়াছি, উচিতই বলিয়াছি । লোকে বলে উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট ; পতি, পত্নীর নিকট দেবতুল্য ; সুতরাং আমি উচিত বলিলে তোমার রাগ করা সাজে না ।

প্রিয়তম ! আমায় যাহা ইচ্ছা বল । কিন্তু প্রেমের নিন্দা করিও না, প্রেমিকের নিন্দা করিও না, প্রেমিকার নিন্দা করিয়াও আমার দগ্ধহৃদয় আর জ্বালাইও না । প্রেমই সংসারের সার ; প্রীতিই নরলোকের সুখ । তোমার হৃদয় হইতে সেই সুখ অপসারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি সেই সুখের আশায় এক বারে জলাঞ্জলি দেই নাই । দেখি, পাঠকদিগের নিকট হইতে যদি কোন সদুপায় প্রাপ্ত হই,তবে আবার তোমায় প্রীতির কুসুমহারে সাজাইয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিব । তুমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর । আমার কুৎসা গানে তোমার সুখ বাড়িবে না ।

শ্রীমতী—(আর কি ?)—মুখরা ।

আমরা কিরূপ সভ্যতা অবলম্বন করিব ।

তৃতীয় প্রস্তাব ।

উপসংহার ।

আমাদিগের আচার,ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমুদয়ই প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার অনুযায়ী ; এমত অবস্থাতে অভিনব ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত সংস্রব হওয়াতে আমাদিগের কি দুর্গতি হইয়াছে, তাহা উপরি উক্ত শিরোনাম বিশিষ্ট পূর্ব্ব এক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে ।

এইক্ষণ আমাদিগের উপায় কি ? আমাদিগের সেই প্রাচীন শান্তিপ্রমুখ

বিশ্রামলিপ্সু সভ্যতা, সেই মৃদুল ভাব কি আমাদিগকে এই অবস্থা হইতে উ-দ্ধার করিতে পারিবে ? না আমাদিগকে সেই সভ্যতা ও সেই ভাব পরিত্যাগ করিয়া, অভিনব কীর্ত্তিপ্রমুখ শ্রমরত সভ্যতা ও তাহার তেজ ও উদ্যম এরূপ ভাবে শিক্ষা করিতে হইবে, যেন সেই তেজে তেজস্বী লোকদিগের সহিত জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে পরাস্ত হইতে না হয় ?

জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, তাহারা নূতন অবস্থাতে নিপতিত হইলে তদুপযোগী প্রকৃতি ও নূতন প্রকার বিপৎপাত হইলে তদুদ্ধার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। যে জাতির এই প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হয়, সেই জাতি অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া জগতে লুপ্ত হইয়া যায়। আমেরিকার আদিমবাসিগণ এইরূপে ইউরোপীয় লোকের সংশ্রববশতঃ তিরোহিত হইতেছে, অষ্ট্রেলীয়া প্রভৃতি ইংরেজ উপনিবেশ স্থানের পূর্ব্ব অধিবাসিগণও এই প্রকারে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

এইক্ষণ আমাদিগের সম্বন্ধে যে নূতন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, আমরা যদি তদনুসারে আমাদিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন না করি, তবে আমাদিগকেও লুপ্ত হইয়া যাইতে হইবে। এবং আমাদিগের দোষে হিন্দুজাতির নাম পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে, আর আমেরিকার আদিমবাসিদিগের সহিত আর্য্যজাতিও লুপ্তজাতি সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

এই হেতু যদিও আমরা সেই প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা অত্যন্ত ভাল বাসি, যদিও সেই দেবোচিত সভ্যতার মৃদু মধুর শোভাময় জ্যোতিঃ আমাদিগের মনে কবির কল্পনার ন্যায় জগদতীত ভাব বিশিষ্ট বোধহয়, তথাপি আমরা এইক্ষণ সম্পূর্ণ নূতন অবস্থাতে পতিত হইয়াছি বলিয়া, আমাদিগকে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইক্ষণকার অবস্থার উপযোগী অভিনব সভ্যতার উদ্যমপূর্ণ, আশান্বিত, এবং অদম্য তেজঃপুঞ্জ ভাব শিক্ষা করিতে হইবে।

আহার, ব্যবহার বেশ, ভূষা ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধন করিলেই যে, অভিনব সভ্যতা শিক্ষা করা হইল এরূপ নয়। কেবল কতকগুলি মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়াই আবশ্যক। বাহ্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন করিলে কোন সুফল উৎপন্ন হয় না, বরং জাতীয় বেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নজাতির রূপ ধারণ করিলে, আপনা হইতেই স্বজাতির লোপ করা হয়। আমাদিগের এই চাই যে, জাতীয় বিশেষ লক্ষণ ও ভাব গুলি পূর্ব্বের মতই থাকিবে, অথচ কতক

গুলি নূতন মানসিক গুণ শিক্ষা করিয়া ভিন্নজাতীয় : লোকের সহিত জীবন সংগ্রামে পরাস্ত না হইয়া জয়ী হইব।

প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে আমাদিগের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। এক, সন্তোষের পরিবর্ত্তে আমাদিগকে অসীম সাংসারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হইতে হইবে। আর, আততায়ী নিবারণ জন্য ক্ষমা ও ধৈর্য্যের পরিবর্ত্তে বৈর নির্য্যাতন প্রবৃত্তি শিক্ষা করিতে হইবে।

সন্তোষ পরমধর্ম্ম বলিয়া আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্র ও সমুদয় শিক্ষক শিক্ষা দিতেছেন। এই হেতু, আমরা যেমন কেন মন্দ অবস্থায় থাকি না, কোন মতে স্বল্পাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে পারিলেই শ্লাঘার বিষয় মনে করি। সেই অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় অধিরূঢ় হইবার ইচ্ছা প্রায় উদিত হয় না, উদিত হইলেও এমন বলবতী হয় না যে, আমাদিগকে তাহার জন্য অধিকতর চেষ্টাবান্ করিতে পারে। এই প্রকার ভাবই, এইক্ষণকার অবস্থা অনুসারে, আমাদিগের অধিকাংশ দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে। যদি ইউরোপীয় লোকের সহিত জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে তাহাদিগের যেমন সাংসারিক উন্নতির ইচ্ছা দেখিতে পাই, আমাদিগেরও সেই প্রকার আকাঙ্ক্ষা হওয়া আবশ্যক। অনন্ত সাংসারিক উন্নতির ইচ্ছা, যেন সকল ইচ্ছার উপর বলবতী হইয়া, মনের সকল ভাব, সকল তেজ, ও শরীরের সকল বল, তাহারই দিকে আকর্ষণ করে। যেমন উন্নত অবস্থা হইতে অধিকতর উন্নতিতে উত্থিত হইতে থাকিব, তেমনই যেন উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সকল মনুষ্যেরই অধিকার সমান। যে সকল উৎকৃষ্ট অবস্থাপন্ন লোক দেখিতে পাই, তাহাদিগের স্বাভাবিক ক্ষমতা কিছু আমাদিগের হইতে অসীমগুণে অধিক নয়। তবে আমাদিগের অবস্থা তাহাদিগের সাংসারিক অবস্থা হইতে এত অপকৃষ্ট থাকিবে কেন? কিরূপে আমাদিগের অবস্থাও সেই প্রকার করিতে পারিব, এই চিন্তা যখন মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে, যখন এই চিন্তায় আহার ও নিদ্রা, বিশ্রাম ও ব্যসন, কিছুই ভাল লাগিবে না; যখন এই উন্নতিকামনার বশবর্ত্তী হইয়া, আবশ্যক হইলে আহার নিদ্রা বিস্মরণপূর্ব্বক, অবিরত তাহার তৃপ্তিসাধন চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকিতে পারিব; যখন সেই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মুহূর্ত্তমধ্যে পরিবার, বন্ধু

বান্ধব ও গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলে জঙ্গলে প্রবেশ করিতে পারিব; অথবা সমুদ্র বা পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া দূরতর বিদেশে যাইতে পারিব; তখনই জানিলাম যে, আমাদিগের মনে সাংসারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আবশ্যক পরিমাণে বলবতী হইয়াছে। আর তখন আমাদিগকে মুখব্যাদান পূর্ব্বক নিরীহভাবে ইহা দেখিতে হইবে না যে, আমাদিগের স্বকীয় বসতিস্থলে বাহির হইতে লোক আসিয়া অশেষ সাংসারিক উন্নতি লাভ করিয়া যায়, আর আমরা চিরকাল তাহাদিগের দাসত্ব করিতে থাকি।

এই সাংসারিক উন্নতি প্রধানতঃ তিনটি বিষয় সম্পর্কে হওয়া আবশ্যক,—অর্থ, আধিপত্য, ও সম্মান। আমাদিগের জাতি প্রথম অবধিই অর্থের অপরিসীম অনাদর করিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগের কবিগণ অর্থের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। নীতিকারেরা অর্থ সকল অনর্থের মূল বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা নিন্দা বা তুচ্ছ করিয়া অর্থের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্পত্তি অর্জ্জনের প্রবৃত্তি যে মনুষ্য মনের একটি স্বাভাবিক ভাব তাহা সমূলে উৎপাটন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন। এই হেতু আমরা অর্থের এত অনাদর করি। সমধিক উৎসাহের সহিত অর্থ উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হই না, অথবা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে তাহা রক্ষা করিতে জানি না। অর্থের প্রতি আমাদিগের মমতা নাই। আমরা সম্পদকে তুচ্ছ করিতে শিক্ষা করিয়াছি, সুতরাং সম্পদও আমাদিগকে তুচ্ছ করিয়া দূরে গমন করে। ইহারই ফল স্বরূপ আমাদিগকে এইক্ষণ জাতীয় হীনতার অসহনীয় দুর্ভোগ ভোগিতে হইতেছে।

শ্রমই মনুষ্যের সকল প্রকার আবশ্যক সামগ্রী উপার্জ্জনের একমাত্র উপায়। শ্রমের বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে শ্রম সঞ্চয় করা হয়, এবং সেই পরিমাণে আবশ্যক সামগ্রী প্রাপণের ক্ষমতা জন্মে। এই ক্ষমতা মূলধনরূপে ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য চালাইতে পারা যায়। কোন দেশের জাতীয় ক্ষমতা সেই দেশের লোকের সঞ্চিত মূলধন সমষ্টির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। আর জাতীয় ক্ষমতা বা পরাক্রম না থাকিলে, সকল প্রকার উন্নতিই বৃথা। কারণ তাহা হইলে অন্য জাতির অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তাহাদিগের দাসত্ব করিতে হয়।

সাংসারিক উন্নতির আর এক

প্রধান অঙ্গ সামাজিক আধিপত্য। অপরসকললোকে বশীভূত থাকিবে, এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যের সাহায্য আবশ্যক হইলে তাহারা কর্ত্তব্যজ্ঞানে সেই সাহায্য প্রদান করিবে, সম্পদের পর ইহাই প্রধান সাংসারিক উন্নতি। আমরা নির্ব্বিবাদে থাকিতেই ভালবাসি। সাংসারিক বিষয়ে অন্যের সহিত সংস্রব আমাদিগের বিরক্তিজনক বোধ হয়। আমরা আধিপত্য অপেক্ষা নির্ভর করিতে পারিলেই অপার সুখে সুখী হই। এই হেতু আমরা কেহই এই আধিপত্য উপার্জ্জন করিতে, এই প্রভুর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে পারি না; অথবা উদ্বেগের ভয়ে তাহা ইচ্ছাও করি না। কিন্তু অভিনব পাশ্চাত্য সভ্যতায় দীক্ষিত ইয়োরোপীয়েরা এবিষয়ে কেমন সুনিপুণ, তাহা আমরা সচরাচরই দেখিতে পাই। তাঁহাদিগের সেই আধিপত্যপ্রিয়তা সর্ব্বদাই আমাদিগকে বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে হয়।

লোকের উপকার বা অপকার করিবার ক্ষমতা এই আধিপত্য উপার্জ্জনের প্রধান উপায়। সৎ ও বুদ্ধিমান্ লোকেরা উপকারের আশায়, এবং অসৎ ও অজ্ঞ লোকেরা অপকারের ভয়ে, আপনা হইতে প্রভুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকের সহিত যোগ দিয়া থাকে। সুতরাং উপকার ও অপকার করিবার ক্ষমতা জন্মিলে আপনা হইতেই সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অপকার করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে দস্যু হইলাম, এমত নহে। যদি সেইরূপ ক্ষমতা থাকে, আর লোকে জানে যে তাহা আছে, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। মনুষ্য সংহার করিবার জন্য যে রাজার অধিক সৈন্য, এবং দুর্গ ও জনপদ ভূমিসাৎ করিবার জন্য যাঁহার অধিক তোপ থাকে, তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধ না করিলেও, সমুদয় রাজার উপর রাজচক্রবর্ত্তী।

সম্মান উপার্জ্জন করা সাংসারিক উন্নতিসাধনের তৃতীয় অঙ্গ। সাংসারিক বিষয়সম্পর্কে এই সম্মান অনেক প্রকার হইয়া থাকে। অমুক ব্যক্তি ভৃত্য সম্পর্কে অতি উত্তম প্রভু। অমুকে দেনা পাওনা এবং ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে অতিশয় ন্যায়বান্। ইনি অতি বিজ্ঞ বা কর্ম্মক্ষম, ইত্যাদি সমুদয় কথাই সাংসারিকসম্মানসূচক। সকল প্রকার সম্মানের মূল ন্যায় ও ক্ষমতা। ন্যায়সংগত ব্যবহার, এবং সাধারণে যে কার্য্য করিতে অক্ষম, তাহা সম্পাদন করিবার উপযোগি বুদ্ধি বা বল থাকিলে, যেমন লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারা যায়, এমন আর কিছুই হয় না। সুতরাং, বিজ্ঞতা,

দক্ষতা, নিপুণতা, ও সর্ব্বোপরি সদ্বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা ইত্যাদি গুণ যেমন সম্মানবর্দ্ধক ; সেইরূপ, মূর্খতা, দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, নীচাশয়তা, মিথ্যাবাদিতা ইত্যাদি দোষ সম্মাননাশক।

অভিনব ইয়োরোপীয় সভ্যতা হইতে যে দ্বিতীয় গুণটি আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, তাহার নাম বৈরনির্য্যাতনপ্রবৃত্তি।

এই জগৎ একটি প্রশস্ত সমরক্ষেত্র। সকল প্রকার প্রাণীর মধ্যেই প্রবল জীবনসংগ্রাম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। যেখানে প্রাণিগণের ব্যবহার্য্য আবশ্যকীয় সামগ্রীর পরিমাণ অল্প, সেখানে দুর্ব্বল ও মৃদুপ্রকৃতিবিশিষ্ট প্রাণিগণ, সবল ও পরাক্রমশালিদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, সম্যক্ প্রকারে আপনাদিগের অভাব পরিপূরণ করিতে পারে না, এবং স্বকীয় পরিশ্রমে বা কলে কৌশলে যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাও সবলের আক্রমণহইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়না। সুতরাং দুর্ব্বলদিগকে ক্রমে অধিকতর নিস্তেজ হইয়া অবশেষে একবারে লোপ প্রাপ্ত হইতে হয়। সবলেরা ক্রমেই অধিক পরাক্রমশালী হইয়া সমুদয় অধিকার করিয়া বসে।

এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, উদ্ভিজ ও প্রাণিসম্পর্কে প্রকৃতির এই নিয়ম যে, বিভিন্নজাতি অথবা প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ ও প্রাণির মধ্যে প্রখর জীবন সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়া, প্রকৃতি তাহাদিগের মধ্যে যাহারা তেজস্বী, সক্ষম ও সবল, তৎসমুদয়কে নির্ব্বাচন করিয়া লন, ও তাহারাই প্রকৃতির ভোগ্য সামগ্রী উপভোগ করিতে থাকে। দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও হীনবীর্য্যেরা, সেই সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া, বিনষ্ট হইয়া যায়।

কোন ভূমিখণ্ড কতক কাল পতিত রাখিলে, দেখা যাইবে তাহাতে নানা জাতীয় উদ্ভিজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবে, কোন কোন উদ্ভিজ সেই সংকীর্ণ স্থানের অধিকাংশ রস আকর্ষণ করিয়া সতেজ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে ; কতকগুলি পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে ; কতকগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আর কতক দিন পরে দেখা যাইবে, দুর্ব্বল গুলি ক্রমে মরিয়া গিয়াছে, আর তেজস্বী তরুগুল্মচয় সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এইরূপে সুন্দর ও গজারি প্রভৃতি বনে, অন্যান্য জাতীয় বৃক্ষ সকল ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়াতে, সেই সেই স্থানের জল, বায়ু, মৃত্তিকা, ও উত্তাপবিধান অনুসারে যে যে জাতি অধিক ক্ষমতাবান্ তাহারাই সমস্ত প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া থাকে।

পুষ্করিণীতে অনেক জাতীয় মৎস্য ছাড়িয়া দিলে, দুর্ব্বলেরা আহারীয় বস্তু সম্যক্ পরিমাণে অধিকার করিতে না পারিয়া, অথবা সবল জাতি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া ক্রমে তিরোহিত হয়। অবশেষে কেবল সবলেরাই জীবিত থাকে।

মনুষ্যসমাজেও প্রকৃতির এই নিয়ম অপ্রতিহতভাবে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। যতগুলি ছাত্র শিশুকালে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাহার মধ্যে অল্প কয়েকটিমাত্র বিদ্যালয়ের পাঠ্য সমাপন করিয়া সুশিক্ষিত অবস্থায় সংসারে প্রবেশ করিতে পারে। অধিকাংশ ছাত্র বহুবিধ কারণে দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়া তাহাদিগের সমানে চলিতে পারে না, এবং পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রভৃতি ছাত্রের অবলম্বনীয় যে সকল সহায় আছে তাহা প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয় না।

সংসারে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বা পথ যতগুলি উন্মুক্ত আছে, তৎসমুদয় অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষী লোকের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক। কেবল নিতান্ত আবশ্যক সামগ্রী গুলি পাইলেই সন্তুষ্ট থাকা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। সকলেরই আকাঙ্ক্ষা অসীম। এই হেতু চাকুরি, বাণিজ্য, শিল্পব্যবসায়, জমীদারি প্রভৃতি উপার্জ্জনের পথগুলি অধিকার করিবার জন্য সকল লোকেই ব্যগ্র ও চেষ্টান্বিত। ইহাতে যাঁহারা সক্ষম, সুচতুর এবং পরিশ্রমী,— অর্থাৎ ঐ সকল পথ অধিকার করিবার উপযোগি গুণবিশিষ্ট, তাঁহারাই কৃতকার্য্য হইয়া পুষ্ট ও সতেজ হইয়া উঠেন। যাহারা সে সমুদয় গুণ উপযুক্ত পরিমাণে ধারণ করে না, তাহারা অকৃতকার্য্য হয়, অথবা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহাও অন্যে কাড়িয়া লয়।

পৃথিবীস্থ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্য সম্পর্কেও ইহাই জয় পরাজয় এবং অস্তিত্ব ও লয়ের চিরন্তন বিধি। সকলস্থানেই সবল জাতীয়েরা দুর্ব্বল জাতিদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের দাস বানাইয়া রাখে। অতএব সর্ব্বত্রই প্রকৃতির এই সরল ও সহজবোধ্য নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে "সবলের জয় ও দুর্ব্বলের ক্ষয়"। সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নীতিকারেরা যে প্রকার ধর্ম্মনীতিই কেন প্রচার করুন না; বিবেক, বৈরাগ্য, সত্য, প্রেম ইত্যাদি উচ্চভাবের কথা যতই কেন বলুন না; সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিই সেই সবল ও দুর্ব্বলঘটিত নিয়মের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। আমাদিগের প্রাচীনেরা "বলং বলং বাহুবলং", "যার লাঠি

তার মাটি ,, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এই নিয়মের ব্যাখ্যা করিতেন। ইংরেজ লেখকগণ ইহার কথা অনেক লিখিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় একটি পুরাতন জনপ্রবাদ এই স্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

সরল সুন্দর এই প্রাচীন নিয়ম।
সেই নেয়,সেই রাখে, যেজন সক্ষম॥*

এইক্ষণ বিচার্য্য এই,আমরা কিরূপে সবলও তেজস্বী হইতে পারি। আমাদিগের দেশীয় লোকদিগের মনে এই একটি ভ্রান্তি আছে যে,আমরা খর্ব্বাকৃতি ও কৃশাঙ্গ, এবং আমাদিগের দেশ গ্রীষ্ম প্রধান; এই সকল কারণে আমরা কখনই সবল হইতে পারিব না। এই বিশ্বাসটি যেমন অপকারী,তেমনই ভ্রান্তিমূলক। শরীর ও মনের এমন দৃঢ় সম্বন্ধ যে, একের প্রকৃতি অনুসারে অন্যে কার্য্য না করিয়া পারে না। মনের উপর শরীরের যে প্রকার অধিকার, শরীরের উপর মনের তাহা হইতে শতগুণ অধিক ক্ষমতা। শরীর যেমন কেন হউক না, মনে তেজ থাকিলে মনুষ্য অবশ্যই বীরপ্রকৃতি হয়। আমরা সচরাচর অনেক ক্ষমতাশালী লোক দেখিতে পাই; তাঁহাদিগের শরীর অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল, কিন্তু মনের তেজ বশতঃ তাঁহারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। মাতঙ্গসদৃশ বৃহদায়তন লোক তাহাদিগের নিকট ভয়ে কম্পমান হয়।

মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালিদিগের ন্যায় কৃশ ও খর্ব্বাঙ্গ; কিন্তু শিবাজি ভারতবর্ষকে হিন্দুশাসনাধীন করিবার জন্য যে তেজ সেই জাতির মনে প্রবিষ্ট করিয়া দেন, সেই তেজে তাহারা এক শত বৎসরের মধ্যে প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন রোমানেরা উত্তর ইয়োরোপীয়দিগের অপেক্ষা উষ্ণতরদেশে বাস করিয়াও তাহাদিগকে অধীনস্থ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে যাইয়া সেই রোমান রাজ্যের অধিকাংশ করতলস্থ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সমুদয় সামরিক ব্যাপারই গ্রীষ্মপ্রধানদেশের লোক দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। এই সমুদয় দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দুর্ব্বলশরীর ও গ্রীষ্মপ্রধানদেশে বাস করা, পরাক্রমশালী হওয়ার পক্ষে অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক নয়।

অতএব, আমাদিগের সবল ও পরাক্রমশালী হইতে হইলে কেবল মানসিক তেজ উপচয় করা আবশ্যক। আমরা দুর্ব্বলপ্রকৃতি ও ভীরু, এই নিমিত্ত আমরা ক্রমে রসাতলে যাইতেছি। সবলপ্রকৃতিও সাহসী হইলে

* The good old rule, the simple plan,
For him to take and keep, who can.

আমাদিগের এই শরীর হইতেই সিংহের বল প্রদর্শিত হইতে পারে। বস্তুতঃ অন্যান্য উচ্চ কল্পের পৌরুষপ্রবৃত্তির সহিত বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে; মানসিক তেজ ও সাহস আপনা হইতেই জন্মে। এই বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তিই সমুদয় মানসিক বল, সাহস ও তেজ উন্মুক্ত করিবার কুঞ্চিকা স্বরূপ।

কোন ব্যক্তি অনর্থক আসিয়া নিজের কিংবা নিজ পরিবারের, অথবা নিজ বাসস্থান কি স্বদেশের অহিত করিলে, তাহাকে, অথবা অন্য কারণে যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে শত্রু হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে যে পরাভব করিয়া নিবারণ করিতে হয়, বঙ্গদেশবাসি ভিন্ন অন্য কোন জাতিকেই এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক হয় না। যদিও সকল দেশের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষকেরা "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ ক্ষমৈকা শক্তিরুত্তমা" "লোকে এক পার্শ্বে আঘাত করিলে তাহাকে অন্য পার্শ্ব ফিরাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য" "শত্রুর প্রতিও প্রিয় ব্যবহার করিবে" ইত্যাদি নীতি চিরকাল শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন; তথাপি, এই সমস্ত নীতি স্বর্গীয়ভাব বিশিষ্ট ও দেব প্রকৃতির উপযোগী বলিয়া, মনুষ্য সমাজে বিশেষ আদরণীয় হয় নাই। লোকে কখনও তৎসমুদয়কে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয় না। এই সমস্ত নীতি মানব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিতান্ত অস্বাভাবিক। ইংরেজেরা খ্রীষ্টীয়ান এবং অহিংসা ও ক্ষমা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ, অথচ সাংসারিককার্য্যকুশল ইংরেজেরা এইরূপ নীতি কি পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা যদি কেহ না জানেন, তবে পথে একজন ইংরেজকে একটি ধাক্কা দিয়া; অথবা তাহার কুক্কুরটি আক্রমণ করিতে আসিলে সেই কুক্কুরকে একটি ঢিল মারিয়া; কিংবা কোন ইংরেজের বাগানের একটি ফুল ছিঁড়িয়া; পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, ইংরেজেরা এইরূপ অবস্থাতে কি প্রকার ব্যবহার করেন। তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ বিষয়ে কি প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকেন, এই সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয় দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল বঙ্গদেশবাসীরাই প্রাগুক্ত নীতি অনেক দূর কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। আমরা পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছি, অনর্থক কোন ব্যক্তি আমাদিগকে গালি দিল; —অথবা অন্য এক ব্যক্তি সেই পথে আসিতেছেন, দূর হইতে তাঁহাকে

দেখিয়া কেন রাস্তার এক পার্শে সরিয়া গেলাম না, এই নিমিত্ত তিনি বিলক্ষণ রূপে চাবুক দিয়া প্রহার করিলেন;—কাহারও পুত্র ক্রীড়া উপলক্ষে আমাদিগের বাড়ীর দিকে ঢিল ফেলিতেছে, এই কথা নিতান্ত বিনয়সহকারে তাঁহার নিকট বলিয়া পাঠাইলাম, তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেন, এবং ছেলের ঢিল নিক্ষেপের বিষয় নালিশ করা কেমন ধৃষ্টতা, এই বিষয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলকেই উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া গেলেন;-কোন ব্যক্তি পৈত্রিক তালুক খানি বলে দখল করিয়া তাহাতে নীল বোনাইলেন;—বিবাহের সময় বাটীতে বাদ্য হইতেছে, তাহা শুনিয়া কোন ব্যক্তির নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে তিনি পর দিবস উপদ্রবকারী বলিয়া জেলে নিক্ষেপ করিলেন;—কোন ব্যক্তি শীকার করিতে গ্রামে আসিয়া একটি গাভী বধ করিলেন, তাহা বলিতে গেলাম বলিয়া তিনি গ্রামখানিতে অগ্নি লাগাইয়া দিলেন ও গুলি করিয়া এক ব্যক্তিকে আহত করিলেন;—কিংবা শত পরিশ্রমে যে বিষয় উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়াছি, অন্যে বলে বা ছলে আমাদিগের হাত হইতে সেই গ্রাস কাড়িয়া লইলেন;— এই প্রকার ঘটনা বাঙ্গালির সম্পর্কে সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলেই আমরা সংসারের অনিত্যতা, মনুষ্যের আশা, মান, সম্ভ্রম ও সম্পদের ক্ষণভঙ্গুরতা ইত্যাদি যোগতত্ত্ব চিন্তা করিতে থাকি। আমাদিগের মনে হয়, গঙ্গা দিয়া যে সকল মাঝিরা অশ্লীল গান গাইয়া নৌকা বাহিয়া যায়, তাহারা গঙ্গার জল কলঙ্কিত করিতে পারে না। অথবা বন্ধু বান্ধব লইয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত পরামর্শ করিতে থাকি, এই রূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে ঐরূপ হইবে, ঐরূপ করিয়া যদি সফল না হওয়া যায় তবে এই আশঙ্কা, ইত্যাদি আলোচনাতেই প্রায় উদ্দেশ্য লীন হইয়া যায়। নিতান্ত অধিক হইলে ফৌজদারীতে দরখাস্ত করিতে যাই; আর বলি, দেখা যাউক এই মোকদ্দমটার কি হয়, তার পর আদালতে ডামিসের অভিযোগ করিব।

বাঙ্গালিদিগের ব্যবহার এইরূপ। অন্য কোন জাতীয় লোকের সম্পর্কে এইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইলে, ইহার প্রত্যেক বিষয়ে তখন তখনই রক্তারক্তি হইয়া যায়। তাঁহারা প্রথমতঃ অপমান বা ক্ষতির প্রতিশোধ দেন এবং কি করিলে কি হয় তৎপর তাহা চিন্তা করেন।

এইক্ষণ দেখ, বৈরনির্য্যাতন শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। যখন অন্য লোকে দেখিবে যে, আমাদিগের

একগুণ ক্ষতি বা অপমান করিলে দশ গুণ সহ্য করিতে হয়, তখন আর কেহ আমাদিগের অনিষ্ট করিতে আসিবে না। যদি অদ্য একগুণ ক্ষতি হইলে, তাহার প্রতিশোধ চেষ্টায় দ্বিগুণ ক্ষতি হইবে এই ভয়ে প্রতিশোধ চেষ্টা না করি, তবে আমাদিগের শত্রুরা কল্য উৎসাহিত হইয়া চতুর্গুণ ক্ষতি করিবে। কিন্তু যদি একগুণ ক্ষতি হইলে তাহার উপর দশগুণ ক্ষতি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও আমরা তাহার প্রতিশোধ লইতে পারি, তাহা হইলে আর কোন দিন আমাদিগকে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে না। ধন, মান, যশ স্ত্রী,পুত্র, পরিবার প্রভৃতি সংসারের প্রার্থনীয় বিষয় গুলি রক্ষা করিতে, জীবন দান পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত না হইলে তৎ সমুদয় রক্ষা বা সুখে উপভোগ করা যায় না। যিনি জীবনের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদাই আততায়ী হইতে পলায়ন করেন, সকলেই তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়ার সুযোগ পায়। তাঁহার যাহা কিছু সাংসারিক ভোগ্য বিষয় থাকে, তাহা কেবল অন্যে অনুগ্রহ করিয়া নেয় না বলিয়া।

এই সকল কারণে বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি অতীব প্রয়োজনীয় গুণ। হিন্দু শাস্ত্র মতে শত্রুদমন একটি প্রধানধর্ম্ম। অন্য প্রদেশীয় হিন্দুদিগের মধ্যে এইক্ষণও শত্রু নিপাতন হেতু এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে যে, যতদিন শত্রুকে দমন করিতে না পারিব, ততদিন নখ, শ্মশ্রু কেশ ছেদন করিব না, কিংবা তত দিন এক সন্ধ্যা আহার বা ভূমিতে শয়ন করিব, ইত্যাদি।

বাঙ্গালিদিগের মধ্যে এই প্রথা এককালে লুপ্ত হইয়াছে। চীৎকার করিয়া নালিস করাই আমাদিগের মধ্যে এইক্ষণ পরম ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। কিন্তু সকল দেশেরই সামাজিক নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি এক ঘা খাইয়া অমনি দশ ঘা দিতে পারেন,তিনি সম্পূর্ণ পুরুষকার সম্পন্ন লোক বলিয়া পরিগণিত হন। যিনি তখনই আঘাত প্রত্যর্পণ করিতে না পারিয়া ভবিষ্যতে প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, তাঁহার অর্দ্ধ পুরুষকার। আর যিনি প্রহার খাইয়া মা রে বাপ রে বলিয়া চীৎকার করেন, তিনি কাপুরুষ। (শ্রীদী—)

ভেড়া বানান।

যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ নিতান্ত চঞ্চল স্বভাব থাকেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি এই প্রস্তাবের শিরোনাম দেখিয়াই হাসিয়া উঠিবেন। কিন্তু তাদৃশ শফরীহৃদয় চলচিত্ত পাঠককে আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, যাহার ধৈর্য্য নাই, সে কখনও শিক্ষা লাভে অধিকারী নহে। পিথাগোরস তদীয় শিষ্যবর্গকে পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল মৌনী থাকিতে বাধ্য করিতেন। আমার পাঠকবর্গ পাঁচ মিনিট কাল মৌনমুক্ত থাকিলেই আমি যথেষ্ট মনে করিব। বৃদ্ধ জ্ঞানানন্দ শর্ম্মার কবিত্ব শক্তি নাই। কবিচিত্তহারিণী কল্পনা দেবী কোন সময়েই তাহার প্রতি কৃপান্বিত নহেন। সে যাহা কিছু লিখে, সমস্তই পরীক্ষার কথা। না দেখিয়া, ও না শুনিয়া, এবং ভাল রূপ পরীক্ষা না করিয়া, সে কিছুই বর্ণবদ্ধ করে না। যাঁহারা পরীক্ষিত তত্ত্বে উপদিষ্ট হইয়া সংসারে নিরাপদ হইতে অভিলাষী হন, তাঁহারা তাহার কথা শ্রবণ করুন।

এদেশীয় অতি প্রাচীন লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে কামাখ্যার কিঞ্চিৎ উত্তরে স্ত্রীপাট নামে একটি রমণীয়রাজ্য ছিল। স্ত্রীলোকেরাই তথায় সর্ব্ব বিষয়ে অবিসংবাদিত আধিপত্য করিতেন। তাঁহারা শস্ত্র, শাস্ত্র, শিল্প ও সংগীত প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুনিপুণ ছিলেন। কিন্তু এই সমুদয় বিদ্যার উপর এমন একটি অদ্ভুত ও অলৌকিক বিদ্যা তাঁহাদিগের আয়ত্ত ছিল যে, নাম শুনিলেই প্রাণ চমকিয়া উঠে। তাঁহারা কি এক মোহিনী জানিতেন, যে কোন দেশের যে কোন পুরুষ তাঁহাদিগের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইত, সেই তৎক্ষণাৎ ভেড়া বনিয়া যাইত। সে যত কেন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হউক না, একবার দর্শন পাইলেই তাহাকে তাঁহারা ভেড়া বানাইয়া, গলায় শিকল দিয়া, দ্বার দেশে বান্ধিয়া রাখিতেন। শুনা যায়, বহুজ্ঞ পর্য্যটকেরা যথেচ্ছাক্রমে ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়া আসিলেও, কামাখ্যার উত্তরে যাইবার কথা হইলেই সকলে ভয়ে থর থর হইতেন।

নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এই কাহিনীটিকে তান্ত্রিকের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। পরের কথা বলিব কি, আমারও ইহাতে বিশ্বাস

হয় না। যাহা নিসর্গ-বিরুদ্ধ, তাহা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে কত শত লোক কত জনের নিকট কত ভাবে ভেড়া বনিতেছে, বোধ হয় তাহা দেখাইয়া দিলে সকলেই চক্ষু মেলিয়া দেখিবেন। কারণ এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কাহাকে কোথায়ও যাইতে হইবে না এবং কোন প্রকার ক্লেশ স্বীকারেরও আবশ্যকতা থাকিবে না। ঘরে বসিয়াই সকলে সকল কথার আমূল পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন।

কার্য্যকুশল চতুর লোকেরা অসাবধান মনুষ্যদিগকে ভেড়া বানাইবার জন্য যে সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার একটির নাম স্তুতি। সদ্‌গুণের জন্য সরল প্রশংসা এবং মন্ত্রময়ী স্তুতি এক পদার্থ নহে। অমায়িক প্রশংসা বাক্যে হৃদয় উৎফুল্ল হয়, এই মাত্র। কিন্তু মায়াময় স্তুতিবাদে আত্মার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ সঞ্চরণ করে। উহার মর্ম্মস্পর্শিনী শক্তির নিকট বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্দ্ধন, সকলেই একদণ্ডে ভেড়া বনিয়া যায়। ভবসংসারে কোন স্থলই উহার অগম্য নহে। জীবিত মনুষ্যের আর কথা কি, যাঁহার করপদ নিস্পন্দ হইয়াছে, শরীর হিমবৎ শীতল হইয়া গিয়াছে এবং তনুত্যাগের আর ক্ষণ কালও বিলম্ব নাই, ঈদৃশী স্তুতির হৃদয়হারি কলনিস্বন সেই মরণোন্মুখ ব্যক্তিকেও একবার সেই মৃতকল্প দেহে ফিরাইয়া আনে, এবং তাহার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লয়। কত লোকে, মরিবার সময়ও ভেড়া বনিয়া, পুত্র কন্যা কিংবা প্রকৃত আত্মীয় ব্যক্তিদিগকে বঞ্চনা করে, এবং উইল বলিয়া কথিত কি একটা লিখিয়া পরকে সর্ব্বস্ব দিয়া যায়, তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

দুই একটি লোক বড় অভিমানী। অভিমানিনী রূপসীরা যেরূপ পরের মুখে রূপের প্রশংসা শুনিয়া গলিয়া পড়েন না, নয়ন সন্নিহিত দর্পণ খানির নীরব স্তুতিতেই পরিতৃপ্ত থাকেন; গুণ গরিমান্বিত অভিমানী পুরুষেরা ও কেহ কেহ সেইরূপ পরমুখনিঃসৃত প্রশংসা বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া নিজহৃদয়ের নিঃশব্দ স্তাবকতাতেই বিমোহিত রহেন। এইরূপ লোককে ভেড়া বানান আপাততঃ একটু কঠিন বোধ হয়। কিন্তু ইহাও বাস্তব কঠিন নহে। অতুলকীর্ত্তি জুলিয়স সিজরের এই প্রকার অভিমান ছিল। তিনি আপনাকে স্তুতির অস্পৃশ্য মনে করিতেন, এবং কাহারও কথায় স্তাবকতার গন্ধ মাত্র পাইলেই জ্বলিয়া উঠিতেন। কতিপয় সুবোধ লোক ইহা দেখিয়া শুনিয়া

তাঁহার মনের এমন কোন স্থান স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপ্রয়োগ করিল যে, তিনি আর ঠিক্ রহিতে পারিলেন না। তাহারা একদিন তাঁহার নিকটে গিয়া অতিগম্ভীর ভাবে বলিল; 'মহাত্মন্! সিজর যে স্তুতির বশ্য নহে, তাহা আমরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছি, এবং সমুদয় সংসারই ইহা জানে। কিন্তু সিজরের নিকট ন্যায়ের অনুরোধ ও যে গ্রাহ্য হয় না, ইহা আমরা জানি তামনা।' কথকের কথা ফলবতী হইল, দুর্ব্বার পুরুষসিংহ সেইদিন প্রথম ভেড়া বনিলেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ অস্ত্র যাঁহার বর্ম্মভেদ করিতে পারে নাই, মুখের কথা তাঁহার মর্ম্মভেদ করিল। কারুণ্যশূন্য, কোমলতাশূন্য এবং সর্ব্ব প্রকার সদনুরাগশূন্য রবিস্পীয়ররকে কেহ নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম বলিলে, তিনি অমনি ঢলিয়া পড়িতেন। রুসিয়ু সমস্ত ফ্রান্সকে নাচাইয়া ভুলিয়া, আপনি আবার পরের হস্তে কিরূপ নৃত্য করিতেন, তাহা কে না জানেন? কিন্তু সংসারে সকলে কিছু ইহাঁদিগের মত অসামান্য পুরুষ নহে। সামান্যলোকদিগের জন্য সামান্য প্রক্রিয়াই কার্য্যসাধিকা হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ চাও ত যেখানে ইচ্ছা সেখানে দুদণ্ড নিবিষ্ট হইয়া উপবেশন কর, স্বচক্ষেই শত শত দৃষ্টান্ত দর্শন করিতে সমর্থ হইবে।

হাকিম হুকুমের জোরে গরম হইয়া বসিয়া আছেন। চতুর্দ্দিক নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন ঘন ঘন চক্ষু আবর্ত্তন করে, আর ঘন ঘন নাসিকার গর্জ্জন করিয়া সকলের আতঙ্ক জন্মায়, তিনি ও সেইরূপ করিতেছেন, এবং কি এক বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিধাতার সুন্দর সৃষ্টিতে কলঙ্ক দিতেছেন। এমন সময় উকীলনামা একজন মন্ত্রব্যবসায়ী ধীরে ধীরে তথায় প্রবেশ করিল। সে ধীরে ধীরে করে কর যোজন করিয়া একবার ধর্ম্মাবতার, আর বার হুজুর, পুনশ্চ মহারাজ ইত্যাদি কয়েকটি মোহন মন্ত্র উচ্চারণ করিল। কে বলে যে মণিমন্ত্রমহৌষধির গা হাত্ম্য নাই? ঐ যে মহাপুরুষ ক্ষণ পূর্ব্বে ভয়ঙ্করদৃশ্য ছিলেন, চাহিয়া দেখ, মন্ত্র প্রয়োগ হইতে না হইতেই তিনি তাহার কাছে অশ্বের মত ভেড়ায়িত হইয়াছেন। গ্রাম্য জমিদার, মফঃস্বলের নায়েব, দূরস্থিত ষ্টেশনের দারোগা মহাশয়, পাড়ার মোড়ল, আখড়ার মোহন্ত, নূতন ভদ্রলোক, হঠাৎবাবু, আফিশের কেরাণী, ঘরের গৃহিণী, সভার বক্তা, সভ্যসমাজের নব্য সাধু, সকলেরই এই অবস্থা। প্রভেদ এই, কেহ এক মন্ত্রে, কেহ আর একমন্ত্রে। কাহার ও সামান্য আবাস ভবনটিকে প্রাসাদ বলিতে হয়; কাহার ও তুচ্ছ

পোষা ছেলেটিকে ছোট বাবু বলিয়া ডাকিতে হয়; কেহ সাড়ে তেরবৎসর যাবৎ ভদ্র লোক হইয়াছেন, তাঁহার বাপের নাম তিতুদাস, তাঁহাকে এইক্ষণ রায় চৌধুরী লিখিতে হয়; কেহ তান সেনের মুণ্ড চর্ব্বন করিয়া গর্দ্দভ রাগিণীতে ছাই ভস্ম কি গাইয়া থাকেন, তাঁহার তান ও উপজ ধরিবার সময় একটুকু নাকিস্বরে কান্দিতে হয়; কেহ বা দুধের গন্ধ যাইতে না যাইতেই বিদ্যা ব্রহ্মণ্যে জলাঞ্জলি দিয়া, কি বকিয়া বকিয়া প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাকে সম্বক্তা বলিয়া নমস্কার করিতে হয়, ইত্যাদি।

মনুষ্যকে ভেড়া বানাইবার আর এক মহামন্ত্র, বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন এক আশ্চর্য্য পদার্থ, এবং ইহার ক্ষমতা বস্তুতঃই ইন্দ্রজালবৎ। সুসভ্যসমাজের পণ্ডিতবর্গ শতমুখে ইহার মহিমা কীর্ত্তন করেন। স্তুতি এক জন কি একটি সম্প্রদায়কেই ভেড়া বানাইয়া থাকে; বিজ্ঞাপন, ভোজরাজনন্দিনীর ভেলকির মত, যুগপৎ সহস্র সহস্র লোকের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগায় এবং যে খানে যে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তাহাকেই ভেড়া বানাইয়া মন্ত্রসাধকের সান্নিধ্যে টানিয়া আনে। স্তুতিমন্ত্রের আর এক দোষ এই, উহা জপ করিতে হইলে পরগুণ কীর্ত্তন করিয়া করিয়া জিহ্বাকে কলুষিত করিতে হয়, এবং ইহা কখনই সকল সময়ে সুখদ বোধ হয় না। বিজ্ঞাপনমন্ত্রের সাধনায় নিজগুণ বিনা জগতের আর কাহারও গুণ পরিকীর্ত্তন করিতে হয় না এবং নিজগুণ পরিকীর্ত্তনে যাহা কিছু নিন্দার সম্পর্ক থাকে, বিজ্ঞাপনের নামে তাহাও আর স্পর্শে না।

মনে কর, তোমরা তিনটি অজাত শ্মশ্রু যুবা, আর দুইটি অস্ফুটবুদ্ধি বালক কোন এক অন্ধকার গৃহে মিলিত হইয়া সংসারশৈল কি সমাজতরুর মূল ধরিয়া টানাটানি করিতে, অথবা রাজা রাজড়া কি আর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে যথেচ্ছ গালি দিতে সংকল্পারূঢ় হইলে। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। ইহার জন্য অর্থ চাই, সামর্থ্য চাই, বুদ্ধি বৈভব এবং আর দশ প্রকারের ক্ষমতা চাই। অথচ তোমাদিগের ভাণ্ডারে তাহার একটিও দেখিতেছি না। তোমাদিগের ক্ষীরকণ্ঠ নিঃসৃত ক্ষীণধ্বনি, তোমরা যেখানে উপবেশন কর, সেই স্থানের প্রাচীর চতুষ্টয়কে অতিক্রম করিয়া, কোন প্রকারেই সংসারে প্রতিধ্বনিত হয় না। নৈরাশ্যের এই সমস্ত নিষ্ঠুর লক্ষণ দেখিয়া তোমরা একবারে অবসন্ন হইতে পার। কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহা কখনই অবসাদের

কারণ নহে। তোমরা এই অবস্থায় থাকিয়াও, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কায়মনোবাক্যে বিজ্ঞাপনমন্ত্রের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও,—তোমাদের ঐ পাঁচ জনের সামান্য সম্মিলনকে ভারতশোধিনী কি ব্রহ্মাণ্ডপাবনী এইরূপ একটা কিছু ভৈরবনাদি তন্ত্রোক্ত নাম দিয়া সেই নাম গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, এবং দিগ্ দিগন্তরে বিজ্ঞাপিত কর; দেখিবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভেড়া বনিয়া স্বয়ম্বিচ্ছন্দ বন্দীর ন্যায় তোমাদিগের দ্বারস্থ হইয়াছে, এবং তাহাদিগের অপকারের জন্য যে কোন সামগ্রীর আবশ্যক, ভক্তিসহকারে তাহা তোমাদিগকে সংকলন করিয়া দিতেছে।

যখন কতকগুলি লোককে ভেড়া বানাইয়া করায়ত্ত না করিলে সংসারে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, এবং বিজ্ঞাপনরূপ মহামন্ত্র প্রয়োগ বিনা কোন মনুষ্যই ভেড়া বনে না, তখন সর্ব্বপ্রকার কার্য্যার্থী এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ীকেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইংলণ্ডের একজন অধুনাতন তান্ত্রিক উপদেশ করিয়াছেন যে, যদি কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তিকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার ২৭ ভাগ প্রকৃতকার্য্যে এবং ৭৩ ভাগ সেই কার্য্যের বিজ্ঞাপনে প্রয়োগ করিবেন। উক্ত পণ্ডিত, স্বপ্রণীত গ্রন্থে বিজ্ঞাপন শব্দ ব্যবহার না করিয়া, শিঙা ফুকন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অর্থে দুই ই এক। সে যাহা হউক, আমার নিকট এই বিভাগটি সুসংগত বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় প্রকৃত কার্য্যে মাত্র ১ ভাগ শক্তি এবং কার্য্যের ঘোষণায় ৯৯ ভাগ শক্তি প্রয়োগ না করিলে, দেখিতে দেখিতেই ফল ফলে না।

ভারতবর্ষে এইক্ষণ বাণিজ্যের উন্নতি নাই, স্বাধীনব্যবসায়ের সম্মান নাই, উমেদওয়ারের চাকুরি নাই, বিবাহযোগ্যা কন্যার বর নাই, বরের পাত্রী নাই, বক্তার শ্রোতা নাই, লেখকের গ্রাহক নাই, এবং এইরূপ কোন বিষয়েই কাহারও আশার সাফল্য নাই। এই শোচনীয় অবস্থার যিনিই যে কারণ নির্দ্দেশ করুন, আমি অবধারিত রূপে বলিতে পারি যে, বিজ্ঞাপনমন্ত্রে উপেক্ষাই ইহার প্রধান কারণ। সত্য বলিতেছি, বিনা বিজ্ঞাপনে ভারতের কল্যাণ হইবে না। উকীল বিজ্ঞাপন দিতে জানেন না, মওয়াক্কেল কোন প্রকারেই ভেড়া বনে না। দোকানদার বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্য অনুভব করে না,

খরিদদার দ্বারে আসিয়াও গৃহে প্রবেশ করিতে চায় না; এবং যাঁহারা যাজকতা ও পাঠকতা কি অন্যান্য ব্যবসায় আশ্রয় করেন, তাঁহারাও এই হেতু বাসনানুরূপ কৃতকার্য্য হন না।

বিজ্ঞাপনসাধনায় ইংরেজ সকল দেশের গুরু। ইয়োরোপ ও আমেরিকা বিজ্ঞাপনেরই বিলাস ভূমি। কিন্তু তত্রত্য সকল স্থানের উপর লণ্ডনই এ বিষয়ে ললাটভূষণ। লণ্ডনে ঘাটে, মাঠে, হাটে, নগরোপান্তে, উদ্যানে, বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মাধিকরণে, ভজনামন্দিরে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপন। কেহ মরিল, তাহাতে বিজ্ঞাপন; কেহ জন্মিল, তাহাতেও ঐরূপ বিজ্ঞাপন। চক্ষু মুদিয়া যোগসাধন করিতে হইলেও লণ্ডননিবাসী আগে তিনলক্ষ নিরনব্বই হাজার বিজ্ঞাপন প্রচার না করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অন্যান্য দেশের লোকেরা বিদেশে গেলে, সঙ্গে অনেক সম্বল লইয়া যায়; লণ্ডনের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কএকখানি বিজ্ঞাপন মাত্র পকেটে পুরিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল, ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। তাঁহাদিগের কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না এবং কোন বিষয়েই তাঁহারা কোন অভাব অনুভব করিতে পান না। কারণ, ঐ বিজ্ঞাপন যাহার কপালে ছোয়ায় যায়, সেই ভেড়া বনিয়া তাঁহাদিগের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

এদেশের অনেক ধনাঢ্যব্যক্তি বহুমূল্য দ্রব্যাদিপূর্ণ দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকেন; লণ্ডন হইতে কেহ গায়ে একটি ছেঁড়া কোট এবং মাথায় একটি ভাঙ্গা হেট পরিয়া, এখানে আসিয়া, দুই এক খানি বিজ্ঞাপন দেখাইয়াই সেই দোকানের সর্ব্বেসর্ব্বা অধীশ্বর হন; বাবুটি ভাবগদগদ ভক্তের মত মুচ্কুন্দের আসনে উপবিষ্ট হইয়া পদসেবন করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষে অনেক ইংরেজ বিস্তীর্ণ জমিদারি লাভ করিয়া এবং যাইবার সময় সেই জমিদারি একগুণে পঞ্চাশগুণ মূল্যে বন্ধক দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, ঐ সকল ইংরেজেরা যখন প্রথম শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন একখানি লাটি আর কএকখানি বিজ্ঞাপন বই কিছুই তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিল না। লণ্ডনের পুরুষ কেন, বায়ুভরবিলোলিতা অবলাও, বিজ্ঞাপনের বলে সময়ে সময়ে কেমন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ভেড়া বানাইয়া, তাহার স্কন্ধে চড়িয়া, সাংসারিক সম্পদের উচ্চতম স্থানে আরোহণ করেন। সেই ভেড়ারূঢ়া বিশ্বমোহিনীর নিকপট মুখমাধুরী ম

র্শন করিলে, কেহই উচ্ছলিত প্রেমাশ্রু সংবরণ করিতে সমর্থ হয় না।

ভেড়া বানাইবার আরও অনেক মন্ত্র ও উপায় আছে। আমি সে গুলির উল্লেখ করিব না। সে সকল কথা কহিতে গেলে বৃদ্ধকে লোকে বাচাল বলিবে, এবং অরসিকের উপর অনর্থক রসিকতার অপবাদ আসিবে। অচিন্ত্য প্রকৃতি রাজপুরুষেরা মনুষ্যকে ভেড়া বানাইবার জন্য যে সকল মন্ত্র, কি মন্ত্রপূত বস্তু, অথবা মন্ত্রযুক্ত প্রক্রিয়া ব্যবহারকরিয়া থাকেন আমি সম্প্রতি তাহার দুই একটির নাম করিয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ভেড়া বানান রাজপুরুষদিগের একটি অপরিহার্য্য বিদ্যা। এই বিদ্যায় নিপুণ না হইলে, তাঁহাদিগের কোন বিদ্যাই ফলোন্মুখী হয় না। তাঁহারা হয় পরকে ভেড়া বানাইবেন, না হয় পরকর্ত্তৃক আপনারা ভেড়ায়িত হইবেন। ইহা ছাড়া তৃতীয় পন্থা নাই। পামারষ্টন বড় বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী ছিলেন; তিনি একবার রুশিয়ার বন্য ভল্লুকটিকে ভেড়া বানাইয়া সাতসমুদ্রের জল খাওয়াইয়াছিলেন। অল্প কএক বৎসর হইল, রুশিয়ার পক্ষে মন্ত্রিবর গর্চেকফ আবার ইংলণ্ডীয় সমুদয় মন্ত্রীকে ভালরূপে ভেড়া বানাইয়া সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করিয়াছেন। রাজনীতির কথাই এই, যে যাকে পারে, এবং যেরূপে পারে।

রাজ্যের অনেক প্রধান লোক মধ্যে মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, অথবা বৈভবমদে একান্ত প্রমত্ত হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন দেওয়ার উপক্রম করেন। তাঁহাদিগকে ভেড়া না বানাইলে রাজ্যের মঙ্গল হয় না। রাজপুরুষেরা অমনি তাঁহাদিগকে স্নেহমধুর প্রিয়স্বরে ডাকিয়া নিয়া তাঁহাদিগের কর্ণে মৃদু মৃদু কি কহিয়া দেন, কিংবা একগাছি লাল কি নীল রঙের মন্ত্রপূত ফিতা তাঁহাদিগের বক্ষে কি বাহুতে বান্ধিয়া দেন, অথবা বুকের এক পার্শ্বে কি একটা লাগাইয়া দেন; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ভেড়ার বেশ ধারণকরিয়া রাজপুরীর দুর্ব্বাকীর্ণ প্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমিতে শুইয়া পড়েন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের যত কিছু তেজ থাকে, ঐ খানেই তাহার অবসান হয়। বড় নেপোলিয়নের এক প্রথা ছিল, তিনি যাহাদিগকে ভেড়া বানাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাহাদিগের কেশজালে কি একপ্রকার শাদা গুড়া মাখাইয়া দিতেন; তাহাতেই তাহারা ভেড়া হইয়া চিরকাল তাঁহার আজ্ঞানুগত থাকিত।

রশিক্রুশিয়ান কিংবা যেস্থইটদিগের মধ্যে, অথবা সাগর কি শৈলোপান্তবর্ত্তী তান্ত্রিকদিগের মধ্যে, বর্ণবিশেষের কিরূপ বিশেষ মাহাত্ম্য

আছে, তাহা পাঠকবর্গ অবশ্যই অবগত আছেন। রাজপুরুষদিগের কাছেও ঐরূপ বর্ণবিশেষের কোন নিগূঢ় মহিমা আছে। তাঁহারা একখানি কাগজে কাহারও নাম লিখিয়া, নামটির পুচ্ছদেশে তথাবিধ দুই একটি গূঢ়ার্থযুক্ত বর্ণ সংযোজন করিয়া দিলে, যাহার নাম সে একবারে খাটি হইল, এবং তাহার মাথায় ঐ হইতেই ধূলোপড়া পড়িল। অনেকে বক্তৃতা করিয়া, কিংবা লেখনী চালাইয়া দিন কতক ঘোরতর আস্ফালন করিয়াছেন, শেষে দুই একটি মন্ত্রপূত অক্ষরের নিকট বসিয়া গিয়াছেন।

এদেশে ক্রমে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ তিন জাতি রাজত্ব করিল। হিন্দু ও মুসলমান রাজারা বড় বড় লোককে ভেড়া না বানাইতেন, এমন নহে। কিন্তু তাঁহারা যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেন, তাহাতে বিস্তর ব্যয় পড়িত। অনন্তবুদ্ধিসম্পন্ন মহামহিম ইংরেজ রাজপুরুষদিগের কিছুই ব্যয় লাগে না। তাঁহারা স্বদেশীয় প্রথানুসারে কাহারও জন্য দুই মুষ্টি বারুদ খরচ করেন, কাহারও নামের পশ্চাৎ দেশে পূর্ব্বোক্তরূপ দুই চারিটি অক্ষর বসাইয়া দেন, কাহাকেও বা একগাছি ফিতা দিয়া অথবা দূর হইতে ঐফিতাগাছি দেখাইয়া দেখাইয়াই মুগ্ধ করিয়া রাখেন। মন্ত্রপূত স্থানবিশেষে যাতায়াত করিতে অধিকার দেওয়াও তাঁহাদিগের আর একটি উপায়। যে ঐরূপ কোন স্থানে একবার গিয়াছে,সে ই ঠেকিয়াছে এবং ঠকিয়াছে; এবং আপনি ঠকিয়া শেষে পরকে ঠকাইবার সাধন স্বরূপ হইয়াছে।

এইরূপ মন্ত্রপূত স্থানকে ইংলণ্ডে মন্ত্রিদিগেরে ক্যাবিনেট কহে। পার্লিমেন্টের কোন সভ্য বড়ই বাহ্বাস্ফোটন ও তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলে, তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য ঐ ক্যাবিনেটে পুরিয়া রাখে, অথবা রাজভবনের কিঞ্চিৎ ক্রিয়া—শোধিত ভোজ্য তাঁহারমুখে আনিয়া তুলিয়াদেয়। মহাত্মা জন ব্রাইটের এইরূপ দশা ঘটে। তাঁহার জিহ্বা পূর্ব্বে চতুর্দ্দিগ্ বিকম্পিত করিত। তিনি যখন সাধারণের স্বত্বাধিকার অথবা ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিতেন তখন পার্লিমেন্ট কম্পিত হইত, ইংলণ্ড কম্পিত হইত, এবং সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করিত। কিন্তু যেই তাঁহাকে কথিত স্থানটিতে নিয়া আবদ্ধ করিল, আর দু দিন মুখে মহাপ্রসাদ তুলিয়া দিল, সেই তিনি চুপ করিলেন। সেই যে চুপ, অদ্য পর্য্যন্তও তাঁহার

আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। এদেশে কাহারও তেমন জ্ঞানোৎপাদিকা মুখরা জিহ্বা নাই; সুতরাং তা দৃশ পুরস্কৃত স্থান অথবা শোধন করা প্রসাদ সামগ্রীরও আবশ্যক হয় না, যেমন তেমন একটা ঘরে কি নদীর তটে যেমন তেমন একটু ঘের দেওয়া স্থানের মধ্যে ডাকিয়া দিলেই অনেকে সংসারকে নবীন তৃণময় দেখেন, এবং যৎসামান্য একটুকু মন্ত্রপুত প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেই অনেকের জিহ্বা জড় হইয়া যায়। যদি ইহার উপর আর কিছু করা হয়, তবে যিনি মন্ত্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হন, তাঁহার পরলোকবাসী পূর্ব্ব পুরুষগণ পর্য্যন্ত পুনরায় ধরাতলে নূতন এক মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন।

প্রিয় পাঠক! এই মায়াময় ও মন্ত্রময় সংসারে তুমি মনুষ্যের মত ই থাকিবে, না ইহার কাছে, কি উহার কাছে, এই মন্ত্রে কি ঐ মন্ত্রে, ভেড়া বনিয়া, পরকীয়শৃঙ্খল কণ্ঠে ধারণ করিবে, সে বিষয়ের বিবেচনার ভার তোমার হস্তে।

শ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

দুর্গাবতী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের অবশিষ্ট।

যেমন শরীরের সম্বন্ধে মস্তক, সেইরূপ সৈনিকদলের সম্বন্ধে সেনানী। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়, বলিষ্ঠ, ও কার্য্যক্ষম না হইলে, শুধু মস্তিষ্কের বলে কখনই কোন বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হয় না। ভারতীয় বীরচূড়ামণিরা গ্রীক ও মুসলমান প্রভৃতি যবনদিগের সহিত আহবে অগ্রসর হইয়া যখনই বিপন্ন হইয়াছেন, তখনই দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা নিজেরা যেরূপ অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেনাবল সেইরূপ করিতে সমর্থ হয় নাই। বীরাঙ্গনা দুর্গাবতীর ভাগ্যেও পরিণামে ইহাই ঘটিয়া উঠিল।

প্রথমযুদ্ধে জয়লাভের পর, গড় মণ্ডলবাসী সৈনিকেরা, দুর্গাবতীর তেজস্বিতায় উত্তেজিত হইয়া, শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিরূপ ভয়ঙ্করবেগে প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহা উক্ত হইয়াছে। যদি তাহারা নিশার আগমন দেখিয়া বিরত না হইত, তাহা হইলে পরদিন প্রভাতে একটি মুসলমানের সহিতও তাহাদিগের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহারা তাহা না

করিয়া, সকলেই অসময়ে ও অনুচিত-স্থানে বিশ্রামসুখের জন্য লালায়িত হইল। দুর্গাবতী ইহা দেখিয়া নিতান্ত হতাশ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, সকলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে, তিনি দলবল সহ ঐ রাত্রিতেই মুসলমানদিগের সেনানিবাসে আক্রমণ করেন, এবং যখন তাহারা বিপক্ষের অভিযানের জন্য সর্ব্বপ্রকারে অপ্রস্তুত থাকে, তখনই একটা বিষম রণ-ঘটা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে একবারে নির্ম্মূল করিয়া ফেলেন। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার অনুগামী যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে একটি লোকও এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তিনি একে একে সকলকেই অনুনয় সহকারে অনুরোধ করিলেন, সকলেই ফিরিয়া বসিল। কেহ বলিল, রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন আর শরীরে দেয় না। কেহ বলিল, মুসলমানেরা আর প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। প্রধানমন্ত্রী এবং আর কতিপয় প্রধান সৈনিক আসিয়া পরামর্শ দিলেন যে, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের সৎকারের জন্য আয়োজন করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। দুর্গাবতী সকলের প্রার্থনায় অগত্যা সম্মত হইলেন, এবং আপনার মনের আগুণে আপনি দগ্ধীভূত হইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ-চিত্তে পশ্চাৎদিগে ফিরিয়া চলিলেন।

এদিগে, মুসলমান সেনাপতি আসফ খাঁ, গড়মণ্ডলের সৈনিকদিগের চলচিত্ততার কথা এবং রাণীর স্বগৃহ প্রত্যাবর্ত্তনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। তিনি পরাজয় জন্য অপমানে নিতান্ত জর্জ্জরিত ছিলেন; এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া আবার সাহস পাইলেন এবং কিরূপে অপমানের পরিশোধ দিবেন তাহার নানাবিধ উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি কামান ছিল। তিনি পথের দুর্গমতাহেতু প্রথম আক্রমণে সে গুলিকে সমরাঙ্গণে আনয়ন করিতে পারেন নাই। এ দিন রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই ঐ সমস্ত কামান এবং আর যত প্রকারের অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে ছিল, সমুদয় লইয়া দুর্গাবতীর শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হিন্দুসৈন্যেরা নিদ্রার ক্রোড়ে সুখে শয়ান ছিল। মুসলমানের মর্ম্মভেদি-হুহুংকারে তাহারা চমকিয়া উঠিল, এবং এই আকস্মিক উপদ্রব দর্শনে সকলেই একবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

রাণী, এই বিপৎপাতে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, সৈন্যরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথমে একটি সংকীর্ণ পথ আশ্রয় করিলেন। কিন্তু অবিরাম গোলাবর্ষণে সে খানে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলেন

না। সূর্য্য একটুকু উঠিলেই, তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া,রক্ষা ও আক্রমণ উভয়কার্য্যের উপযোগী এক প্রশস্ত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তথায় বাসনানুরূপ ব্যূহ রচনা করিয়া মুসলমানদিগকে নিকটস্থ হইবার জন্য দর্পভরে আহ্বান করিলেন। তাঁহার প্রাণপ্রতিম প্রিয়পুত্র এবং জীবনের একমাত্র অবলম্বন কুমার বীরবল্লভ এত ক্ষণ সৈন্যমধ্যে ছিলেন। তিনি এই উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া শত্রুর সম্মুখস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং সৈনিকদিগকে যুদ্ধার্থ নানারূপ উত্তেজনা দিয়া, স্বয়ং সেনাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সেই নবীন ক্ষত্রমূর্ত্তির প্রতাপ ও পরাক্রম দেখিয়া শত্রু মিত্র উভয় পক্ষই বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ক্ষত্রসন্তান হিন্দুজাতির চিরগৌরব। ক্ষত্রিয়েরা কি সাহসে, কি রণনৈপুণ্যে, কি পুরুষোচিত অভিমানে, কি বীরজনোচিত উদারতায়, কোন বিষয়েই পৃথিবীর কোন জাতির নিকট মস্তক নত করেন নাই। যুদ্ধাদিসম্পর্কে যদি তাঁহাদিগের নিন্দার কোন কথা থাকে, সেই নিন্দা এই, তাঁহারা যুদ্ধের রীতিপদ্ধতির উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধতার প্রতি যে রূপ দৃষ্টি রাখিতেন, ফলাফলের প্রতি সেইরূপ দৃষ্টি রাখিতেন না। তাঁহারা, প্রাণটিকে জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন পরিচ্ছদের ন্যায় ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইয়া, একবারে জ্বলন্ত অগ্ন্যানলে প্রবিষ্ট হইতেন, পরিণামে কি ঘটিবে তৎপ্রতি মুহূর্ত্তের তরেও ফিরিয়া চাহিতেন না। পাছে কেহ কাপুরুষ বলে, পাছে কেহ তাঁহাদিগের চরিত্রের মহত্বে দোষ দেয়, পাছে তাঁহারা কোন অংশেও কঠোর ক্ষাত্র ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন, ইহাই তাঁহারা চিন্তা করিতেন, এবং এই চিন্তার প্রেরণায় একান্ত অশক্য ও অভাবনীয় কার্য্যেও অম্লানচিত্তে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন; অথচ সাবধানতার অভাব যে সেনাপতির এক প্রধান দোষ, বীরতার অনুরোধে বিজয়ে উপেক্ষা করাও যে, রাজপুরুষের কলঙ্কবিশেষ, এবং সম্মুখসংগ্রামে যেমন সাহস, তেমন কৌশল, উভয়ই যে সমান অবলম্বনীয় ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেন। ইয়োরোপে রিচার্ড প্রভৃতি কেশরীপরাক্রম বীরপুরুষদিগের সময় এই ক্ষাত্র নীতি বহুলপরিমাণে প্রবহমান ছিল, এইক্ষণ আর উহার আদর নাই। কিন্তু প্রকৃত ক্ষত্রিয়েরা, চিরকালই এই নীতির পূজা করিয়া,ইহারই জন্য জগতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এবং ইহারই জন্য বিপাকে ডুবিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। গড়মণ্ডলের রাজকুমা-

রও, সসৈন্যে মোগলসেনার সম্মুখীন হইয়া, বহুক্ষণ যথার্থ ক্ষত্রিয়ের মত বীর্য্য প্রকাশ করেন। তিনি তাহাদিগকে ক্রমে দুইবার আক্রমণ করিয়া, দুইবারই তাহাদিগকে পিছে হঠাইলেন; পরিশেষে, তৃতীয় আক্রমণের সময়, তিনি চারি দিগ হইতে একা বহুলোক কর্ত্তৃক এমন অন্যায় রূপে আহত হইতে লাগিলেন যে, তাঁহার আর অস্ত্রধারণেরও সামর্থ্য রহিল না। শত্রু যদি সদাশয় ও উন্নতমনা হয়, তাহার নিকট প্রকৃতবিপদকেও বিপদ বলিয়া প্রতীতি হয় না। কিন্তু নির্ম্মমযবন হিন্দু জাতির সেরূপ শত্রু নহে। যবনেরা ভারতবর্ষে কোন যুদ্ধেই ভদ্রতা ও মহানুভাবতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয় নাই। আসফ খাঁর লোকেরা যখন দেখিতে পাইল যে, কুমার বীরবল্লভ যাই যাই হইয়াছেন, তখন তাহারা তাঁহার উপর আরও অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাদিগের সেই চিরবিশ্রুত বিকট জয়ধ্বনি তৎকালে সেই রণস্থলীকে পুনঃ পুনঃ নিনাদিত করিল।

ইহার কিছু কাল পরেই কুমার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে স্খলিত হইলেন। তাঁহাকে তথাবিধ অবস্থায় দর্শন করিয়া গড়মণ্ডলের অধিকাংশ যোদ্ধা তাঁহারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ ঐ অবসরে পলায়নের পথ দেখিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ প্রভুপুত্রের অমঙ্গলচিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধে এককালে উপেক্ষা দিল। দুর্গাবতী এই সময় কিরূপ বিপন্ন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তিনি পুত্রের জননী এবং রাজ্যের অধীশ্বরী। যদি পুত্রের মমতায় তখন যুদ্ধে নিবৃত্ত হন, তবে রাজ্য ও স্বাধীনতা রক্ষা পায় না। যদি রাজ্য ও স্বাধীনতার মমতায় যুদ্ধ লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, তবে আর পুত্রের মুখাবলোকন ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু রাজ্যের যাহা হইবার তাহাই হউক, কোন্ বীরপ্রসবিনী ক্ষত্রিয়রমণী কণ্ঠে প্রাণ থাকিতে মান ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পারে? দুর্গাবতী মান ও ধর্ম্মের দিকে চাহিয়াই তখন আর আর সকল মমতা বিসর্জ্জন করিলেন, এবং অতিদুঃখসন্তপ্তচিত্তে কুমারকে শিবিরে লইয়া যাইবার সন্ধান দেখাইয়া দিয়া, সিংহীর ন্যায় পুনরায় শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যাঁহারা, ভারতবর্ষে পবিত্র হিন্দুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সুকোমল শয্যা, সুদৃশ্য বেশভূষা, প্রেমালাপ, প্রিয় সংসর্গ, এবং সংগীত ও সাহিত্যাদি সুখসেব্য শাস্ত্রচয়ের অনুশীলনকেই জীবনের একমাত্র আনন্দ এবং পরম পুরুষার্থ বলিয়া ঠাউরাইয়া রাখিয়া-

ছেন, তাঁহারা রাণী দুর্গাবতীর তৎকালীনকীর্ত্তি চিন্তা করিলে, বিস্মিত না হউন, লজ্জায় অভিভূত হইবেন সন্দেহ নাই। যখন দুর্গাবতী পুনরপি যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইলেন, তখন তাঁহার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, চতুর্দ্দিগই বীরশূন্য এবং আশাশূন্য। মুসলমান সেনা, উদ্বেলসমুদ্রের ন্যায়, ক্রমে নিকটস্থ হইতেছে; অথচ এমন কোন যোদ্ধা নিকটে নাই যে, তাহাকে সেই ভয়াবহ তরঙ্গ অবরোধ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি ভীত বা বিমুখ হই লেন না। তাঁহার সঙ্গে তখন মাত্র তিন শত সামান্য পদাতি তিষ্ঠিয়া ছিল। তিনি ঐ মুষ্টিমিত সৈন্য লইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে লৌহদণ্ডবৎ অটল রহিলেন, এবং সাহসের নিকট কিছুই যে ক্লেশকর ও ত্রাসজনক নহে, পদে পদে তাহার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

সহসা শত্রুপক্ষ হইতে একটি তীক্ষ্ণ তীর আসিয়া দুর্গাবতীর একচক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি বলক্রমে উহা বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন; উহা বাহির না হইয়া চক্ষেই ভাঙ্গিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে আর একটি তীর আসিয়া তাঁহার গ্রীবাদেশ ভেদ করিল। তিনি এইরূপে পুনঃ পুনঃ বাণবিদ্ধ হইয়া অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; এবং মস্তক ঠিক্ রাখা তাঁহার পক্ষে এইক্ষণ কঠিন হইয়া উঠিল। অধরসিংহ নামে রাজপুরীর একটি পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রাণীর নিকটে ছিলেন। তিনি অতিবিনয়পূর্ণ বচনে রাণীকে রণভূমি ত্যাগের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাণী দুর্গাবতী, ইহাতে সম্মত না হইয়া, বলিলেন—"আমরা আজ বিপাকতঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি; কিন্তু তাই বলিয়া কি অপমানের লাঞ্ছনাও স্বীকার করিব? আমরা কি আজ এই অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ী জীবনের জন্য চিরস্থায়ী কীর্ত্তি এবং চিরস্থায়ী ধর্ম্মকেও কলঙ্কের অর্ণবে ডুবাইয়া দিব?—এই কি আমাদিগের মহত্ত্ব? এই কি আমাদিগের এতদিনের এত শিক্ষা ও ক্ষাত্রব্রত পরিপালনের ফল? দেখ অধর! আমিই তোমাকে স্নেহ করিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছি। আমি ভরসা করি, তুমি সমুচিত কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়া এইক্ষণ সেই ঋণের পরিশোধ করিবে। তোমার হাতে ঐ যে শাণিত তরবারি দেখিতেছি, উহা আমার হৃদয়কে উৎফুল্ল করিতেছে। গড়মণ্ডলের অধীশ্বরী তোমার নিকট জন্মের মত এইমাত্র ভিক্ষা চান যে, তুমি উহার সাহায্যে আজ তাঁহাকে পরাধীনতার অপবিত্র স্পর্শ এবং আত্মহত্যার পাপ হইতে পরিত্রাণ কর।"

বৃদ্ধ অধরসিংহ, ভৃত্য হইলেও, রাণী দুর্গাবতীকে সন্তাননির্ব্বিশেষে ভাল

বাসিতেন, এবং প্রাচীন অভিভাবকের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিধানে থাকিতেন। তিনি দুর্গাবতীর এই বিলাপপূর্ণ হৃদয়বিদারিবচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পভরে নিরুদ্ধ হইয়া আসিল, এবং অশ্রুবারি কপোলদেশ বহিয়া দর দর ধারে নির্গত হইতে লাগিল। তিনি আবারও রাণীকে অনেক প্রবোধ দিতে চেষ্টা পাইলেন; জয় পরাজয় যে দৈবের অধীন, ইহা বলিয়া, আবারও তাঁহাকে মাতঙ্গপৃষ্ঠে রণভূমি হইতে দূরে যাইতে জেদ করিলেন। কিন্তু রাণী দুর্গাবতী কোন মতেই শত্রুর নিকট পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে স্বীকার করিলেন না। তিনি যখন দেখিতে পাইলেন যে, আর সময় নাই, যবনসেনা অতিনিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ক্ষণপরেই তাঁহাকে বন্দী করিবে, তখন আর তাঁহার চৈতন্য রহিল না। তিনি তখন কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, অধর সিংহের হস্ত হইতে সেই তরবারিখানি হাত বাড়াইয়া জোরে কাড়িয়া লইলেন, এবং ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে, সেই শবাকীর্ণ শোণিতময় সমরক্ষেত্রের মধ্যস্থলে স্বকীয় ইচ্ছায় মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার তনুত্যাগের সময় কেবল ছয়টি হিন্দু সৈনিক সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা একটি ক্ষীণাঙ্গী অবলার এইরূপ স্বাধীনতানুরাগ দর্শনে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব সাহসে গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং এক এক জনে বহুসংখ্য যবনের মুণ্ডপাত করিয়া স্বদেশের নামে সংগ্রামভূমিতে শয়ান হইল।

দুর্গাবতীর কাহিনী কাহারও কপোলকল্পনা নহে। মুসলমানদিগের ইতিহাসগ্রন্থে এই সকল কথা সবিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে। ভারতবাসীরা এইক্ষণ যেমনই হইয়া থাকুক, ইহা নিঃসংশয় যে, এই দেশ একদিন প্রভাব ও পরাক্রমের অতি প্রিয় নিকেতন ছিল। নহিলে, এইরূপ স্বদেশাভিমানিনী স্বর্গীয়হৃদয়া বীরাঙ্গনারা কখনও ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন না। কে বলে যে, তাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন? ঐ দেখ, তাঁহাদিগের কীর্ত্তি, নির্ম্মল চন্দ্রাতপের ন্যায়, নভোমণ্ডলে বিলম্বিত রহিয়াছে। যখন ভারতবর্ষে আবার কোনসময়ে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তাহারা ঐ চন্দ্রাতপের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রাণ শীতল করিবে। ভারতের কবি আবার কোন দিন বজ্রনির্ঘোষতুল্য সুগভীর কণ্ঠে তাঁহাদিগের পুণ্যকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিবে। মনুষ্যের দেহই বিলীন হয়, কিন্তু মানবীয় আত্মা স্বদেশের মমতায়,

স্বাধীনতার অনুরাগে, কিংবা আর কোন উচ্চভাবের প্রণোদনে যে সকল মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, প্রলয়েও তাহার বিলয় হয় না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। ঋতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার রচিত।—ইহা একখানি ছন্দোবদ্ধ কাব্য। ইহার প্রথমভাগে বসন্ত এবং শেষভাগে নিদাঘ এই দুইটি ঋতুর বর্ণনা আছে। ভরসা করি গ্রন্থকার আর আর ঋতু কয়েকটি বর্ণন করিয়া অচিরেই গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবেন।

বঙ্গদেশে যাঁহারা ইদানীং কাব্য লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করি। এক শ্রেণির আদর্শ সংস্কৃত কাব্য, আর এক শ্রেণির আদর্শ ইংরেজি কাব্য। যাঁহারা ইংলণ্ডীয় কবিসম্প্রদায়ের অনুকারী, তাঁহারা বড়ই পল্লবগ্রাহী। তাঁহারা চমৎকারিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হউন আর না হউন, এক কথা লইয়া অনেক কথার প্রসঙ্গ করা এবং একটিভাব ধরিয়া বহুভাবের স্বজন করিতে প্রয়াস পাওয়া, তাঁহাদিগের একান্ত প্রিয়। যাঁহারা সংস্কৃত কবিদিগের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগের দোষ এই, তাঁহারা একটুকু অধিক মাত্রায় শব্দপ্রিয়। শব্দ লইয়া খেলা করিতেই তাঁহারা বিশেষ সুখানুভব করেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বাবু গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়কে সংস্কৃত কবিদিগেরই অনুকারী বলিয়া স্থির করিলাম। তাঁহার কবিতা শব্দসম্পদবহুলা। যেখানে যে শব্দটি গ্রথিত হইলে সুন্দর দেখায়, পড়িবার সময় বোধ হয়, যেন সেখানে সেই শব্দটি আপনি আসিয়া নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, ঋতুবর্ণনকে কেহই ভাবমাধুর্য্যহীন মনে করিবেন না। ইহার অনেক স্থানের বর্ণনা নিতান্ত স্বভাবসুন্দর ও মনোহর, এবং কবি যে একজন স্বাদগ্রাহী সহৃদয় লোক তাহার পরিচায়ক।

২। হরিশ্চন্দ্র নাটক; শ্রীমনোমোহন বসু কর্তৃক প্রণীত।—নাটক রচনায় গ্রন্থকারের এই চতুর্থ উদ্যম, এবং এই উদ্যম তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত প্রতিষ্ঠার ক্ষতিকর হয় নাই। মনোমোহন বাবুর একটি বিশেষ প্রশংসা আছে। তিনি করুণরসের অবতারণায় বস্তুতঃই নিতান্ত নিপুণ, এবং তাঁহার লেখায় যে সকল নীতি প্রসঙ্গক্রমে প্রকটিত হয়, তাহা অতীব প্রগাঢ় ও পবিত্র। রামের রাজ্যোভিষেক কি

বনবাস, এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব দান ও বিড়ম্বনা পুরাণ কথা। পুরাণ কথা অবলম্বন করিয়া নূতন কৌতূহলের উদ্দীপন করা, অসম্ভব না হইলেও কঠিন। কোন উপন্যাস কিংবা উপন্যাসের প্রণালীতে রচিত অভিনব কোন নাটক পড়িবার সময়, পর পর ঘটনা জানিবার জন্য মনে যে ঔৎসুক্য জন্মে, এই সকল নাটকে কখনই সেই ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে না। কিন্তু গ্রন্থকারকে তথাপি ধন্যবাদ দি যে, তাঁহার কথাযোজনার কৌশলে এই অনৌৎসুক্যজনিতবিরাগ অল্পকাল পরেই চলিয়া যায়। আমরা হরিশ্চন্দ্র নাটক আরম্ভ করিয়া প্রথমে হতাশ হইয়াছিলাম। ইহা যে পড়িয়া শেষ করিতে পারিব, আমাদিগের এই রূপ ভরসা ছিল না। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কতক দূর অগ্রসর হওয়ার পর, আমাদিগের সেই আশঙ্কা অনেক অংশে অপসারিত হইল, এবং আমরা নাটকের নায়কনায়িকার দুঃখের স্রোতে অজ্ঞাতসারে প্রবাহিত হইলাম।

কবি যে সকল নূতন চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে কমলার অলৌকিক প্রেম এক অপূর্ব্ব বস্তু। আর আর চিত্র তেমন মনোহর নহে। একবার দেখিলেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু তাঁহার গীত গুলি বড়ই শ্রুতিসুখাবহ ও সুললিত। যদি স্বগত উক্তি সমূহের অনুচিতদীর্ঘতা একটুকু কমাইয়া দিয়া এইরূপ আরও দুই একটি গীতের সন্নিবেশ করিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে নাটকখানি পাঠকবর্গের অধিকতর হৃদ্য হইত।

৩। গ্রন্থকার। ইহা একখানি প্রহসন। যাঁহারা বঙ্গদেশে গ্রন্থরচনা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা প্রদর্শন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং প্রহসনাংশে ইহার বিশেষ কোন প্রশংসা না থাকিলেও সেই উদ্দেশ্য কড়ায় ক্রান্তিতে সফল হইয়াছে। ফলতঃ এখানি পাঠ করিবার সময় হাসিবার প্রবৃত্তি যত না উদ্রিক্ত হয়, কান্দিবার ইচ্ছা তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক প্রবলা হইয়া উঠে। যদি এদেশে সরস্বতীর সাধনা সত্য সত্যই এত দূর নীচতায় পরিণত হইয়া থাকে, তবে আর আশা কোথায়? এই প্রহসনখানি পূর্ব্ববঙ্গে বহুলপরিমাণে পঠিত ও প্রচারিত হইলে আমরা সুখী হইব।

৪। বঙ্গবাগীশ্বরীবিলাপ কাব্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত।—গ্রন্থকার, কবিবর মধুসূদন দত্ত এবং রায় দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুঘটনা উপলক্ষ

করিয়া, পরমুখে বিলাপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিলাপে কাহারও হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, অথবা কেহ কর্ণ পাতিয়া উহা শ্রবণ করিয়াছে, আমাদিগের এইরূপ প্রতীতি হইল না। নূতনলেখকদিগের প্রথমোদ্যমেই নিতান্ত কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। যাঁহাদিগের জন্য বঙ্গদেশ আপনা হইতেই অজস্রধারে অশ্রু বর্ষন করিয়াছে, যদি কবির কথায় তাঁহাদিগের জন্য এক ফোটা চখের জলও না আইসে, তবে আবার তাহা একটা কাব্য কি ?)

৫। মৃত্যুসম্পত্তি, অর্থাৎ পঞ্চবটী বা নারায়নক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত।—লেখক এক জন প্রাচীন পণ্ডিত, এবং লিখিত গ্রন্থখানি তাঁহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার উপযোগী। যাঁহারা পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া পবিতৃপ্ত হইবেন। যাঁহাদিগের তাদৃক্ বিশ্বাস নাই, তাঁহারাও অনেক উপদেশ পাইবেন।

৬। বীরনারী। ঐতিহাসিক নাটক।—ইহার মুখপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই, এবং তিনি কে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু লেখা পড়িয়া, তাঁহাকে অনুপযুক্ত লোক বোধ হইল না। আমরা তাঁহার কল্পনায় যে সকল স্থলে দোষ দেখিলাম, তাহা তত না অশক্তিকৃত, যত ইচ্ছাকৃত।) তিনি ইচ্ছা করিয়া জয়সিংহের স্ত্রীকে পতিনিন্দা পাপে কলঙ্কিত করিয়াছেন, ইচ্ছা করিয়া সুরঙ্গিণীকে অনুপযুক্ত প্রসঙ্গে ও উপহাসরসিকতায় মত্ত রাখিয়াছেন, এবং ইচ্ছা করিয়াই মন্ত্রিকন্যা সুনীতিকে অতি ভয়ঙ্কর সময়েও তদীয় সংকীর্ণ হৃদয়ের অতি সংকীর্ণ জাতীয় প্রেম বিনা আর সকল ভাবে বঞ্চিত দেখাইয়াছেন। (লেখকের সহৃদয়তা আছে, এবং ছবি আঁকিবার ক্ষমতাও নিন্দনীয় নহে। কিন্তু নারীজাতি ঘটিত কতকগুলি দৃঢ়মত তাঁহার সেই সহৃদয়তাকে কাব্যে যথেচ্ছ প্রবাহিত হইতে দেয় নাই। যেখানে সেখানেই তাঁহাকে বাধা দিয়াছে। রাজপুত্রবধূর প্রাণ যায়, দেবকী নিকটে বসিয়া আক্ষেপ করেন যে, 'পোড়া মেয়েমানুষের জাতকে পড়াবে কে?' এইরূপ সঙ্কুচিত ভাবের উদাহরণ নাটক খানিতে নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও ইহার অনেক প্রশংসা আছে।)

বান্ধব সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়দিগের অভিমত।

নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

চৈত্র। ১২৮১। শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়।

"আমরা ইহার আদ্যন্ত বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার অধিকাংশের লৈপিক গুন উৎকৃষ্ট। সচ্চিন্তাশীল সদ্ভাবুক ও সদ্বিদ্বানের লেখা বলিয়া সম্পূর্ণ ধারণা হইল। এমন কি, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় কোন কোন নামলুব্ধ মাসিক পুস্তকের মধ্যেও এমন হস্তের লিপি প্রায় দেখা যায় না। তদ্রূপ পত্রে অনেক বড় বড় লেখক লিখিয়া থাকেন, সুতরাং মধ্যে মধ্যে বড় বড় বিষয় ও বড় বড় ভাবের সদ্ভাব সম্ভাবনা বটে, কিন্তু বান্ধবের যেমন ভাব তেমনি কল্পনা, তেমনি বিচারদক্ষতা, তেমনি সুন্দর ভাষা। উক্ত বড় বড় পত্রের ভাষা প্রায়ই কাল্পনিক ও বলসিদ্ধ, বান্ধবের তাহা নহে, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। বান্ধব দুরূহ ভাব সকল সুকোমল ও সুলালিত বাক্যে প্রকাশ করিতে বিশেষ পটু। ঐ বড় বড় লেখকেরা যে যে স্থলে নূতন ভাব প্রকাশার্থ নূতন উপায় অবলম্বন করেন, সেই সেই স্থল যেন পাঠকের রসনায় ও স্বরানুভাবকতায় অস্বাভাবিক বল প্রয়োগ করিতে থাকে; বান্ধবের সেরূপ স্থল স্বাভাবিক মধুরতা বর্ষণ করে। আমরা প্রার্থনা করি সহৃদয় পাঠক সমাজ নাম লুব্ধের পুস্তক নয় বলিয়া, ইহার গ্রাহক শ্রেণীতে আপনাদের নাম পাঠাইতে কাতর না হন।" ১১৮১। আষাঢ়। মধ্যস্থ।

"এখানি মাসিক সাময়িক পত্রিকা। মৌলিকতা বঙ্গদর্শনের বিশেষ গুণ, অনুকরণ জ্ঞানাঙ্কুরের ধর্ম্ম, আর্য্যদর্শন অনুবাদে পরিপূর্ণ, বান্ধব চিন্তাশীল। এ প্রকার সাময়িক পত্র যতই প্রকাশিত হয়, বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। বান্ধব সাধারণে আদৃত হয়, এই আমাদিগের প্রার্থনা।" ২০ আষাঢ় ১২৮১। ভারতসংস্কারক।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষজ মহাশয় পূর্ব্ব বাঙ্গালার একজন প্রধান সদ্বক্তা ও সুলেখক। তিনি ও প্রদেশে বঙ্গদর্শনের ন্যায় একখানি মাসিক সন্দর্ভ প্রকাশ করিতে সংকল্পারূঢ় হইয়াছেন, ইহাতে আমরা অতিশয়

আনন্দিত হইলাম। তিনিই এই কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে সকল প্রস্তাব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে শক্তি ও জীবন চরিত এই শিরোযুক্ত প্রস্তাবদ্বয় অতীব সারবান্ হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল এইরূপ সারবান্ প্রস্তাবের তত মর্য্যাদা নাই। লোকে গম্ভীর উপদেশ অপেক্ষা আমোদ অধিক চায়। * * * এই মাসিক প্রবন্ধে এক একটি বিশুদ্ধ আমোদজনক প্রস্তাব থাকিলে ভাল হয়।" শ্রাবণ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সেরূপ ছিল না। ঢাকা হইতে এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের প্রকাশারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া, আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি।

পত্র আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর, এবং লেখক দিগের চিন্তা-শক্তি অসামান্য, ইহা যে বাঙ্গালায় একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্র মধ্যে গণ্য হইবে তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংসয় নাই।" শ্রাবণ ১২৮১। বঙ্গদর্শন

"পূর্ব্ব বাঙ্গালাবাসীগণ যে, গুপ্ত সিংহাসনাভিলাষী মিত্রবরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, এই নূতন বান্ধবের সন্দর্শন পাইলেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। সরস্বতীর যে মুর্ত্তি, আজি বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে "প্রভাকর" 'ভাস্করের' কর জালে এতদ্দেশে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়া ছিল, যে রস "রস সাগরে" সঞ্চিত ছিল, 'রসমুদ্গারে, আন্দোলন করিতেছিল, দাশরথি রায়, রসিকচন্দ্র রায় যমজ অবতার রূপ ধারণে যাহা এতৎ প্রদেশের গ্রামে গ্রামে নাচিয়া বেড়াইতে ছিল, এবং অবশেষে একেবারে বটতলার সার্দ্ধত্রয় অংশ চারি অবতারে "শনিবারের বড় মজা' লুটিয়া লইয়া "রবিবারের ইলিশ মাছ ভাজা" খাইয়া সোমবারের কঠিন সাজার ভয়ে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে, "মিত্র প্রকাশের" প্রচারে আমরা বুঝিয়া ছিলাম যে, সেই রসের ঢেউ পূর্ব্ব বাঙ্গালায় গিয়া লাগিয়াছে। আবার এই বান্ধবের সন্দর্শনে বুঝিতেছি যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালা সেই তরঙ্গ কাটিয়া উঠিতেছেন।"

"কালীপ্রসন্ন বাবুকে আমরা জানি না, তবে তাঁহার বান্ধবের সহিত আলাপেই বোধ হইতেছে যে, তিনি নিজে কৃতবিদ্য, সুরুচিসম্পন্ন, সুলেখক ও ভাষাজ্ঞ। আমাদের ইচ্ছা এরূপ বান্ধব দীর্ঘজীবী হয়েন।" ৪ শ্রাবণ, সাধারণী।

"প্রবন্ধগুলি পাঠে তৃপ্তিলাভ হইল। বান্ধবের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি এবং সকলেই করিবেন। ৯ শ্রাবণ ১২৮১। এড্‌কেশন গেজেট।

"কলিকাতা অঞ্চলে আমরা যাহাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিয়া থাকি, অনেকের বিশ্বাস এই যে পূর্ব্ব বাঙ্গালার লেখকেরা সে রূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনা করিতে পারেন না। এইটি নিতান্ত ভ্রম। যাঁহারা আমাদের এই নির্দ্দেশে সংশয়াবিষ্ট হইবেন, তাঁহাদিগকে আমরা বান্ধবের প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। রচনার লালিত্য ও বিশুদ্ধতা বান্ধবের এক মাত্র গুণ নহে যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে জ্ঞান লাভ হয়, নানা বিষয়ে দৃষ্টি জন্মে, চিন্তাশক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, সেইরূপ প্রবন্ধ মালায় ইহা বিভূষিত হইতেছে। ইহার পাঠকেরা সাহিত্যশাস্ত্রানুশীলনজনিত প্রীতি উপভোগ করিতে বিলক্ষণ সক্ষম হইতেছেন।

১৪ ভাদ্র। ১২৮১। সাপ্তাহিক সমাচার।

বয়মস্যাদ্যোপান্তং পঠিত্বা পরমপরিতোষং প্রাপ্তবন্তঃ। ইদং সুচারু সরলভাষয়া রচিতম্। সন্দর্ভাশ্চাস্মিন্ সন্নিবিষ্টাঃ পাঠকানামুপকারকাঃ। "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি স্বল্প সংখ্যক সাময়িকপত্রাণি বর্জ্জয়িত্বা বঙ্গভাষায়ামেতত্তুল্যং পত্রং দুর্ল্লভমিতি মন্যামহে।

জুলাই ১৮৭৪। বিদ্যোদয়ঃ।

বান্ধব বিষয়ের উচ্চতায়, সহৃদয়তা ও চিন্তাশীলতায় এবং অসাধারণ লিপিকুশলতায়, অস্মদ্দেশের বিপুল উপকার ও ভাষার প্রভূত উন্নতি সংসাধন করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, এই অত্যুৎকৃষ্ট পত্রের বাহ্যাকৃতি অত্যন্ত কদর্য্য। কোকিলও কদাকার, কিন্তু কে না তাহার গুণের প্রশংসা করিতেছে"

ফাল্গুন ১২৮১। হালিসহর পত্রিকা।

"বান্ধবের সম্পাদক এত স্বল্প মূল্যে যে এত উৎকৃষ্ট পত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন, আমরা সে ভরসা করিয়া ছিলাম না। ইহার সম্পাদক চাকচিক্য দেখাইয়া বালকের এবং সরলা কামিনী গণের চিত্তরঞ্জনের যত্ন করেন নাই। ইনি যে রূপ গম্ভীর ভাবে কাগজ চালাইতেছেন, এরূপ যদি চালাইতে পারেন, তবে প্রকৃত বান্ধবের কার্য্য করিবেন।"

১৫ শ্রাবণ ১২৮১। অমৃত বাজার।

"বান্ধব একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র *** বান্ধবের ন্যায় উৎকৃষ্ট পত্রিকার দীর্ঘ জীবন হয় ইহা আমাদের একান্ত অভিলাষ। বান্ধবের কলেবর পরিমাণে ইহার মূল্য অতি অল্প নিদ্ধারিত হইয়াছে বলিতে হইবে। ভরসা করি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ইহার স্থায়িত্ব পক্ষে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিবেন।" অগ্রহায়ণ ১২৮১। জ্ঞানাঙ্কুর।

*****

"ইহার প্রবন্ধ কএকটি সরল সৌন্দর্য্যমিশ্রিত চিন্তাপ্রসূত। * * * আমরা বান্ধবকে লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট ও পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। ইহাতে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি আমাদের বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছে।"

১২৮১ শ্রাবণ। গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা বহুসংখ্যক গ্রাহকের ইচ্ছা ও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া বিগত অগ্রহায়ণ মাস হইতে বান্ধবের কলেবর এক ফর্ম্মা বাড়াইয়াছি, এবং যেন ব্যয় ভার কুলান যাইতে পারে এইরূপ হিসাব করিয়া ইহার বার্ষিক মূল্য, ১২৮২ হইতে ১।।০ টাকা, এবং বিদেশের জন্য ডাক মাস্থল সমেত ১৸৴০, অবধারণ করিয়াছি। বান্ধবের কলেবর কোন মাসেই এইক্ষণ আর চারি ফর্ম্মার কম হইবে না। ইহার বর্ত্তমান মূল্যও হিসাব মত অতি অল্প। যাঁহারা এই বৎসর বান্ধবের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন, আমরা ভরসা করি ভবিষ্যতেও তাঁহারা সেই অনুগ্রহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

বান্ধবের প্রথমখণ্ড চৈত্রের সংখ্যায় শেষ হইল। ১২৮২ সনের বৈশাখ হইতে ইহার দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইবে। আমরা প্রথমখণ্ডে ১২ মাসের হিসাবে ৩৬ ফর্ম্মা দিতে বাধ্য ছিলাম। এই নিমিত্ত অগ্রহায়ণ হইতে প্রতিমাসে ১ ফর্ম্মা, এবং চৈত্রে ২ফর্ম্মা, অধিক দিয়া সেই ৩৬ ফর্ম্মা পূরাইয়া দিলাম।

অক্ষরাদি উপকরণের অভাবহেতু এই পত্রিকাখানির মুদ্রণ কার্য্য এত দিন সুন্দর হয় নাই। আমরা সেজন্য নিতান্ত লজ্জিত আছি। আমাদের নূতন অক্ষর এইমাত্র আনান হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যা হইতে ইহা নূতন অক্ষরে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হইবে, এবং যাহাতে পাঠকবর্গের নিকট আর আমাদিগকে এই অপরাধে অপরাধী হইতে না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা যাইবে।

☞ অনেকে বিস্মৃতিক্রমে কিংবা অনবধানতাবশতঃ অদ্য পর্য্যন্তও বান্ধবের ১২৮১ সনের মূল্য পাঠাইয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের বিস্মৃতি অথবা অনবধানতায় আমরা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন এরূপ মনে হয় না। আমরা বিনয়সহকারে প্রার্থনা করি, তাঁহারা অগৌণে মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

ঢাকা
বান্ধব কার্য্যালয়

শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য প্রাপ্তি।

বিদেশীয়।

শ্রীলশ্রীযুক্ত যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর আগর তলা ১।৵০
শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর সুশঙ্গ দুর্গাপুর ১।৵
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী কাশীমবাজার ১।৵০
শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর দিঘাপাতিয়া ১।৵০
শ্রীযুত রাজীব লোচন রায় রায় বাহাদুর কাশীমবাজার ১।৵০
শ্রীযুত বাবু হরকুমার সরকার করচমারিয়া ১।৵০
শ্রীযুতা হরসুন্দরী দেবী ঐ ১।৵০
শ্রীযুক্তবাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৵০
" " শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৵০
" " গোবিন্দমোহন ঘোষ ঐ ১।৵০
" " কৈলাসচন্দ্র দাস ঐ ১।৵০
" " বেণীমাধব নন্দী ঐ ১।৵০
" " বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত তাহেরপুর ১।৵০
" " কালীরত্ন চক্রবর্ত্তী জযাড়ি ১।৵০
" " কেশবচন্দ্র দেব তারাস, রাইগঞ্জ ১।৵০
" " বরদাপ্রসাদ দত্ত বালিহুগলী ১।৵
" " জগদ্বন্ধু সেন করচমারিয়া ১।৵০
" " শ্যামচাঁদ পাল সোগাছী ১।৵০
" " কালীনাথ রায় নবাবগঞ্জ ।।০
" " বঙ্গচন্দ্র সেন আগড়তলা ১।৵০
" " কৃষ্ণচরণআচার্য্য মুর্শীদাবাদ ৵০
" " মনোমোহন নিয়োগী, ময়মনসিংহ ১।৵০
" " রাধাগোবিন্দ রায়, দিনাজপুর ১।৵০
" " যশোদাকুমার রায়, দলাল বাজার ১।৵০
" " কাশীচন্দ্র মুন্সী বিদগাঁও ।।৵০
" " তারাপ্রসন্ন দাস কলিকাতা ১।৵০
" " বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কার্ত্তিকপুর ১।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র দে, কুমিল্লা ১।৵০
" " মাণিকচন্দ্র দে, চট্টগ্রাম ১৵০
" " শিবকিশোর মুন্সী ১।০
" " অন্নদাপ্রসাদ সেন কোমরপুর ১।৵
" " কালীনাথ দেব, কুমিল্লা ১।৵০
" " বৈকুণ্ঠনাথ রায় জাহানাবাদ ১।৵
" " অন্নদাপ্রসাদ সেন নোয়াখালী ১।৵০
" " হরদাস দাস, সাতকানিয়া ৵০
" " রমেশচন্দ্র লাহিড়ী মুকুন্দপুর ১।৵০
" " শ্রীনাথ বসু, ময়মনসিংহ ১।৵০
" " মোহিনীমোহন বর্দ্ধন কুমিল্লা ১।৵০
" " নিশিকান্ত দাস, বাজিতপুর ১।৵
" " সারদাপ্রসাদ কুণ্ড, ভোলপুর ১।৵
" " জগন্নাথ মুন্সী কুচবেহার ১।৵০
" " দ্বারকানাথ রায় ঐ ১।৵০
" " খড়্গনাথ খাঁ ঐ ১।৵০
" " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী লাকশ্যাম ১।৵০
" " উমেশচন্দ্র নিয়োগী দিনাজপুর ১।৵০
" " কালীকুমার গুহ, ময়মনসিংহ ১।৵০
" " রামকুমার বন্দোপাধ্যায় ঐ ১।৵০
" " ঈশানচন্দ্র দত্ত ঐ ১।৵০
" " কেদারনাথ সান্যাল ঐ ১।৵০
" " মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৵০
" " প্রসন্নকুমার আচার্য্য ঐ ১।৵০
" " গোবিন্দচন্দ্র বাগচি মুক্তাগাছা ১।৵০
" " কালীমোহন চট্টোপাধ্যায় টেঁঘরিয়া ১
" " বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুহ বরিশাল ১।৵০
" " চন্দ্রকুমার রায় ঐ ১।৵০
" " প্রসন্নচন্দ্র সেন বাইষা ১।৵০
" " হরিশ্চন্দ্র সাহা কুচবেহার ১।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র দাস ১
" , ঈশ্বরচন্দ্র দাস ১
" , দ্বারকনাথ বন্দোপাধ্যায় ১
" , জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস ১
" , বৃন্দাবনচন্দ্র ধর ১
" , রামনারায়ণ দে ১
" , জগৎচন্দ্র সেন ১
" , কালীকেশব বিশ্বাস ॥৵
" , নবকুমার রায় ১
" , নন্দকুমার বসু ১
" , শশিভূষণ গুপ্ত ১
" , মণিমোহন রায় ১
" , নরেন্দ্রনাথ ধর ১
" , অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ১
" , কেদারনাথ রায় ১
" , প্রসন্নচন্দ্র দাস ১
" , রেবতীমোহন গুহ ১
" , চাঁদমোহন বন্দোপাধ্যায় ১
" , আনন্দচন্দ্র সেন ১
" , যাদবচন্দ্র সেন ১
" , শশিকুমার বসু ১
" , দুর্গাপ্রসন্ন সেন ১
" , প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত ১
" , রজনীকান্ত মিত্র ১
" , কালীনাথ গুপ্ত ১
" , রাজকুমার দাস ১
" , হারাণচন্দ্র দাস ১
" , রজনীনাথ দে ১
" , জগদ্বন্ধু ঘোষ ১
" , তারকচন্দ্র খাসনবিশ ১
" , বিপিনবিহারী দাস

শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার সেন ১
" , মথুরানাথ দাস ১
" , দ্বারকানাথ বসু ১
" , প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১

মুন্সীগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র দাস ১
" , হরমোহন গুপ্ত ১
" , তারিণীচরণ সেন ১
" , রাধানাথ সেন ১
" , ভগবানচন্দ্র গুপ্ত ১
" , কৈলাসচন্দ্র দাস ১
" , কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় ১
" , জয়চন্দ্র রায় ১
" , তারিণীচরণ রায় ১
" , পূর্ণচন্দ্র রায় ১
" , জয়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১
" , রজনীকান্ত সেন ১
" , গিরীশচন্দ্র গুহ ১
" , কৃষ্ণকুমার গুহ ১
" , তারিণীচরণ ঘোষ ১
" , চন্দ্রকুমার দাস ১
" , বিহারিলাল ঘোষাল ১
" , ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১
" , দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১
" , কালীকিশোর সোম ১
" , কৃষ্ণেন্দ্র চৌধুরী ১
" , আবদুলগণি ১
" ,, জগদ্বন্ধু বসু, শ্রীনগর ১
" ,, রজনীকান্ত গুহ ঐ ১
" , রজনীনাথ চৌধুরী ঐ ১

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র দাস	১
" , ঈশ্বরচন্দ্র দাস	১
" , দ্বারকনাথ বন্দোপাধ্যায়	১
" , জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস	১
" , বৃন্দাবনচন্দ্র ধর	১
" , রামনারায়ণ দে	১
" , জগৎচন্দ্র সেন	১
" , কালীকেশব বিশ্বাস	৷৷৵
" , নবকুমার রায়	১
" , নন্দকুমার বসু	১
" , শশিভূষণ গুপ্ত	১
" , মণিমোহন রায়	১
" , নরেন্দ্রনাথ ধর	১
" , অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী	১
" , কেদারনাথ রায়	১
" , প্রসন্নচন্দ্র দাস	১
" , রেবতীমোহন গুহ	১
" , চাঁদমোহন বন্দোপাধ্যায়	১
" , আনন্দচন্দ্র সেন	১
" , যাদবচন্দ্র সেন	১
" , শশিকুমার বসু	১
" , দুর্গাপ্রসন্ন সেন	১
" , প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত	১
" , রজনীকান্ত মিত্র	১
" , কালীনাথ গুপ্ত	১
" , রাজকুমার দাস	১
" , হারাণচন্দ্র দাস	১
" , রজনীনাথ দে	১
" , জগদ্বন্ধু ঘোষ	১
" , তারকচন্দ্র খাসনবিশ	১
" , বিপিনবিহারী দাস	
শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার সেন	১
" , মথুরানাথ দাস	১
" , দ্বারকানাথ বসু	১
" , প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১

মুন্সীগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র দাস	১
" , হরমোহন গুপ্ত	১
" , তারিণীচরণ সেন	১
" , রাধানাথ সেন	১
" , ভগবানচন্দ্র গুপ্ত	১
" , কৈলাসচন্দ্র দাস	১
" , কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
" , জয়চন্দ্র রায়	১
" , তারিণীচরণ রায়	১
" , পূর্ণচন্দ্র রায়	১
" , জয়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	১
" , রজনীকান্ত সেন	১
" , গিরীশচন্দ্র গুহ	১
" , কৃষ্ণকুমার গুহ	১
" , তারিণীচরণ ঘোষ	১
" , চন্দ্রকুমার দাস	১
" , বিহারিলাল ঘোষাল	১
" , ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১
" , দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১
" , কালীকিশোর সোম	১
" , কৃষ্ণেন্দ্র চৌধুরী	১
" , আবদুলগণি	১
" ,, জগদ্বন্ধু বসু, শ্রীনগর	১
" ,, রজনীকান্ত গুহ ঐ	১
" , রজনীনাথ চৌধুরী ঐ	১

ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

শ্রীযুক্তবাবুশশিভূষণ গুহ মানিকগঞ্জ ১।৶
" " মথুরামোহন ঘোষ ঐ ১।৶
" " শ্রীনাথ তরফদার কুচবেহার ১৶
" " কৈলাসচন্দ্র বাগছি গোয়ালপাড়া ১।৶
" " বৈকুণ্ঠনাথ রায় ময়মনসিংহ ১।৶
" " কেদারেশ্বর হাজরা ঐ ১।৶
" " প্রসন্নকুমার সেন ঐ ১।৶
" " দিননাথ ঘোষ হার্ডিঞ্জ স্কুল ১।৶
" " ললিতমোহন রায় মুক্তাগাছা ১।৶
" " দীনবন্ধু দে নাটোর ১।৶
" " নবকুমার দাস কাছার ক্ষুদপতলী ।।৶
" " নবীনচন্দ্র দত্ত সরাইল ১।৶
" " কৃষ্ণচরণ মজুমদার রামপুর পাবনা ১।৶
" " বসন্তকুমার ঘোষ কোটাপাড়া ১।৶
" " মনোমোহন মহান্ত রোয়াইল ।৶
" " মথুরানাথ চৌধুরী পিরিজপুর ১।৶
" " কালীকিশোর ঘোষ ত্রিপুরা ১।৶
" " গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী হোসনপুর ১।৶

ঢাকা ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর সেন ১
" " ভগবচ্চরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১
" " হেমেন্দ্রনাথ বসু ১
" " জয়চন্দ্র ঘোষ ১
শ্রীযুক্ত সুলতানবক্স চৌধুরী ১
শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১
" " অভয়াচরণ সেন ১
" " শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত ১
" " গোপীচরণ দাস ১
" " জগদ্বন্ধু গুহ ১
" " জয়চন্দ্র গুহ ১
" " আনন্দচন্দ্র সেন ১
" " গোবিন্দচন্দ্র দাস ১
" " রাজবেহারী রায় ১
" " কাশীচন্দ্র মজুমদার ১
" " চন্দ্রকুমার বসু ১
" " গোলোকচন্দ্র রায় ১
" " বসন্তকুমার সেন ১
" " গণেশচন্দ্র লস্কর ১
" " জগচ্চন্দ্র দাস ১
" " শ্যামাপ্রসাদ সেন ১
" " গুরুদাস মাশচরক ১
" " রামপ্রসাদ রায় ১
" " শশিভূষণ গুপ্ত ১
" " যোগেন্দ্রমোহন রায় ১
" " বসন্তকুমার মজুমদার ১
" " চন্দ্রকিশোর বর্দ্ধন ১
" " শ্যামাপ্রসন্ন বসু ১
" " শ্যামচাঁদ বসাক ১
" " রামকুমার বসাক ১
" " হরকুমার গুহ ১
" " ললিতকুমার দত্ত ১
" " জগদ্বন্ধু দাস ১
" " রামচন্দ্র বসাক ১
" " কালীপ্রসন্ন চৌধুরী ১
" " ঈশ্বরচন্দ্র শীল ১
" " কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ১
" " কৃষ্ণকুমার সিংহ ১

মূল্য প্রাপ্তি।

বিদেশীয়।

- শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন মজুমদার গোয়ালপাড়া ১।৵
- „ „ চন্দ্রকিশোর তরফদার প্রেসিডেন্সি কালেজ ১।৵
- „ „ গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাঙ্গরা ১।৵
- „ „ হরিনাথ রায় কিশোরগঞ্জ ১৲
- „ „ জগচ্চন্দ্র গোস্বামী ঐ ১।৵
- „ „ কালাচাঁদ দে ঐ ১।৵
- „ „ কালীকিঙ্কর সেন ঐ ॥৶
- „ „ কৃষ্ণকমল গোস্বামী ঐ ১।৵
- „ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ঐ ১৲
- „ „ বৈকুণ্ঠচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাউফল ১।৵
- „ „ ঈশানচন্দ্র রায় কুচবেহার ১।৵
- „ „ দয়ালচন্দ্র সোম বুকক্লাব বাঁকিপুর ১।৵
- „ „ দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় জোরবাঙ্গলা দারজিলিং ১৲
- „ „ যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার, পিরগাছা ১।৵
- „ „ ভুবনমোহন চৌধুরী কলিকাতা ১।৵
- „ „ বিদ্যাধর রায় বরিশাল ১।৵
- „ „ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় জমিদার মজঃফরপুর ত্রিহুত ১।৵
- „ „ দ্বীপচন্দ্র ঘোষ বুড়িরহাট ১।৵
- শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র সেন মানিকগঞ্জ ১।৵
- „ „ সেক্রেটরী বাবুর বুকক্লাব দারজিলিং ১।৵
- „ „ গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ ১।৵
- „ „ বনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী ঐ ১।৵
- „ „ দুর্গাচরণ রায় কাসগঞ্জ ১।৵
- „ „ ব্রজলালচক্রবর্ত্তী দরভাঙ্গা ১।৵
- „ „ অশোকচন্দ্র লাহিড়ী শ্রীহট্ট ১।৵
- „ „ মাণিকচন্দ্রবসু আখিরিগঞ্জ ১।৵
- „ „ রামকৃষ্ণ বসু আড়বালিয়া ১।৵
- „ „ দীননাথবিশ্বাস কুচবেহার ১।৵
- „ „ কৃষ্ণকুমার রায় ডায়মণ্ড হারবার ১।৵
- „ „ অভয়াচরণ বসু সাহিলী ১।৵
- „ যাত্রামোহনচৌধুরী চট্টগ্রাম ১।৵
- „ „ রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়বাহাদুর বলিহার ১।৵
- „ „ হরিবিলাস আগরওয়ালা আসাম ১৲
- „ „ দীনবন্ধুদাস মোওয়াখালী ১।৵
- কাপ্তান ই জি লিলিং ষ্টোন আগরতলা ১।৵
- „ „ দুর্গাদাস তলাপাত্র আগরতলা ১।৵
- „ „ হরচরণ নন্দী ঐ ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ ১।৵
" " কৃষ্ণচরণবসাক ময়মনসিংহ ১।৵
" " ভৈরবচন্দ্র দাস ঐ ১।৵
" " বদনচন্দ্র দাস বাঁকিপুর ১।৵
" " প্রাণকৃষ্ণভাদুরী কলিকাতা ৸৵
" " মদনমোহন রায় পাবনা ১।৵
" " ভদ্রসেন বড়ুয়া নওগাঁ ১।৵
" " শরচ্চন্দ্র মজুমদার ঐ ১।৵
" " পদ্মদাস গোস্বামী ঐ ১।৵
" " চন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জামালপুর ১।৵
" " রজনীকৃষ্ণ বসু জামালপুর ৸৵
" " ঈশ্বরচন্দ্র গুহ ঐ ৸৵
" " প্রবোধচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ১।৵
" " হরিমোহনবিশ্বাস হাকিমপুর ১।৵
" " অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় আগরা ১।৵
" " তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঐ ১।৵
" " শীতলচন্দ্র মিত্র ঐ ১।৵
" " উমেশচন্দ্র সান্যাল ঐ ১।৵
" " নবকুমার দাস কাছার ৸০
" " ঈশ্বরচন্দ্র বাগ্‌ছি বলিহার গ্রাম ১।৵
শ্রীযুত গোলামালি চৌধুরী জমিদার হাটুরিয়া ১।৵

শ্রীযুত বাবু যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মজঃফরপুর ১।৵
" " কাশীকান্ত ঘোষ পুবাইল ১।৵
" " দুর্গানাথ রায় জমিদার ঐ ১।৵
" " বৈকুণ্ঠনাথঘোষ মানিকগঞ্জ ১।৵
" " হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ ১।৵
" " অশ্বিনীকুমারচক্রবর্ত্তী পাটনা ১।৵
" " দীনবন্ধু গাঙ্গলী বাঁকিপুর ১।৵
" " ব্রজেন্দ্রমোহন দাস ঐ ১।৵
" " গুরুপ্রসাদ সেন ঐ ১।৵
" " শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কাছার ১।৵
" " বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় আলমডাঙ্গা ষ্টেশন ১।৵
" " যোগীন্দ্রচন্দ্র রায় কালনা ১।৵
" " ঈশ্বরচন্দ্র দে মাঁদারিপুর ১।৵
" " রজনীকান্ত ঘটক ঐ ১।৵
" " কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম ১।৵
" " কালী কমল চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লা, ১।৵
" " বিনোদবিহারী চৌধুরী বারিপুর ২৪ পরগণা ১।৵
" " দুর্গা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী কুচবেহার দীন হাটা ১।৵
" " রেবতীমোহন নন্দী লেছরা গঞ্জ ১।০

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন বরিশাল ১।৶
,, উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাগহাট ১।৶
,, গোলোক চন্দ্র দত্ত কাছার ১।৶
,, রজনী কান্ত ঘোষ নড়াইল ১।৶
,, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ ১।৶
,, গদাধর মিত্র নড়াইল ১।৶
,, রাম লাল রায় ঐ ১।৶
,, অন্নদা প্রসাদ সেন ঐ ১।৶
,, বসন্ত লাল দত্ত চাঁচড়ি কাদিয়া ১।৶
,, শশিভূষণ সরকার ঐ ১।৶
,, গোবিন্দ চন্দ্র মজুমদার সুন্দরপুর ১।৶
,, নব কিশোর সেন শ্রীহট্ট ১।৶
শ্রীযুত এ ডব্লিউ পাওয়ার স্কোয়ার চট্টগ্রাম ১।৶
শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু ঠাকুর নাজির সাহেব আগরতলা ১।৶
,, হেমচন্দ্র সিংহ লক্ষ্ণৌ ১।৶
,, শম্ভুচন্দ্র দে শ্রীহট্ট ১।৶
,, উপেন্দ্র চন্দ্র খাঁ করঞ্জাপাঠশালা ৸০
,, গোবিন্দ লাল রায় জমিদার তাজহাট মাহিগঞ্জ ১।৶
,, মথুরা নাথ সরকার বাইশারী ১।৶

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী মুরশীদাবাদ ১।৶
,, শরচ্চন্দ্র রায় মেহেরপুর ১।৶
,, রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৶
,, মুকুন্দ চন্দ্র সেন ঐ ১।৶
,, যদু নাথ মজুমদার ঐ ১।৶
শ্রীযুক্ত সমসের আলী চৌধুরী জমিদার পাটগ্রাম ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু অভয়ানন্দ দাস বরিশাল ১।৶
,, জয়কুমার দেব কাছার ১।৶
,, গুরুচরণ সেন ঐ ১।৶
,, উমাকান্ত ঘোষ কাছার ১।৶
,, গোপাল কৃষ্ণ দেব ঐ ১।৶
,, শিবচন্দ্র দত্ত ঐ ১।৶
,, অম্বিকা চরণ সরকার বর্দ্ধমান ১।৶
,, রমণীমোহন রায় চৌধুরী জমিদার তুষভাণ্ডার ১।৶
,, কালীকুমার রায় কালীগঞ্জ ১।৶
,, আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস গোয়ালপাড়া ১।৶
,, প্রসন্নকুমার দাস কালীগঞ্জ ১।৶
,, রামজীবন ঘোষ দরভাঙ্গা ১।৶
,, ভগবানচন্দ্র রায় মেদিনীপুর ১।৶
,, ব্রজমোহন মিত্র ঐ ১।৶
,, চন্দ্রমোহন মিত্র ঐ ১।৶
,, অতুল চন্দ্র ঘোষ টুবকি বাগরা কুমিল্লা ১।৶

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ ঘোষ
বেগমগঞ্জ ১।৵
„ „ জানকী নাথ দত্ত চাপরা
কৃষ্ণনগর ১।৵
„ „ প্রসন্নকুমার গুপ্ত রমহৎপুর
বরিশাল ১।৵
„ „ শ্রীনাথবসু জমিদার শ্রীনগর ১৲
„ „ প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
উমেদপুর ১৲
দীনবন্ধুভট্টাচার্য্য কুশারিপাড়া ১৲
„ „ অম্বিকাচরণ লস্কর সোন্দার
দিয়া ১৲
„ „ হর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য চাঁদের
চর ১৲
„ „ রাজকিশোর বন্দোপাধ্যায়
বদরসন ১৲
„ „ অমৃত নারায়ণ আচার্য্য
চৌধুরী মুক্তাগাছা ১।৵
„ „ বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
নিবাধই ৸০
„ „ হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দুর্গাপুর ১।৵
„ „ দীনবন্ধু মৌলিক আমিনপুর
স্কুল ১।৵
„ „ ঈশ্বরচন্দ্র রায় জমিদার
সুয়াপুর ১।৵
„ „ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তমলুক ১।৵
„ „ শীতল প্রসাদ দত্ত ঐ ১।৵
„ „ গৌরচন্দ্র সেন ভোলপুর ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
দেরাধুন ১।৵
„ „ শিবনাথ সাহা ঐ ১।৵
„ „ অম্বিকাচরণ সোম ঐ ১।৵
„ „ কালীনাথ রায় উকিল
নবাবগঞ্জ মালদহ ৸৵
„ „ মতিলাল হালদার টকভর ।০
„ „ অক্রূরচন্দ্র সেন রোয়াইল ১৲
„ „ কেদার নাথ চৌধুরী বোয়ালিয়া
হাই স্কুল ১।৵
„ „ করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উনাও অযোধ্যা ১।৵
„ „ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ড
রেলওয়ে ষ্টেশন ১।৵
„ „ রাজ মোহন দে দেব্রুগড়, ১।৵
„ „ কাশী চন্দ্র বসু চট্টগ্রাম ।৵
„ „ ঈশান চন্দ্র মজুমদার শ্রীহট্ট ১।৵
„ „ প্রসন্ন চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
শ্রীনগর ১।৵
„ „ শশি ভূষণ দত্ত কোড়হাটি ১/১০
„ „ কালী কুমার ধর কাছার ১।৵
„ „ ক্ষেত্রনাথ পাল খরকপুর
মুঙ্গের ১।৵
„ „ গোপীনাথ দত্ত অগ্রদ্বীপ ১।৵
„ „ কালীভূষণ রায় দোগাছি
জেহানগর ১।৵
„ „ চারু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কালিকাপুর ১।৵

মূল্য প্রাপ্তি।

বিদেশীয়।

—— ০০০ ——

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র এলাহাবাদ ১।৵

" " শশীমোহন পাল চৌধুরি লৌহজঙ্গ ১।৵

" " তারিণীচরণ রাহা সন্দিপ, নোয়াখালী ১।৵

" " কালীকিঙ্কর সেন রাজসাহী ১।৵

" " অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আগরা ১।৵

" " হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গের ১।৵

" " নিলাম্বররায় সকড়িগলি ১।৵

" " পুরুষোত্তম দাস নুনহাট, বালেশ্বর ১।৵

" " চন্দ্রধর বাগছি শিলং ১।৵

" " জয়রাম রায় মুকুন্দপুর ৸০

" " দীননাথ চক্রবর্ত্তী দিনাজপুর ১।৵

" " দুর্গাকান্ত সান্যাল ঐ ১।৵

" " জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৵

" " ভুবনমোহন কর ঐ ৪খণ্ড ৫৷৹

" " হরমোহন ভাদুড়ি কালীতলা, দিনাজপুর ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত বসু নিশ্চিন্তপুর স্কুল ঐ ১।৵

" " আনন্দচন্দ্র চৌধুরি দিনাজপুর ১।৵

" " তারা প্রসাদ মজুমদার ঐ ১।৵

" " ত্রিপুরচন্দ্রনিউগি ঐ ১।৵

" " রাজেন্দ্রলাল মজুমদার ঐ ১।৵

" " তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৵

" " যজ্ঞেশ্বর দত্ত ঐ ১।৵

" " শশীমোহন সেন ঐ ১।৵

" " নীলমণি পাল ঐ ১।৵

" " চন্দ্রমোহন সেন ঐ ১।৵

" " রাধাকৃষ্ণ মৌলিক বালুবাড়ী ঐ ১।৵

" " নবিনচন্দ্রকর দিনাজপুর ১।৵

" " মহিমচন্দ্র দাস ঐ ১।৵

" " পার্ব্বতিচরণ দাস মাদাঁরিপুর ১।৵

" " শ্যামাচরণ দাস পটুয়খালী ১৷৹

" " লক্ষ্মীকান্তদাস বিশ্বনাথ ১।৵

" " যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ধনওয়ার ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ বসু
শ্রীবাড়ী ১।৶
" " প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বিলাসখান ১৶১০
" " কালী প্রসন্ন মৌলিক
ভরাটৈর ১।৶
" " নবিনচন্দ্র বসু
মালখানগর ১।৶
" " ভগবানচন্দ্র সেন
মেদিনীপুর ১।৶
" " গিরিশচন্দ্র মৈত্র
গোয়ালন্দ ১।৶
" " যাদবচন্দ্র সরকার ঐ ১।৶
" " প্রাণনাথ সাহা ঐ ১।৶
" " গোপাল কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
ঐ ১।৶
" " দ্বারকানাথ সেন ঐ ১।৶
" " জানকীনাথ মিত্র ঐ ১।৶
" " অঘোরনাথ ঘোষাল ঐ ১।৶
" " পরেশনাথ বিশ্বাস ঐ ১।৶
" " পরাণচন্দ্র বসু ঐ ১।৶
" " চন্দ্রনাথ গুহ ঐ ১।৶
" " কালীচরণ মুখো- ঐ ১।৶
" " রাজকুমার সেন ঐ ১।৶
" " হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
ঐ ১।৶
" " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৶
" " প্রতাপচন্দ্র মৈত্র
ঐ ১।৶

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সান্যাল
শান্তিপুর ১।৶
" " ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত রেইল
ওয়ে ডিপার্টমেন্ট অ
যোধ্যা এবং রোহিলখণ্ড
হেরণি ১।৶
" " চন্দ্রকুমার সরকার
ভাদিয়া ফেক্টরি ১।৶
" " রাজকুমার বনওয়ারি আ
নন্দ বাহাদুর বনওয়ারি
বাদ ১।৶
" " যদুনাথ দাস
মানিকগঞ্জ ১।৶
" " হরেন্দ্রচন্দ্র গুহ
টাঙ্গাইল ৫৲
" " ষষ্ঠিচরণ কানুগিরি
কটিকছড়ি ১।৶
" " গঙ্গাচরণ সেন
গোয়ালপাড়া ১।৶
" " রামকানাই সেন ঐ ১।৶
" " গিরিশচন্দ্র দত্ত ঐ ১।৶
" " দ্বারকানাথ সেন
ঐ ১।৶
" " নবকুমার বিশ্বাস
রাণীশনকৈল ১।৶
" " গোবিন্দ চন্দ্র রায়
কুচবেহার ১।৶
" " জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী
তমলুক ১।৶

শ্রীযুক্ত সৈয়দ মজহর আলী

গৌরনদী ১।৶

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ সেন ঐ ১।৶

" " সূর্য্যকুমার গুহ

চাউলাকাঠী ১৶

" " ভগবান চন্দ্র বসু কাটোয়া

১।৶

" " জগদীশচন্দ্র বসু কলিকাতা

৸৹

" " রামদাস সেন বহরমপুর

১৷৶

" " হরিমাধব লাহিড়ি

কলিকাতা ১।৶

" " বঙ্গচন্দ্র সরস্বতী ডিব্রুগড়

১৶

" " হরচন্দ্র চৌধুরি জমিদার,

সেরপুর ১।৶

" " তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী কুমিল্লা

১।৶

" " উগ্রকণ্ঠ গুহ ঠ কুরতা

বানড়িপাড়া ১।৶

শ্রীযুক্ত আপছাকদ্দিনচৌধুরি বামনা১।৶

" আফতাবুদ্দিন চৌধুর ঐ ১।৶

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ বসু

মটবাড়িয়া ১।৶

" " রাজকুমার সরকার ঐ ১।৶

" " মহিমাচন্দ্র দাস ঐ ১।৶

" " ঈশ্বরচন্দ্রদত্ত আমরাগাছি

৸৹

শ্রীযুত মুন্সী গহরদ্দিন শিবখালী ১।৶

" " মুন্সী বাবু খাঁ দাউদখালী

১৶

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র দাস ভুষখালী

১৸৶

" " কাশীচন্দ্র বসু মঠবাড়ীয়া

১৶

" " উমাচরণ গুহ ঐ ১।৶

" " অভয়াচন্দ্র বসু ঐ ১।৶

" " সারদা মোহন বসু

দিনাজপুর ১।৶

" " বসন্তকুমার মিত্র রাজঘাট

১।৶

" " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১।৶

" " শরচ্চন্দ্র বসু কৃষ্ণনগর

কলেজ ১।৶

" " নীল কমল মিশ্র গোলমুণ্ডা

১।৶

" " কৃষ্ণশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

বাঁদাইখাড়া ১৶

" " দয়ালবিহারি গুহ

মঙ্গলদই ১৶

" " যোগেন্দ্রনাথ রায়

বেহালা ১।

" " জ্ঞানানন্দ সিকদার

কানাইপুর ১৷০

" " যোগেন্দ্র নারায়ন

আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১।৶

শ্রীযুক্ত বহরউল্লা কাজি বগুড়া ১।৵
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় উনাও অউড় ১।৵
" " মহেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁদপুর কাছারি ১।৵
" " দয়ালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিবহাটি ১।৵
" " প্রসন্নকুমার দাস সিলং ১।৵
" " পুলিনচন্দ্র রায় জামাটৈল ২৵
" " পূর্ণচন্দ্র লস্কর শ্রীনগর ১৲
" " প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জয়দেবপুর ১।৵
" " রামকুমার সরকার ঐ ১।৵
" " শ্রীনাথ গুপ্ত গৈলা ১৵
" " চণ্ডীচরণ বসু জামালপুর ১।৵
" " কালীনাথ বিশ্বাস কাউখালী ১।৵
" " অন্নদাচরণ বিশ্বাস ঐ ১।৵
" " মথুরানাথ বিশ্বাস ঐ ১।৵
" " শ্রীনাথ বিশ্বাস ঐ ১।৵
" " বৃন্দাবনচন্দ্র বিশ্বাস ঐ ১।৵
" " উমাকান্ত বিশ্বাস ঐ ১।৵
" " মনোরঞ্জন দত্ত ঐ ১।৵
" " ললিতকুমার দত্ত ঐ ১।৵
" " রতনকৃষ্ণ সোম ঐ ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর ঘোষ ঐ ১।৵
" " কৃষ্ণকান্ত পালিত ঐ ১।৵
" " সেক্রেটরি, সমেদকাটিস্কুল সমেদ কাটি ১।৵
" " প্যারীমোহন আইচ ঐ ১।৵
" " দ্বারিকানাথ বসু বানড়িপাড়া ১।৵
" " শশীকুমার গুহ ঠাকুরতা বানড়ি পারা ১।৵
" " বরদাকণ্ঠ গুহ ঐ ১।৵
" " বিষ্ণুচরণ গুহ ঠাকুরতা ঐ ১।৵
" " আনন্দমোহন গুহঠাকুরতা ঐ ১৵
" " চৈতন্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকইখালী ১।৵
" " রামকুমার দত্ত স্বরূপকাটি ১।৵
" " ভগবানচন্দ্র সান্যাল টাঙ্গাইল ১।৵

স্থানীয়।

শ্রীযুক্ত বাবু মোহনবাঁশী দে ১৲
" " ব্রজবিহারি রায় ১৲
" " অভয় চন্দ্র দাস ১৲
" " প্রাণকুমার দাস ১৲
" " হরি মোহন রায় ১৲
" " প্রিয়নাথ বসু ১৲

মূল্য প্রাপ্তি।

১২৮১ সন।

স্থানীয়।

শ্রীযুক্তবাবু——

নাম	মূল্য
রজনীকান্ত ঘটক।	১৲
গিরিশচন্দ্র দাস।	৸৵০
শীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	১৲
প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।	১৲
মহেশচন্দ্র ঘোষ।	১৲
বিশ্বেশ্বর রায়।	১৲
মৌলবী আবদুল্লা।	১৲
হরচন্দ্র ঘোষ।	১৲
গোবিন্দচন্দ্র বসাক।	১৲
ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ।	১৲
উপেন্দ্র নাথ মিত্র।	১৲
মহেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী	১৲
রূপ লাল দাস।	১॥০
রঘুনাথ দাস।	১॥০
পূর্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	১৲
স্বর্ণ কুমার চন্দ্র।	১৲
দীন বন্ধু বসাক।	১৲
ব্রজ নাথ দাস।	১৲
পার্ব্বতী চরণ বসু।	১৲
রসরঞ্জন সেন।	১৲

বিদেশীয়।

শ্রীযুক্ত——

নাম	মূল্য
চন্দ্রকিশোর কর, ময়মনসিংহ	১৸৵
যোগেন্দ্রনাথ চট্টো, চন্দ্রভাগ	১।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু——

নাম	মূল্য
চন্দ্রকান্ত রায়, ধীপুর	১।৵০
রাম চন্দ্র দাস, পাবনা	১।৵০
রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, কাঁসীদেওয়া	১।৵০
কৃষ্ণকুমার সেন, মওগাঁ, আসাম	১।৵০
উপেন্দ্রনাথ চট্টো, গোবরডাঙ্গা	১৲
কাশীনাথ মুন্সী, বিদগাঁও	॥৵০
দুর্গাচরণ ঘোষ, ময়মনসিংহ	১।৵০
শ্রীধর দাস ডাক্তার, জয়দেবপুর	১৸৵০
উপেন্দ্র নাথ রক্ষিত, কলিকাতা	১৸৵০
তারাপ্রসন্ন রায়, ময়মনসিংহ	১৲
অঘোর নাথ ভট্টাচার্য্য পুকুরিয়া, মালদহ	১।৵০
নবীনচন্দ্র মজুমদার, ঐ	১।৵০
শ্যামাশঙ্কর রায় চৌধুরী তেঁওতা	১৵০
সুরেস চন্দ্র মৈত্র, রাজসাহী	১।৵০
শ্যাম কিশোর বসু, রসুলগঞ্জ	১।৵০
কৃষ্ণ লাল মজুমদার, মেদিনীপুর	১।৵০
নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী পাড়া	১॥০
মহেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৪ পং	১।৵
রামনাথ সিদ্ধান্ত, ময়মনসিংহ	১।১০
যদুনাথ পালিত, চন্দন নগর	।৵০
গোলক চন্দ্র রায়, হেজাজিয়া	১৸৵
দীন নাথ দাস, ঐ	১৸৵০
প্রেম চাঁদ পাল, ফরিদপুর	১।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু——

ব্রজ নাথ ঠাকুর, বহরমপুর ১৸৶১
প্রসন্ন কুমার নিয়োগী,
ময়মন সিংহ ১৲
ঘন শ্যাম দাস, গৌহাটী ১৸৶
নবকুমার নিয়োগী, জয়দেবপুর ১৷৶
কাশী চন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ১৷৵০
অনঙ্গ মোহন চট্টোপাধ্যায়,
মাদারীপুর ১৸৵০
হরিশ চন্দ্র পাঁড়ে, রাজসাহী ১৷৶০
কিশোরী লাল রায়, বগুড়া ৸০
শশাঙ্ক মোহন চক্রবর্ত্তী, পারলিয়া ২৲
বরদা কান্ত সরকার, দিনহাটা ১৷৶০
পণ্ডিত শালীগ্রাম দাস,
অমৃতশর ৸০
চক্র পাল দাস, গৌহাটী ১৷৶০
প্রাণ কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হাজারী বাগ ১৷৶০
কালী কিশোর গুহ,
বজ্র যোগিনী ১৷৶০
দক্ষিণাচরণ রায়, কাছাড় ১৷৵০
কুমার হরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর,
চট্টগ্রাম ১৸৶০
নবীন চন্দ্র চৌধুরী, রঙ্গপুর ৷৶০
গিরিশ চন্দ্র রায়, নদিয়া ১৸৶০
ভগবান চন্দ্র বসু, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া ১৶০
দীন দয়াল দে, কিশোরগঞ্জ ৷০
রামকান্ত ঘোষাল, ফরিদপুর ১৸৶০
নীল মাধব শামন্ত, কেন্দুগঞ্জ ১৸৶০

শ্রীযুক্ত বাবু——

তারা প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়,
হোসেনপুর, ১৷৵০
হরি বিলাস আগড়ওলা,
তেজপুর, আশাম ৷৶০
রাজকুমার ভট্টাচার্য্য, বদর গঞ্জ ১৲
কালীপ্রসন্ন রায়, ঐ ১৲
বরদা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ঐ ১৲
উমাকান্ত সেন, ঐ ১৲
রাজ চন্দ্র নাগ, ঐ ১৲
প্রসন্ন কুমার চৌধুরী, ঐ ১৲
অমৃত লাল দাস, ঐ ১৲
করুণা কান্ত সেন ঐ ১৲
রাস বিহারী সাহা কবিরাজ, ঐ ১৲
বিনোদ মোহিনী নিয়োগী
কলিকাতা ৷৷৶০
ফয়জন্নেছা খাতুন চৌধুরাণী,
লাকশ্যাম,ত্রিপুরা ৭৲
মহাম্মদ ওয়াজিজ, বরিশাল ১৶০
লাল মিঞা, চিয়ড়াস্কুল, ত্রিপুরা ৷৷৶০
উপেন্দ্র নাথ দাস, কলিকাতা ১৷৵০
মন্মথ কুমার ঘোষ
চুয়াডাঙ্গা, নদিয়া ১৷৵০
দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়
জোরবাঙ্গলো, দারজিলিং ৷৶০
মৌলবী ফএজদ্দীন আহাম্মদ
কনক দিয়া, বরিশাল ১৷৶০
প্রসন্ন কুমার গুপ্ত, ধুলিয়া ঐ ১৷৶০
রাজেন্দ্র চন্দ্র রায়, বাউফল ঐ ১৷৵০